আত্মকথায় উনিশ শতকের সংস্কৃতি ও নারী: নারীর আত্মকথা (নির্বাচিত) কেন্দ্রিক সমীক্ষা

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে
পিএইচ.ডি. উপাধির জন্য প্রদত্ত
গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক
তুফান রায়

তত্ত্বাবধায়ক
ড. উৎপল মণ্ডল
প্রফেসর, বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
অক্টোবর, ২০২০

Declaration

I declare that the thesis entitled "আত্মকথায় উনিশ শতকের সংস্কৃতি ও নারী: নারীর আত্মকথা (নির্বাচিত) কেন্দ্রিক সমীক্ষা" has been prepared by me under the guidance of Dr. Utpal Mandal, Professor of Bengali, Department of Bengali, University of North Bengal. No part of this thesis has formed the basis for the award of any degree or fellowship previously.

Date : 05-10-2020

Tufan Roy

(Tufan Roy)
Department of Bengali
University of North Bengal

কুম্ভীলকবৃত্তি প্রতিরোধী শংসাপত্র

আমি তুফান রায়, [Registration No. Ph.D/Beng. (1197)/1351/R-2018] উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে "**আত্মকথায় উনিশ শতকের সংস্কৃতি ও নারী: নারীর আত্মকথা (নির্বাচিত) কেন্দ্রিক সমীক্ষা**" শিরোনামে পি এইচ. ডি. গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছি। আমার সর্বোত্তম জ্ঞান ও ধারণা অনুযায়ী জ্ঞাপন করছি যে, আমি এই গবেষণাকর্মে কোনোরূপ কুম্ভীলকবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিনি।

তুফান রায়
০৫-১০-2020

(তুফান রায়)
গবেষক, বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

উ ত্ত র ব ঙ্গ বি শ্ব বি দ্যা ল য়

রেফারেন্স নম্বর _____

তারিখ _____

Certificate

I certify that Sri Tufan Roy has prepared the thesis entitled "আত্মকথায় উনিশ শতকের সংস্কৃতি ও নারী: নারীর আত্মকথা (নির্বাচিত) কেন্দ্রিক সমীক্ষা" [Registration No. Ph.D/ Beng. (1197)/1351/R-2018] for the award of Ph.D. degree of the University of North Bengal, under my guidance. He has carried out the work ~~of~~ in the Department of Bengali, University of North Bengal.

Date: 03/10/2022

(Dr. Utpal Mandal)
Professor
Department of Bengali
University of North Bengal

Professor
Dept. of Bengali
University of North Bengal

বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
পোস্টিং ৭৩৪০১৩ । পশ্চিমবঙ্গ । ফোন ০৩৫৩-২৫৮০১৮
dept.bengalinbu@gmail.com

রেফারেন্স নম্বর _____ তারিখ _____

কুম্ভীলকবৃত্তি প্রতিরোধী শংসাপত্র

তুফান রায়, [Registration No. Ph.D/Beng. (1197)/1351/R-2018] উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে "**আত্মকথায় উনিশ শতকের সংস্কৃতি ও নারী: নারীর আত্মকথা (নির্বাচিত) কেন্দ্রিক সমীক্ষা**" শিরোনামে আমার তত্ত্বাবধানে পি এইচ. ডি. গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছেন। আমার সর্বোত্তম জ্ঞান ও ধারণা অনুযায়ী জ্ঞাপন করছি যে, গবেষক এই গবেষণাকর্মে কোনোরূপ কুম্ভীলকবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করেননি।

০৫/১০/২০২০

(ড. উৎপল মণ্ডল)
প্রফেসর, বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

Professor
Dept. of Bengali
University of North Bengal

সূচিপত্র

			পৃষ্ঠা
বস্তুসার	:		i-iv
প্রাক্‌কথন	:		v-vii
ভূমিকা	:		১-২
প্রথম অধ্যায়	:	উনিশ শতকের সামাজিক প্রেক্ষাপট: নারী ভাবনার উন্মেষ	৩-৩৫
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	উনিশ শতকের লেখিকাদের পরিচিতি এবং তাঁদের রচনার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা	৩৬-৬৫
তৃতীয় অধ্যায়	:	নারীর আত্মকথায় উনিশ শতক : নারী শিক্ষার প্রসঙ্গ	৬৬-১০৮
চতুর্থ অধ্যায়	:	নারীর আত্মকথায় উনিশ শতক : সামাজিক নানা প্রসঙ্গ	১০৯-১৭০
পঞ্চম অধ্যায়	:	নারীর আত্মকথায় উনিশ শতক : নারীবাদী ভাবনা	১৭১-২০৮
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	নারীর আত্মকথায় উনিশ শতক : আধ্যাত্মিক ভাবনা	২০৯-২৩৯
সপ্তম অধ্যায়	:	নারীর আত্মকথায় উনিশ শতক : ভাষা ব্যবহার প্রসঙ্গ	২৪০-২৭০
উপসংহার	:		২৭১-২৭৫
গ্রন্থপঞ্জি	:		২৭৬-২৮৩
নির্ঘণ্ট	:		২৮৪-২৮৯

বস্তুসার
(Abstract)

উনিশ শতকের বাংলার রেনেসাঁস বা নবজাগরণ এক আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল— যার ফলে বাংলা সাহিত্য, সমাজ, সংস্কৃতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই একটা বড় রকমের পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। বাংলার নবজাগরণের পূর্বে বাংলাদেশের রক্ষণশীল সমাজ নারীদের ভোগ্যপণ্য হিসেবেই বিবেচনা করতো। রক্ষণশীল সমাজ তথা পিতৃতান্ত্রিক সমাজ মনে করতো নারীদের জন্মই হয়েছে যেন স্বামীকে সন্তুষ্ট করে সন্তানের তথা পুত্র সন্তানের জন্ম দেওয়ার জন্যে এবং স্বামী ও পরিবারের সকলের সেবা করার জন্যে। রক্ষণশীল সমাজ নারীদের শিক্ষা থেকেও বঞ্চিত করে রেখেছিল। এছাড়া পিতৃতান্ত্রিক সমাজের সৃষ্ট বাল্যবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা, সতীদাহপ্রথা প্রভৃতি নারীদের জীবনকে নরকযন্ত্রণা ভোগেরই সামিল করে তুলেছিল। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীদের এই নিম্ন অবস্থানের জন্যেই উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণে প্রগতিশীল মানুষদের ভাবনা-চিন্তার পরিবর্তনে বাংলায় যেসব সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল সেগুলির অধিকাংশই নারীকেন্দ্রিক। আর নারীকেন্দ্রিক সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলনগুলির মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন হল নারী শিক্ষা আন্দোলন। নারী শিক্ষা আন্দোলনের ফলে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নারীদের প্রাথমিক শিক্ষা মোটামুটিভাবে সমাজে স্বীকৃত হলে এদেশের স্বল্পসংখ্যক নারী ধীরে ধীরে শিক্ষিতা হয়ে ওঠেন। এঁদের মধ্যে আবার কয়েকজন নারী চিঠিপত্র লেখালেখির পাশাপাশি তাঁদের নিজস্ব জীবনদর্শন, জীবন-যন্ত্রণার কথা আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা, প্রবন্ধ, কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করতে থাকেন। আবার এসময় ভাবনা-চিন্তার পরিবর্তনে অনেকে অন্যের লেখনীর সাহায্যেও নিজেদের জীবন-অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এভাবেই উনিশ শতকে আমরা পেয়ে যাই কয়েকজন প্রতিভাশালী লেখিকাদের— যাঁদের মধ্যে রাসসুন্দরী দাসীর *আমার জীবন*, সারদাসুন্দরী দেবীর *আত্মকথা*, কৈলাসবাসিনী দেবীর *ডায়েরী*, প্রসন্নময়ী দেবীর *পূর্ব্বকথা*, বিনোদিনী দাসীর *আমার কথা*, কৃষ্ণভাবিনী দাসীর *ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা*, নিস্তারিণী দেবীর *সেকেলে কথা*, কামিনী রায়ের *শ্রাদ্ধিকী*, সুদক্ষিণা সেনের *জীবন স্মৃতি*, শরৎকুমারী দেবের *আমার সংসার*, ইন্দিরা দেবীর *আমার খাতা*, মানকুমারী বসুর *আমার অতীত জীবন*, লীলাবতী মিত্রের *জীবনকথা*, আমোদিনী দাশগুপ্তের *আমার জীবন-কাহিনি*, মনোদা দেবী দাশগুপ্তার *জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী*— এই পনেরোজন লেখিকার পনেরোটি আত্মকথাকে

আমরা গবেষণাকর্মের জন্যে নির্বাচন করেছি।

এই নির্বাচিত আত্মকথাগুলি নিয়ে কেন আমাদের গবেষণা— এ প্রশ্ন অনায়াসেই এসে যায়। এর উত্তরে বলা যায়, নারী রচিত এসব আত্মকথায় উনিশ শতকের সমাজে তাঁদের অবস্থান এবং সমাজে প্রচলিত বহু কুসংস্কার, বাল্যবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা, নারী শিক্ষা, নারীবাদী ভাবনা, আধ্যাত্মিক ভাবনা, ব্রাহ্মসমাজের কথা, ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের বিরোধ প্রভৃতি বিষয় উঠে এসেছে— যা উনিশ শতকের বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির নির্ভরযোগ্য দলিল হয়ে উঠেছে। ইতিপূর্বে এই বিষয় নিয়ে গবেষণাকর্মের কোনো দৃষ্টান্ত নেই। তবে কয়েকটি গ্রন্থে বিক্ষিপ্তভাবে বর্ণনামূলক রীতিতে এসব আত্মকথা নিয়ে আলোচনা করা হলেও সংস্কৃতির নানা দিক সেসব গ্রন্থে আলোচিত হয়নি। আবার কয়েকটি গ্রন্থে আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলির মধ্যে কয়েকটি আত্মকথার উপর ভিত্তি করে মূলত তৎকালীন সময়ে নারীদের সামাজিক অবস্থান দেখানো হয়েছে। আমরা নির্বাচিত আত্মকথাগুলিতে লেখিকাদের ব্যক্তিগত জীবন-কাহিনির পাশাপাশি তৎকালীন সময়ের সমাজ ও সংস্কৃতির নানা দিক দেখানোর চেষ্টা করেছি। এই গবেষণাকর্মে যে দিকগুলি দেখানো হয়েছে, তা পূর্বে কোনো গবেষক বা লেখক দেখাননি বলে আমার ধারণা। এই গবেষণাকর্মটিতে দেখানো হয়েছে উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের ফলে এদেশের স্বল্পসংখ্যক মানুষের ভাবনা-চিন্তার পরিবর্তনে এতদিনের স্থবির সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তনের চিত্রকে। আর সমাজ ও সংস্কৃতির এই পরিবর্তন মূলত সূচিত হয়েছে নারীকে কেন্দ্র করে। উনিশ শতকে নারীদের সামাজিক অবস্থান ও তার পরিবর্তন, নারী শিক্ষার সূচনা, নারীদের ব্যক্তিসত্তার জাগরণ, নারীদের আধ্যাত্মিক জীবন প্রভৃতি বিষয়কে এই গবেষণাকর্মে তুলে ধরা হয়েছে নির্বাচিত আত্মকথাগুলিকে কেন্দ্র করে। উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতির এসব বিষয়ের অন্বেষণ ও বিশ্লেষণই এই গবেষণাকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

উপরিউক্ত বিষয়গুলিকে আমরা সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। সব শেষে আছে উপসংহার অংশ।

প্রথম অধ্যায়: উনিশ শতকের সামাজিক প্রেক্ষাপট: নারী ভাবনার উন্মেষ

দ্বিতীয় অধ্যায়: উনিশ শতকের লেখিকাদের পরিচিতি এবং তাঁদের রচনার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

তৃতীয় অধ্যায়: নারীর আত্মকথায় উনিশ শতক : নারী শিক্ষার প্রসঙ্গ

চতুর্থ অধ্যায়: নারীর আত্মকথায় উনিশ শতক : সামাজিক নানা প্রসঙ্গ

পঞ্চম অধ্যায়: নারীর আত্মকথায় উনিশ শতক : নারীবাদী ভাবনা

ষষ্ঠ অধ্যায় : নারীর আত্মকথায় উনিশ শতক : আধ্যাত্মিক ভাবনা

সপ্তম অধ্যায়: নারীর আত্মকথায় উনিশ শতক : ভাষা ব্যবহার প্রসঙ্গ

উপসংহার

প্রথম অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে নবজাগরণের প্রভাবে নারীদের সামাজিক শোষণের হাতিয়াররূপী বিভিন্ন কুপ্রথার বিরুদ্ধে এদেশের কিছু শিক্ষিত প্রগতিশীল মানুষদের সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলন। আর উনিশ শতকে নবজাগরণের ফলপ্রসূত এসব সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলনে কীভাবে নারী প্রগতিশীল ভাবনার সূচনা ও বিস্তার ঘটেছিল— তা এই অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে উনিশ শতকে বাংলাদেশে নারী শিক্ষার প্রচলনে বহু নারী লেখাপড়া শিখে নিজস্ব জীবন-অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় রূপ দিতে থাকেন। এই অধ্যায়ে আমরা নির্বাচিত পনেরোজন লেখিকাদের পাশাপাশি জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, প্রিয়ম্বদা দেবী, হিরণ্ময়ী দেবী, হেমাঙ্গিনী দেবী, হেমলতা সরকার, সরলাদেবী চৌধুরাণী, রাজলক্ষ্মী দেব্যা, সরোজকুমারী গুপ্তা প্রমুখ উনিশ শতকের লেখিকাদের এবং তাঁদের রচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরেছি।

তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় উনিশ শতকের গোড়ার দিকে অনেক গৃহস্থ পরিবার, খ্রিস্টান মিশনারি, ব্রাহ্মসমাজ— এদের প্রচেষ্টায় স্বল্পসংখ্যক নারীর শিক্ষা লাভ, বেথুন সাহেবের প্রচেষ্টায় উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নারী শিক্ষার প্রকৃত সূচনা এবং বিদ্যাসাগরের হাতে নারী শিক্ষার বিস্তৃতি। আর আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলিতে উনিশ শতকে নারী শিক্ষা প্রচলনে এসব প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ কীভাবে উঠে এসেছে— তা এই অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলিকে কেন্দ্র করে দেখানো হয়েছে উনিশ শতকে এদেশের সমাজে প্রচলিত বাল্যবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা, নারীদের আব্রুপ্রথা, হিন্দু বিধবা নারীর নির্জলা একাদশী পালন, সামাজিক ও শাস্ত্রীয় নানা বিধি-নিষেধ প্রভৃতি এদেশের নারীদের জীবনকে যন্ত্রণাময় করে তুলেছিল। পাশাপাশি তৎকালীন সমাজে প্রচলিত জাত-পাতের দ্বন্দ্ব, একঘরে প্রথা, সম্ভ্রান্ত পরিবারের বাবু বিলাস, হিন্দু রক্ষণশীল সমাজের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের দ্বন্দ্ব প্রভৃতি সামাজিক নানা প্রসঙ্গ সম্পর্কে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলিতে তথাকথিত অর্থে নারীবাদী ভাবনা ফুটে না উঠলেও সেগুলিতে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীদের পরাধীন জীবন-যাপন,

শোষণ-যন্ত্রণা প্রভৃতি বর্ণনার পাশাপাশি কখনো কখনো পিতৃতান্ত্রিক সমাজের সনাতন ঐতিহ্য, বিধি-নিষেধ প্রভৃতিকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে পরোক্ষভাবে নারীবাদী ভাবনার প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছিল— যা বিশ শতকে এদেশের লেখিকাদের হাতে পূর্ণতা পায়। আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলিতে এই নারীবাদী ভাবনার প্রেক্ষাপট নানা প্রসঙ্গে কীভাবে উঠে এসেছে— তা এই অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলির লেখিকারা নিজেদের জীবন-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি প্রত্যাশায় সান্ত্বনা খুঁজে পাওয়ার জন্যে কীভাবে আধ্যাত্মিক ভাবনায় বড় বেশি বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। আর লেখিকাদের এই আধ্যাত্মিক বিশ্বাসই জীবনে চলার পথে কীভাবে তাঁদের জীবনদর্শন, মূল্যবোধ তৈরি করে দিয়েছে— এই অধ্যায়ে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলির লেখিকারা উনিশ শতকে নারী শিক্ষার সূত্রপাত হলে স্বল্প লেখাপড়া শিখে নিজেদের জীবন-অভিজ্ঞতার কথা লিখতে গিয়ে বিস্তর ব্যাকরণ-শৈলী-বানান প্রভৃতি ভুল-ত্রুটি করেছেন। তবে তাঁরা ব্যাকরণ-শৈলী-বানান প্রভৃতি ভুলত্রুটি করলেও তাঁরা নিজেদের সামাজিক অবস্থান ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে পৃথক পৃথক ভাষা ব্যবহারে, একান্ত নিজস্ব নারী ভাষার ব্যবহারে, নিজস্ব বলার ভঙ্গির গুণে এবং সহজ-সরল ভাষার ব্যবহারে কীভাবে সেকালের সাপেক্ষে স্বতন্ত্র ভাষার ব্যবহার করেছিলেন— তা এই অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে।

সর্বশেষ অধ্যায়ে আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলিকে কেন্দ্র করে উনিশ শতকে এদেশের পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীদের অবস্থান ও সংস্কৃতির নানা দিকের সামগ্রিক মূল্যায়ন করা হয়েছে। গবেষণাকর্মের সাতটি অধ্যায়ে উনিশ শতকের নবজাগরণের প্রভাবে নারীকেন্দ্রিক সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে নারী মুক্তির ভাবনা, নারী শিক্ষা প্রচলনে স্বল্পসংখ্যক নারীর শিক্ষা লাভ করে সাহিত্য সৃষ্টি, বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে নারী শিক্ষার সূচনা, উনিশ শতকে এদেশের সামাজিক নানা প্রথা-সংস্কার, নারীদের আধ্যাত্মিক চেতনা, নারীদের ব্যক্তিসত্তার জাগরণ প্রভৃতি বিষয়ের উদ্‌ঘাটনে আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলির ভূমিকার মূল্যায়ন করা হয়েছে। এছাড়া উনিশ শতকের এদেশের সমাজ-সংস্কৃতি ও নারীর বিশ্বস্ত চিত্র স্বতন্ত্র ভাষা ব্যবহারে তুলে ধরে আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলির লেখিকারা যে বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়েছেন— তারও মূল্যায়ন করা হয়েছে এখানে।

প্রাক্‌কথন

কোচবিহার জেলার দিনহাটা মহাবিদ্যালয়ে বাংলা সাম্মানিক নিয়ে পড়ার সময় পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত আশাপূর্ণা দেবীর *প্রথম প্রতিশ্রুতি* উপন্যাসটি পাঠ করে একটু ভিন্ন বিষয়ের আস্বাদ পাই। পূর্বে কোচবিহার শহরে অবস্থিত *উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার* থেকে অনেক উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা পাঠ করেছি— সেগুলির অধিকাংশই পুরুষের লেখা এবং সেগুলি মূলত পুরুষকেন্দ্রিক রচনা, তবে সেগুলির মধ্যে কিছু রচনায় নারীর কথা থাকলেও সেগুলি পুরুষের দৃষ্টিতে নারীর কথা হওয়ায় *প্রথম প্রতিশ্রুতি*-র মতো অকৃত্রিম হতে পারেনি। তাই সেসময় নারীর লেখায় নারীর বিষয় যে একটু ভিন্ন মাত্রা পায় সে বিষয়ে একটা ভাবনা তৈরি হয়ে যায়। আর সেই ভাবনা থেকেই সেসময় *প্রথম প্রতিশ্রুতি*-র পরবর্তী দুটি খণ্ড *সুবর্ণলতা* এবং *বকুলকথা* উপন্যাস দুটি পড়ে ফেলি। মূলত তখন থেকেই নারীর লেখায় নারীর কথা বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠি। এই আগ্রহ থেকেই দিনহাটা মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার এবং *উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার* থেকে নারীর লেখা বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থ পাঠ করি। এসময়ে পাঠ করে ফেলি রাসসুন্দরী দাসীর *আমার জীবন* এবং বিনোদিনী দাসীর *আমার কথা* নামক আত্মকথা। তারপর দিনহাটা মহাবিদ্যালয় থেকে স্নাতক বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে পাঠ গ্রহণ করি। সেখানে দু'বছর অধ্যয়নের সময় পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত আশাপূর্ণা দেবী ও মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পগুলি একদিকে যেমন আমার আগ্রহের বিষয় নারীর লেখায় নারীর জীবন ও সংস্কৃতির খোরাক জোগায়, তেমনি পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ* গ্রন্থটি উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কেও আমায় কৌতূহলী করে তোলে। সেই কৌতূহল থেকেই এসময় আমি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগার থেকে নারীর লেখা বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠের পাশাপাশি উনিশ শতক সংক্রান্ত বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ করে উনিশ শতকে বাংলাদেশের নবজাগরণ, নারীদের দুরবস্থা নিয়ে ভাবনা-চিন্তার উন্মেষ, উনিশ শতকের এদেশের জীবন ও সংস্কৃতি প্রভৃতি সম্পর্কে পরিচিত হই এবং এ বিষয়েও একটা ভালোলাগা তৈরি হয়ে যায়। নারীর লেখায় নারীর জীবন ও সংস্কৃতি এবং উনিশ শতকের বাংলাদেশের জীবন ও সংস্কৃতি— এ দুটি বিষয়কে একত্র করে গবেষণাকর্মের কথা ভাবনা-চিন্তা করি। পরবর্তীকালে আমি বিষয়টি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. উৎপল মণ্ডল মহাশয়কে জানাই। তখন তিনি আমাকে উনিশ শতকের জীবন ও সংস্কৃতি নিয়ে লেখা নারী আত্মকথাগুলি নিয়ে গবেষণা করার কথা বলেন। আমি এগুলির মধ্যে রাসসুন্দরী দাসীর *আমার জীবন*, সারদাসুন্দরী দেবীর *আত্মকথা*, কৈলাসবাসিনী দেবীর

ডায়েরী, প্রসন্নময়ী দেবীর *পূর্ব্বকথা*, বিনোদিনী দাসীর *আমার কথা* প্রভৃতি নারীর লেখা পনেরোটি আত্মকথাকে নির্বাচন করে গবেষণাকর্ম শুরু করি। এই নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে উনিশ শতকে এদেশের নারীদের সামাজিক অবস্থান এবং সমাজ ও সংস্কৃতির সামগ্রিক প্রতিফলন।

উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণে এদেশের স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিত পুরুষের মধ্যে যে প্রগতিশীল ভাবনা-চিন্তার উন্মেষ ঘটেছিল তার কিছুটা প্রভাব পড়েছিল এদেশের স্বল্পসংখ্যক নারীর মধ্যেও। কেননা পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এদেশের প্রগতিশীল মানুষরা রক্ষণশীলদের সঙ্গে নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নারী শিক্ষার যে আয়োজন করেছিলেন তারই ফলে এদেশের কিছু নারী শিক্ষিতা হয়ে সাহিত্য সৃষ্টিতেও ব্রতী হয়েছিলেন। আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলিও তারই ফসল। আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলিতে লেখিকারা যখন নিজেদের জীবন-অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন তখন তাঁদের লেখায় নিজেদের শিক্ষা-দীক্ষার কথা, পিতৃতান্ত্রিক সমাজে তাঁদের নিম্নমানের অবস্থানের কথা, তাঁদের জীবন-যন্ত্রণা ও অধিকারের কথা, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের কথা প্রভৃতি বিষয় যেমন উঠে এসেছে, তেমনি পরিচিত মানুষের কথা থেকে শুরু করে উনিশ শতকের সমাজ-সংস্কৃতির নানা দিকও তাঁদের লেখায় উঠে এসেছে। নবজাগরণের প্রভাবে এদেশের জীবন ও সংস্কৃতিতে একটা পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল— সেই পরিবর্তনকেই আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলির লেখিকারা নিজেদের জীবন-অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গে তুলে ধরেছেন। আর বিভিন্ন জনের দৃষ্টিকোণ থেকে উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতির একটা পরিচয় পাওয়া যায়। আমার এই গবেষণা অভিসন্দর্ভে গবেষণাকর্মটি সাতটি অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছি। আর সর্বশেষ অধ্যায়ে আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলিকে কেন্দ্র করে উনিশ শতকে এদেশের পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীদের অবস্থান ও সংস্কৃতির নানা দিকের সামগ্রিক মূল্যায়ন করেছি।

আমার এই গবেষণাকর্ম সম্পাদনের জন্যে যিনি আমাকে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছেন, বক্তব্যবিষয়কে যুক্তি ও দৃষ্টান্ত সহযোগে বিশ্লেষণ করতে শিখিয়েছেন, নতুন পথের দিশা দেখিয়েছেন, নিরন্তর স্নেহ-উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন এবং প্রতিমুহূর্তে সুচিন্তিত ও মূল্যবান সুপরামর্শ দিয়ে গবেষণাকর্ম সম্পূর্ণ করতে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন এবং তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেছেন— তিনি হলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. উৎপল মণ্ডল মহাশয়। এছাড়া বাংলা বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপকগণ সুপরামর্শ দিয়ে আমার গবেষণা কাজে নানাভাবে সহায়তা করেছেন। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. রীতা মোদক মহাশয়া

এবং ফালাকাটা মহাবিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ড. রঞ্জন রায় মহাশয় আমার গবেষণাকর্মে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন। সর্বদা উৎসাহ দিয়েছেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় বাবা। আমার মা স্বর্গীয়া রাণু রায় আজ আর ইহজগতে নেই। তবে তাঁর কাছ থেকেই জীবনে প্রথম শিক্ষা লাভ করি এবং তিনিই আমায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষকে সম্মান করতে শিখিয়েছিলেন— তিনি সর্বদা আমার হৃদয়ে বিরাজ করে যেন জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আমায় অনুপ্রেরণা দেন। তাই নারীকেন্দ্রিক এই গবেষণাকর্মে তাঁর সুশিক্ষার কথাও স্বীকার করি। গবেষণাকর্মটি সম্পূর্ণ করার জন্যে আমার জীবন সঙ্গিনী পাপড়ি দাস নিরন্তর উৎসাহ দিয়েছে এবং নানাভাবে সাহায্য করেছে। এই গবেষণাকর্মে শ্বশুর, শাশুড়ি, দিদি ও জামাইবাবু আমায় প্রতিমুহূর্তে উৎসাহ দিয়েছেন। এছাড়াও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের গবেষক দাদা, বন্ধু ও ভাইরা আমার গবেষণাকর্মে নানাভাবে সাহায্য করেছে। গবেষক দাদা উজ্জ্বল শীল ও উত্তম দাস আমার গবেষণাকর্মে বিভিন্ন সময়ে সুপরামর্শ দিয়ে আমায় বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। এছাড়া দাদা ইউনুস মিঞা, মনোজিৎ বর্মন, শিবনারায়ণ রাউত, সম্রাট দাস, দিদি সায়নী রাহা, বন্ধুদের মধ্যে প্রসেনজিৎ দাস, দীপ চন্দ, তাপস মণ্ডল এবং ভাইদের মধ্যে পরিতোষ পাল, এহেসানুল্লা হক, রেজাউল ইসলাম, নবীন দাস, সুব্রত পাল, দীপঙ্কর সরকার, মানিক মৈত্র, হৃদয় রঞ্জন সরকার, দীপঙ্কর দেবনাথ, কেশব ঘোষ আমাকে গবেষণাকর্মে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছে। প্রুফ সংশোধনের কাজে আমায় সহযোগিতা করেছে ভাই সুব্রত দাস। সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। আর হাজার ব্যস্ততার মধ্যে এবং করোনা ভাইরাসের প্রকোপে সৃষ্ট অতিমারি পরিস্থিতির মধ্যেও খুব কম সময়ে আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভটি মুদ্রণ কার্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে সম্পূর্ণ রূপ দিয়েছে বন্ধু সুজিৎ রায়। তাকেও আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। সকলকে জানাই আমার কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

তারিখ: ০৫-১০-২০২০

তুফান রায়

তুফান রায়

ভূমিকা

উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে তথা নবজাগরণের প্রভাবে এদেশের স্বল্পসংখ্যক মানুষের চিন্তা ও ভাবনার জগতে একটা পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। আর তার প্রতিক্রিয়ায় স্বল্প হলেও এতদিনের স্থবির, অচল সমাজ-সংস্কৃতির একটা পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল যে, সংস্কৃতি বলতে আমরা সাধারণত সাহিত্য, শিল্প, সংগীত, নৃত্যকলা প্রভৃতি বুঝে থাকি। তবে সংস্কৃতি সম্পর্কে এরকম ধারণা হল খণ্ডিত ধারণা। কেননা সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতির পাশাপাশি ঘরবাড়ি, যন্ত্রপাতি, আহার-বিহার, জীবন-যাপন প্রণালী প্রভৃতিও সংস্কৃতির অন্তর্গত— এককথায় সংস্কৃতি বলতে মানুষের সামগ্রিক জীবন-যাত্রার রূপকে বোঝানো হয়। উনিশ শতকে এদেশের প্রগতিশীল মানুষদের ভাবনা-চিন্তা ও সমাজ-সংস্কারের ফলে নারীদের সামগ্রিক জীবন-যাত্রার একটা বড় রকমের পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। আর এই পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল মূলত নারীদের নিয়ে প্রগতিশীলদের ভাবনা-চিন্তা এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে সৃষ্ট নারী শিক্ষা আন্দোলনে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে নারী শিক্ষার সূচনায়। কেননা নারী শিক্ষার সূচনা হলে সে সুযোগে এদেশের স্বল্পসংখ্যক নারী শিক্ষিতা হয়ে সাহিত্যচর্চাও করেছিলেন— লিপিবদ্ধ করেছিলেন নিজেদের জীবন-অভিজ্ঞতার কথা। আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলিরও সৃষ্টি হয়েছে এভাবেই। ফলে উনিশ শতকে আমরা আকস্মিকভাবে বাংলা সাহিত্যে বেশ কয়েকজন লেখিকা পেয়ে যাই। অথচ সমগ্র মধ্যযুগে চন্দ্রাবতী ব্যতীত আর কোনো লেখিকার সন্ধান আমরা এখন পর্যন্ত পাইনি— অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এদেশে নারী শিক্ষা নিষিদ্ধ ছিল বলে। সুতরাং উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এদেশে নারী শিক্ষার সূচনা যে লেখিকাদের আবির্ভাবকে সুনিশ্চিত করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

আমরা জানি উনিশ শতকের অধিকাংশ লেখিকার সাহিত্যচর্চার মূল বিষয় ছিল কাব্য-কবিতা। সেকালে বিশেষভাবে নারীর লেখা প্রকাশ করতো এমন কিছু পত্রিকার সম্পাদকেরাও মনে করতেন নারীরা শুধু আবেগসমৃদ্ধ কবিতা লিখবে, বুদ্ধিদীপ্ত গদ্যরচনা তাঁদের দ্বারা সম্ভব নয়, পুরুষরাই শুধুমাত্র মননশীল বুদ্ধিদীপ্ত গদ্যরচনা সৃষ্টি করতে পারে। তবে এ ধরনের ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করে সেকালের অনেক লেখিকাই বুদ্ধিদীপ্ত গদ্য রচনা তথা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলির লেখিকারাও নিজেদের জীবন-অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে সেকালের সমাজ-সংস্কৃতির যে পরিচয় তুলে ধরেছেন— তার মধ্য দিয়ে বুদ্ধিদীপ্ত ভাবনারও পরিচয় কোনো

কোনো ক্ষেত্রে আমরা পেয়ে যাই। এমনকি বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রকাশিত আত্মজীবনীটি একজন নারীর রচনা— সেটি হল রাসসুন্দরী দাসীর *আমার জীবন*। আবার উনিশ শতকের সংস্কৃতির পরিবর্তন যেমন আত্মকথাগুলির সৃষ্টির সম্ভাবনাকে সুনিশ্চিত করেছে, তেমনি এসব আত্মকথায় লেখিকাদের নিজস্ব জীবনকথার পাশাপাশি সেকালের সংস্কৃতিরও নানা দিক উঠে এসেছে। যেমন, আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলিতে লেখিকাদের নিজস্ব জীবনকথার পাশাপাশি উনিশ শতকের বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সমাজ-সংস্কার আন্দোলন, রক্ষণশীল সমাজের নানা প্রথা-সংস্কার এবং তা নিয়ে রক্ষণশীলদের সঙ্গে প্রগতিশীলদের সংঘাত, সেকালে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীদের পরাধীন জীবন-যাপন; ধীরে ধীরে নারীদের ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠা ও অস্ফুট প্রতিবাদ, সেকালের অসহায়-পরাধীন নারীদের একমাত্র সান্ত্বনার আশ্রয় ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ, ঈশ্বরে ভক্তি প্রভৃতি বিষয়ের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। আর এসব বিষয় লেখিকারা ছোট ছোট বাক্যে, একান্ত নিজস্ব নারী ভাষা ব্যবহারে সহজ-সরল করে উপস্থাপন করেছেন। এভাবে লেখিকাদের ব্যবহৃত ভাষা সেকালের লেখকদের তুলনায় স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে। আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলিতে লেখিকাদের নিজস্ব জীবন-অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কীভাবে উনিশ শতকের এদেশের নারীদের সামাজিক অবস্থান এবং সেকালের সংস্কৃতির নানা দিক উঠে এসেছে— তারই অন্বেষণ ও বিশ্লেষণ আমাদের এই গবেষণা কর্মের লক্ষ্য। আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলির লেখিকারা নিজস্ব জীবন-অভিজ্ঞতা দিয়ে সেকালের সমাজ- সংস্কৃতির যে সংঘাত ও পরিবর্তন লক্ষ করেছেন, সেসব বিষয়কেই তাঁরা তুলে ধরেছেন তাঁদের লেখায়। আর বহুকৌণিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তা আরও বিশ্বস্ত হয়ে উঠেছে। বস্তুত উনিশ শতকে এদেশের নবজাগরণের ফলে শুধুমাত্র এদেশের স্বল্পসংখ্যক পুরুষেরই চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তন হয়নি, এই নবজাগরণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় এদেশের স্বল্পসংখ্যক নারীরও চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তন হয়েছিল। কেননা সেকালে নারীদের ভাবনা-চিন্তার পরিবর্তন না হলে আমাদের নির্বাচিত অধিকাংশ আত্মকথাগুলির লেখিকারা সেকালের প্রেক্ষাপটে সামান্য লেখাপড়া শিখে নিজেদের জীবন-কাহিনি লেখার কথা কখনো ভাবতেই পারতেন না। তাঁদের এই চারিত্রিক দৃঢ়তাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁদের স্মরণীয় করে রেখেছে।

প্রথম অধ্যায়

উনিশ শতকের সামাজিক প্রেক্ষাপট : নারী ভাবনার উন্মেষ

সমাজ নিয়ত পরিবর্তনশীল— এই সমাজের পরিবর্তন ঘটে অনেক সময় স্বল্প সময়ের ব্যবধানে, আবার অনেক সময় দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে। উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে বাংলাদেশে যে রেনেসাঁস বা নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল তার ফলে এদেশের সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতিতে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে একটা বড় রকমের পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। বহু কুসংস্কারে জীর্ণ সমাজ-ব্যবস্থাকে ভেঙে নতুন করে নির্মাণের ভাবনা-চিন্তা দেখা গেল। এই নবজাগরণের ফলে সমাজে দীর্ঘ সময় ধরে প্রচলিত সামাজিক ও ধর্মীয় প্রথা, সংস্কার, ধ্যান-ধারণা নিয়ে নতুন ভাবনা-চিন্তা দেখা গেল। কিছু প্রগতিশীল মানুষের মনে সতীদাহপ্রথার যৌক্তিকতা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, নারীদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে রাখা প্রভৃতি বিষয়ে নানা জিজ্ঞাসা দেখা গেল। আর এসব ভাবনা-চিন্তার ফসল হিসেবে উনিশ শতকে এদেশে কতগুলি সমাজ-সংস্কার আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য সমাজ-সংস্কার আন্দোলনগুলি হল— সতীদাহ আন্দোলন,বিধবাবিবাহ আন্দোলন, বহুবিবাহ আন্দোলন, বাল্যবিবাহ আন্দোলন, নারী শিক্ষা আন্দোলন। এই সমাজ-সংস্কার আন্দোলনগুলির দিকে লক্ষ করলেই বোঝা যায় যে, এগুলি মূলত নারীকেন্দ্রিক অর্থাৎ নারীদের অবস্থানের পরিবর্তনের জন্যে এগুলি সংঘটিত হয়েছে। কেননা উনিশ শতকেও এদেশের নারীদের সামাজিক অবস্থান ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের— পিতৃতান্ত্রিক সমাজে তাদের কোন পৃথক মানবসত্তাকে স্বীকার করা হয়নি, তারা ছিল পুরুষের দাসী এবং সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র মাত্র। আর নারীদের এই পরাধীনতার মূলে ছিল পিতৃতান্ত্রিক সমাজে প্রচলিত নানা সমাজিক ও ধর্মীয় প্রথা, রীতি-নীতি, কুসংস্কার প্রভৃতি। তাই উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এদেশের কিছু প্রগতিশীল মানুষ পাশ্চাত্য উদারতা ও যুক্তিবাদী ভাবনায় সমৃদ্ধ হয়ে এদেশের নারীদের নিম্নমানের সামাজিক অবস্থান ও দুরবস্থা দেখে বেদনাবোধ করেছিলেন। নবজাগরণ প্রসূত নতুন ভাবনার দ্বারা ভাবিত হয়ে তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে, নারীদের এরকম সামাজিক অবস্থান এবং পরিণতির মূলে আছে এদেশের পিতৃতান্ত্রিক সমাজে দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত বিভিন্ন কুপ্রথা এবং সামাজিক ও শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ। তাই তাঁরা নারীদের অবস্থার উন্নতির জন্যে এসকল কুপ্রথা ও বিধি-নিষেধ উচ্ছেদের জন্যে নানা সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলন শুরু করেছিলেন। এভাবেই

নারীদের মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রচেষ্টার সূত্রপাত। বিভিন্ন জনের প্রচেষ্টায় ঘটে নারী ভাবনার উন্মেষ তথা দীর্ঘদিনের অচলায়তন সমাজ-ব্যবস্থার শৃঙ্খলে আবদ্ধ বন্দী নারীদের মুক্ত করার প্রয়াস। এভাবে উনিশ শতকে এদেশে নবজাগরণের প্রভাবে নতুন ভাবনার উন্মেষে নারীকেন্দ্রিক নানা সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে সামাজিক নানা ঘাত-প্রতিঘাতে নারী প্রগতিশীল ভাবনার উন্মেষ ও বিস্তার ঘটেছিল।

উনিশ শতকে এদেশে নবজাগরণের প্রভাবে নতুন ভাবনার উন্মেষে সংঘটিত হয়েছিল নারীকেন্দ্রিক সমাজ-সংস্কার আন্দোলনগুলি। তাই নারীকেন্দ্রিক সমাজ-সংস্কার আন্দোলনগুলি সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে রেনেসাঁস বা নবজাগরণ বিষয়ে আলোচনা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। এখানে আমরা প্রথমে রেনেসাঁস বা নবজাগরণ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। ফরাসী ভাষা থেকে রেনেসাঁস শব্দটি নেওয়া হয়েছে। রেনেসাঁস শব্দটির একাধিক প্রতিশব্দ পাওয়া যায়, যেমন— নবজাগরণ, পুনরুজ্জীবন, নবযুগ, নবজীবন প্রভৃতি। তবে এগুলির মধ্যে রেনেসাঁস অর্থে বাংলায় ব্যবহৃত বহুপ্রচলিত শব্দটি হল নবজাগরণ। আমরা জানি ইউরোপে চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতকে যে বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু হয়েছিল তাকেই ইউরোপীয় রেনেসাঁস বলে। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের উদ্ভব ঘটেছিল পঞ্চদশ শতকে ইতালিতে এবং পরে তা ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। রেনেসাঁসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আহমদ শরীফ বলেছেন—

> ‘‘বহুকাল ধরে অবক্ষয়গ্রস্ত একটা দেশের কালের ও সমাজের কিছু শিক্ষিত মানুষ নতুন চিন্তায়-চেতনায় প্রবুদ্ধ হয়ে এতকালের জাতীয় জড়তার ও জীর্ণতার মধ্যে জীবনের ও জীবিকার নানা ক্ষেত্রে কথায়, কাজে, লেখায়, নতুন কিছু বলে, গড়ে, লিখে এবং এঁকে জনগণকে নতুন কিছু শিখিয়ে, জানিয়ে লোকমনে শক্তি, সাহস, আত্মপ্রত্যয় ও আশা জাগিয়ে এবং মাটির ও মানুষের প্রতি, স্বদেশের ও স্বভাষার প্রতি, জগতের ও জীবনের প্রতি মানুষের অনুরাগ বাড়িয়ে— এককথায় যা কিছু শ্রেয় সেসবের প্রতি সাধারণকে আকৃষ্ট করে— জাতীয় জীবনে যে উন্নয়ন ও উত্তরণ ঘটান তারই নাম রেনেসাঁস। সংজ্ঞাবদ্ধ করলে রেনেসাঁস মানে— জীবন ও জগৎজিজ্ঞাসা, অমিত কৌতূহল, সন্ধিৎসা, সিসৃক্ষা, নির্মিৎসা, উপচিকীর্ষা, শ্রেয়োচেতনা, মর্ত্যপ্রীতি, জীবনানুরাগ আর রূপতৃষ্ণা বা সৌন্দর্যচেতনা প্রভৃতির সামূহিক ও সামষ্টিক অভিব্যক্তি।’’[১]

— বাংলার নবজাগরণ বলতে এককথায় বলা যায়, উনিশ শতকে এদেশে ব্রিটিশ রাজত্বকালে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে ও একদল মনীষীর আবির্ভাবে পুরোনো ভাবনা-চিন্তার পরিবর্তে নতুন উদার ও যুক্তিবাদী ভাবনার উন্মেষে সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তন। মূলত এদেশে উনিশ শতকে ব্রিটিশ রাজত্বকালে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তারে এবং ইংরেজ ও ফরাসীদের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়ের ফলেই নবজাগরণের উদ্ভব ঘটেছিল। এ প্রসঙ্গে অন্নদাশঙ্কর রায় *বাংলার রেনেসাঁস : পুনর্ভাবনা* প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন—

> ''এদেশের রেনেসাঁসের মূলে গ্রিস রোম নয়, ইংলণ্ড ফ্রান্স। ইংরেজ ফরাসিরা এদেশে না এলে এদেশের রেনেসাঁস ভিতর থেকে ঘটত না। সংস্কৃত বা পারসিক শিক্ষা থেকেও নয়। তার জন্যে আমাদের বিদ্যার্থীদের ইউরোপ যেতে হতো। সংস্কৃত বা পারসিক চর্চা এদেশে একদিনের জন্যেও বন্ধ হয়নি। সেই উৎস থেকে রেনেসাঁস প্রবাহিত হলে বহু পূর্বেই প্রবাহিত হতো। মানতেই হবে যে তার জন্যে ইংরেজ ফরাসির প্রয়োজন ছিল।''[২]

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, শিল্পকলা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয়ের ফলেই উনিশ শতকে এদেশে নবজাগরণের উদ্ভব হয়েছিল। তবে উনিশ শতকের বাংলার রেনেসাঁস বা নবজাগরণের সঙ্গে পঞ্চদশ শতকের ইউরোপীয় রেনেসাঁসের তুলনা করলে ভুল হবে। কেননা দেশ ও কালের ব্যবধানে সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তন কখনই একরকম হয় না। তাই উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের সঙ্গে পঞ্চদশ শতকের পাশ্চাত্য নবজাগরণের সাদৃশ্য যেমন আছে, বৈসাদৃশ্যও রয়েছে বিস্তর। ইউরোপীয় রেনেসাঁস এবং বাংলার রেনেসাঁসের সাদৃশ্যে বলা যায় ইউরোপে একই সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে একদল মনীষীর আবির্ভাবে যেমন নবজাগরণের উদ্ভব ঘটেছিল, তেমনি উনিশ শতকেও এদেশে বিভিন্নক্ষেত্রে একদল মনীষীর— রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখদের আবির্ভাবে নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল। এটি নবজাগরণের অন্যতম শর্ত। এ প্রসঙ্গে আহমদ শরীফ বলেছেন—

> ''কোনো দেশে কোনো বিশেষ কালে আকস্মিকভাবে একই সময়ে যদি তেমন একদল শক্তিমানের মনীষা জীবনের, সমাজের, সংস্কৃতির, শিল্পের, সাহিত্যের, বিজ্ঞানের, দর্শনের, সমাজবিজ্ঞানের কিংবা রাষ্ট্রতত্ত্বের ক্ষেত্রে নতুন চিন্তায়, কর্মে,

> উদ্ভাবনে, আবিষ্কারে, কুসুমের মতো বিকশিত হয়ে ওঠে, তখন সেদেশের সেকালের মানুষের জাতীয় জীবনে রেনেসাঁস ঘটেছে বলে মানতে হবে। কারণ এর ফলে অর্থাৎ ওই মনীষীদের অবদানে সেদেশে সেকালে জীবনচেতনায় ও জগৎভাবনায় রূপান্তর ঘটে।"[৩]

—আবার উদারতা ও যুক্তিবাদ ইউরোপীয় রেনেসাঁসের ভিত্তি। এই উদারতা ও যুক্তিবাদকে আশ্রয় করে উনিশ শতকে এদেশের কিছু প্রগতিশীল মানুষ সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এছাড়া মানবতাবোধ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, স্বাধিকার চেতনা প্রভৃতি রেনেসাঁসের বৈশিষ্ট্যগুলি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির ফলে উনিশ শতকে এদেশেও লক্ষ করা যায়। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে বাংলার নবজাগরণের এসকল সাদৃশ্যের পাশাপাশি কিছু পার্থক্যও লক্ষ করা যায়। যেমন, ইউরোপীয় রেনেসাঁসের ফল সকল শ্রেণির মানুষেরাই ভোগ করেছিল, কিন্তু মুষ্টিমেয় মনীষীদের কর্মের দ্বারা এদেশের নবজাগরণের ফল ভোগ করেছিল শুধুমাত্র উচ্চবর্ণের হিন্দুরাই। আবার ইউরোপীয় রেনেসাঁসের ব্যাপ্তি ছিল বিস্তৃত— তা ইতালিতে শুরু হয়ে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত ছিল এবং সময়কালের দিক থেকে দেখতে গেলে এর ব্যাপ্তি ছিল তিন/চারশ বছর। অপরদিকে বাংলার নবজাগরণ শুধুমাত্র বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং সময়কালের দিক থেকে বাংলার নবজাগরণের ব্যাপ্তি একশো বছরের অধিক নয়, তা উনিশ শতকেই সীমাবদ্ধ। সুতরাং তিন/চারশ বছর ধরে ইউরোপের বহুদেশে বিস্তৃত রেনেসাঁসের সঙ্গে একশো বছর কিংবা তারও কম সময়ের বাংলার নবজাগরণ কোন দিক থেকেই সমান বা তুলনীয় হতে পারে না। ইউরোপীয় রেনেসাঁসে ভাবনা-চিন্তার যে পরিবর্তন ঘটেছিল তাতে জীবন ও জীবিকার সর্বক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটেছিল। কিন্তু বাংলার রেনেসাঁসে ভাবনা-চিন্তার যে পরিবর্তন হয়েছিল তার প্রতিফলন শুধু আইনে, বইপত্রে সীমাবদ্ধ ছিল— কার্যক্ষেত্রে তার তেমন প্রতিফলন লক্ষ করা যায় না। এসব পার্থক্যের নিরিখে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে উনিশ শতকে এদেশের স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিত প্রগতিশীল ব্যক্তিদের ভাবনা-চিন্তার পরিবর্তন এবং তাঁদের সীমিত সমাজ-সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডকে অনেকেই ইউরোপীয় রেনেসাঁস বা নবজাগরণের সমতুল্য বলে স্বীকার করতে রাজি নন। কেননা দেশের সাধারণ মানুষদের সঙ্গে এসকল সমাজ-সংস্কারকের কোনো যোগ ছিল না এবং এসকল সমাজ-সংস্কারকের কর্মকাণ্ডের দ্বারা দেশের সাধারণ মানুষদের তথা বৃহত্তর সমাজ-ব্যবস্থারও কোন পরিবর্তন হয়নি। এ প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ *বাংলার নবজাগৃতি* গ্রন্থে লিখেছেন—

> ‘‘... বাংলার নবজাগরণ মূলত নগরকেন্দ্রিক পাশ্চাত্ত্য বিদ্যাশিক্ষিত মুষ্টিমেয় এলিটের মস্তিষ্কের আন্দোলন, দেশের মানুষের আন্দোলন নয়। আমাদের দেশের মতো ঐতিহ্যানুগামী সমাজে (tradition-bound Society) পুরাতন সামাজিক ইন্‌স্টিটিউশনের শক্তি যে কত সংহত ও সুদৃঢ়, তা ব্রিটিশ শাসনমুক্তির প্রায় পঁচিশ বছর পরেও, আধুনিক যন্ত্রোন্নত শিল্পায়নের সামাজিক প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও, আজও আমরা ধর্মবৈষম্য জাতিভেদ প্রভৃতির সদম্ভ আত্মপ্রকাশে বুঝতে পারছি। কাজেই উনিশ শতকে এই সমস্ত ইন্‌স্টিটিউশনের লৌহপ্রাচীরে প্রতিহত হয়ে বাংলার নবজাগরণের আদর্শ কিভাবে খণ্ডিত ও ছিন্নবিচ্ছিন্ন হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়।’’[৪]

—উক্ত গ্রন্থে বিনয় ঘোষ দেখাতে চেয়েছেন, উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণ ব্যর্থ হয়েছে ধর্মসংস্কার-সমাজসংস্কার সকল দিক থেকেই। উদাহরণ হিসেবে তিনি দেখিয়েছেন সাধারণ মানুষ মেনে না নেওয়ায় ধর্মসংস্কারে ব্রাহ্মদের ব্যর্থতা এবং সমাজসংস্কারে বিধবাবিবাহ আন্দোলনের ব্যর্থতা।

উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণ ব্যর্থ বলে ধরে নিলেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এই নবজাগরণের ফলে এদেশের মুষ্টিমেয় বাঙালিদের মনে চিন্তা-ভাবনার যে পরিবর্তন এসেছিল তার ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তী শতকের জাতীয়তাবাদী ভাবনার সূত্রপাত হয়েছিল। আবার উনিশ শতকে বাংলার রেনেসাঁসে বা নবজাগরণে সৃষ্টির চেয়ে সমাজ-সংস্কার আন্দোলনগুলিই বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। উনিশ শতকে এদেশে নবজাগরণের ফলে সতীদাহ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল এবং এই আন্দোলনের সাফল্যে পরবর্তীকালে অন্যান্য সমাজ-সংস্কার আন্দোলনগুলি সংঘটিত হয়েছিল। আর এই সমাজ-সংস্কার আন্দোলনগুলির ফলে এদেশের স্বল্পসংখ্যক নারী অন্তত অন্ধকার, বন্দী জীবন থেকে মুক্তির দিশা পেয়েছিল। সুতরাং আমরা বলতেই পারি, উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণে এদেশের প্রগতিশীল মানুষদের চিন্তা-ভাবনায় যে নতুন আলোড়নের জাগরণ ঘটেছিল তার ফলে সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলনগুলির মধ্য দিয়ে নারী ভাবনার তথা স্বল্পসংখ্যক নারীর বন্দী-পরাধীন জীবন থেকে মুক্তির প্রথম সোপান রচিত হয়েছিল। সুতরাং উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণে স্বল্পসংখ্যক মানুষের জাগরণ হলেও এর গুরুত্ব কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

বাংলার নবজাগরণের কালসীমা ধরা হয় উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত। আর বাংলার নবজাগরণের প্রথম পুরুষ হিসেবে রামমোহন রায়কে এবং শেষ পুরুষ হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে বিবেচনা করা হয়েছে। বাংলার নবজাগরণের প্রাণ-পুরুষ হলেন রামমোহন রায়। কেননা রামমোহন রায়ই প্রথম ধর্মসংস্কার ও সমাজ-সংস্কার দ্বারা পুরনো ধ্যান-ধারণা ও প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থায় আঘাত হেনেছিলেন। আর বিদ্যাসাগর ছিলেন উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের শ্রেষ্ঠ পুরুষ। কেননা রেনেসাঁস বা নবজাগরণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদ বিদ্যাসাগরের কর্মকাণ্ডে লক্ষ করা যায়। এ প্রসঙ্গে খোন্দকার সিরাজুল হক *বাংলার রেনেসাঁস ও কাজী আবদুল ওদুদ* প্রবন্ধে কাজী আবদুল ওদুদের *বাংলার জাগরণ* গ্রন্থ থেকে যে উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন তার উল্লেখ করা যেতে পারে—

> ‘‘তাঁকে সাধারণত দেখা হয় বাংলা গদ্যের একজন বিশিষ্ট লেখক আর একজন অসামান্য দাতা ও তেজস্বী পুরুষ রূপে। তাঁর এই সর্বজনগ্রাহ্য পরিচয় অসার্থক নয় আদৌ। তবু তাঁর মনের যে বিশেষ গঠন তার পরিচয় নেবারও প্রয়োজন আছে। ... বিধবা বিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত এটি প্রমাণ করতে তিনি বিশেষ শ্রম স্বীকার করেন, রামমোহনের পরে এমন নির্গুণ শাস্ত্র-বিচার আর দেখা যায় নি। কিন্তু প্রাচীন শাস্ত্রের বিচার বিশ্লেষণ করে তিনি যা দাঁড় করালেন, সেটি যুক্তিবাদী সিদ্ধান্ত ভিন্ন আর কিছু নয়।’’[৫]

উনিশ শতকে এদেশে সংঘটিত প্রথম সমাজ-সংস্কার আন্দোলন হল সতীদাহ আন্দোলন। পূর্বে সাধ্বী ও পতিব্রতা স্ত্রীকেই সতী রূপে বিবেচনা করা হতো। পরবর্তীকালে সতী শব্দটি সতীদাহে পরিবর্তিত হয়। এর কারণ হিসেবে অনেকে মনে করেন, এর মূলে রয়েছে শিবের স্ত্রী তথা দক্ষের কন্যা সতীর স্বামী নিন্দা সহ্য করতে না পেরে আগুনে আত্মাহুতি দেওয়ার ঘটনা। আনুমানিক ৬০০ সালে লেখা *কালিকা ও ভাগবত* পুরাণে শিব পত্নী সতীর স্বামী নিন্দা সহ্য করতে না পেরে আত্মত্যাগের পৌরাণিক ঘটনার বর্ণনা আছে। অনুমান করা হয়, মূলত এই সময় থেকেই সতী শব্দটি সতীদাহের মতো পৈশাচিক ঘটনায় রূপান্তরিত হতে থাকে। কেননা শিব পত্নী সতীর স্বামী নিন্দা সহ্য করতে না পেরে দক্ষযজ্ঞের আগুনে আত্মাহুতি দেওয়ার ঘটনার প্রভাবে এদেশের নারীদেরও সতী হওয়ার অন্যতম শর্ত হয়ে উঠেছিল স্বামীর চিতায় পুড়ে মরা। এভাবে পরবর্তীকালে সতীর সংজ্ঞাও পাল্টে গেছে। যেমন, হারিৎ বলেছেন— স্বামীর সুখে-দুঃখে যে স্ত্রী সুখী-দুঃখী হয়, স্বামী বিদেশে গেলে

যে স্ত্রী স্বামীর চিন্তায় সর্বদা ব্যাকুল থাকে এবং স্বামীর মৃত্যুতে যে স্ত্রী সহমৃতা হয় তাকেই সতী বলে। আবার *The Oxford English Dictionary*-তে বলা হয়েছে, যে স্ত্রী মৃত স্বামীর চিতায় আরোহন করে আত্মবিসর্জন দেয় সেই স্ত্রীই সতী। ভারতে প্রাচীনকালেও সতীদাহপ্রথার প্রচলন ছিল। এর প্রমাণ রয়েছে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে। এ প্রসঙ্গে স্বপন বসু লিখেছেন—

> ''প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে সতীপ্রথার প্রচুর উল্লেখ মেলে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তের সপ্তম ও অষ্টম-এই দুটি ঋক্ সহমরণ বিষয়ক বলে বিখ্যাত। ... ঋগ্বেদে এর উল্লেখ আছে কিনা তা বিতর্কের বিষয় হলেও, রামায়ণ, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতে এই প্রথার উল্লেখ আছে। এছাড়া ভাসের দূত ঘটোৎকচ ও ঊরুভঙ্গ-এ, কালিদাসের কুমারসম্ভব-এ, শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক-এ, ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার-এ এর কথা আছে। কথাসরিৎসাগর-এ সতীপ্রসঙ্গ পাই। জ্যোতিষাচার্য বরাহমিহির সতীর প্রশস্তি গেয়েছেন, বাৎসায়নের কামসূত্রে এর উল্লেখ মেলে। 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ'-এ সতীপ্রথার উল্লেখ পাই। অন্যান্য স্মৃতিসংহিতাগুলিতেও (যেমন পরাশর সংহিতা, ব্যাস সংহিতা, বিষ্ণু সংহিতা, অত্রি সংহিতা, দক্ষ সংহিতা ইত্যাদি) এর উল্লেখ আছে।''[৬]

—এসকল উদাহরণ থেকে আমাদের অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে, এদেশে প্রাচীনকাল থেকেই সতীদাহপ্রথা একটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক প্রথা ছিল।

প্রাচীনকালে স্ত্রী যাতে স্বামীকে বিষপ্রয়োগ করে হত্যা করতে না পারে সেজন্য সতীদাহপ্রথার উদ্ভব হয়েছিল বলে জনশ্রুতি থাকলেও আসলে কয়েকটি কারণে সতীদাহপ্রথার উদ্ভব হয়েছিল । আমরা জানি পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর স্বতন্ত্র কোন মূল্য নেই— স্বামী ছাড়া স্ত্রীর যেন পৃথক কোনো অস্তিত্বই নেই। তাই পিতৃতান্ত্রিক সমাজে স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীরও পার্থিব সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষারও যেন অবসান ঘটে। তাই স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর মৃত্যুও অবধারিত হয়ে যায়। আর এর সঙ্গে যুক্ত হয় পরলোক ভাবনা। পুরুষ মৃত্যুর পরে স্ত্রীসংসর্গ যদি না পায় তাহলে তার কাছে পরলোকের অনন্ত সুখ-সৌভাগ্যের কোনো মূল্য থাকবে না। তাই স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীকেও আত্মবিসর্জন দিতে হবে স্বামীর চিতায় পুড়ে মরে— পরলোকে স্বামীকে যৌনসুখ দেওয়ার জন্যে, স্বামীর সেবা করার জন্যে। এ প্রসঙ্গে স্বপন বসু মন্তব্য করেছেন—

> ''আমাদের মনে হয়, সতীপ্রথার পেছনে আছে পুরুষাধিকারের ঘোষণা— নারী

পুরুষের সম্পত্তি, তাদের কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই, সকল বিষয়েই তারা পুরুষের অধীন, কাজেই তাকে যথেচ্ছ ভোগদখল করবে পুরুষ। চিরজীবন নারী তারই থাকবে, শুধু তাই নয়, পরলোকেও তাকে তার সঙ্গী হতে হবে! জীবনে-মরণে নারী শুধু দাসী । যে-কোনো মূল্যে তাই তাকে শারীরিক-শুচিতা রক্ষা করে চলতে হবে। আর এই শুচিতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনে নারীকে চিতায় গিয়ে উঠতে হবে।"[৭]

— এছাড়া পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীরা যেহেতু আর্থিক দিক থেকে স্বাবলম্বী ছিল না সেহেতু তাদের স্বামীর ওপরেই নির্ভর করে থাকতে হতো। তাই স্বামীর মৃত্যুকে মনে করা হতো স্ত্রীর জীবনের মর্মান্তিক ঘটনা। আর নারীরা আর্থিক দিক থেকে স্বাবলম্বী না হওয়ায় স্বামীর মৃত্যু হলে নারীদের জীবন ধারণের জন্যে পুত্র কিংবা কোন নিকট আত্মীয়ের ওপর নির্ভর করতে হতো এবং সেজন্যে তাদের নানা লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করতে হতো। এছাড়া রয়েছে কামুক পুরুষের আহ্বান। জৈবিক তাড়নায় অনেক সময় কামুক পুরুষের আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়ে বিধবা নারীদের ইহকাল-পরকাল নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল । তাই এসকল বিষয় থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যে এদেশের অনেক নারী স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হওয়াকেই শ্রেয় বলে মনে করতো। এর ওপরে আবার সতী হলে সমাজের চোখে রাতারাতি সম্মানীয়া হয়ে ওঠার সম্ভাবনাও ছিল । আবার স্বর্গসুখের বাসনায় অনেক নারীই স্বেচ্ছায় স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যেতো। সেকালের সংবাদপত্রগুলিতে এরকম ঘটনার প্রমাণ রয়েছে। যেমন, ১৬ আগস্ট ১৮২৩ সালে *সমাচার দর্পণ* পত্রিকায় লেখা হয়েছে—

''মঙ্গলবারের কলিকাতা জরনেল কাগজে সহমরণবিষয়ক শান্তিপুরের এক পত্র ছাপা হইয়াছে তাহাতে জানা গেল যে অষ্টাদশ বৎসরবয়স্কা এক স্ত্রী পরমসুন্দরী স্বামী মরিলে পর আপনি সহমরণার্থে কৃতনিশ্চয় হইয়া ঐ শবের সহিত শান্তিপুরসমীপস্থ সুরধুনী তীরে আইল। এই বিষয় সমাচার পাইয়া মোং শান্তিপুরের থানাদার নানা লোক সমেত মানা করিতে সেস্থানে পঁহুছিল এবং ঐ স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল যে তুমি কেন এই মৃত ব্যক্তির সহিত দগ্ধা হইতে বাসনা করিতেছ। ... তাহাতে সে প্রত্যুত্তর করিল যে আমার স্বামী আমার জীবিকার্থে সংস্থান রাখিয়া গিয়াছেন এবং সহমরণ করিতে আমার উপরে কেহ জোর করে না কিন্তু আমি স্বামিশবের সহিত দগ্ধা হইলে চতুর্দশ ইন্দ্রকালপর্য্যন্ত পতিলোকে বাস করিব।

এই স্বর্গ ভোগ সতী না হইলে পাই না। ... ইহার পর সে স্ত্রী ঐ শবের সহিত পুড়িয়া মরিল।"[৮]

—এছাড়া কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার স্ত্রীর ভরণ-পোষণ যাতে না করতে হয় এবং মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি যাতে তার স্ত্রী না পায় সেজন্যে পরিবাবের লোকেরা অনেক সময় মৃত ব্যক্তির স্ত্রীকে সতী হতে বাধ্য করতো। আর মৃত ব্যক্তির স্ত্রী সতী হওয়ার ফলে ব্রাহ্মণরা ভালো দক্ষিণা পেতো বলে তারা মৃত ব্যক্তির স্ত্রীকে পুণ্য সঞ্চয় ও স্বর্গপ্রাপ্তির লোভ দেখিয়ে সতী হতে প্ররোচনা দিত। এভাবে উপরিউক্ত কারণগুলির জন্যে এদেশের অনেক নারী মৃত স্বামীর সংগে সহমরণে যেতো কখনো স্বেচ্ছায়, কখনো বলপূর্বক, আবার কখনো অন্যের বাক্যজালে প্রভাবিত হয়ে।

দ্বাদশ শতক থেকে এদেশে সতীদাহপ্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হতে শুরু করে। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে এই প্রথার উল্লেখ রয়েছে। যেমন, মনসামঙ্গল কাব্যের ধারায় পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি নারায়ণ দেবের *পদ্মাপুরাণ* কাব্যে এবং সপ্তদশ শতাব্দীর কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের *পদ্মাপুরাণ বা জগতীমঙ্গল* কাব্যে সতীপ্রথার উল্লেখ রয়েছে; চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ধারায় ষোড়শ শতাব্দীর কবি দ্বিজ মাধবের *সারদামঙ্গল* বা *সারদাচরিত* কাব্যে এবং মুকুন্দ চক্রবর্তীর *অভয়ামঙ্গল* কাব্যে সতীপ্রথার উল্লেখ আছে; অনুবাদ সাহিত্যের ধারায় পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি কৃত্তিবাসের *শ্রীরামপাঁচালীতে*, অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গলের কবি ঘনরামের *শ্রীধর্মসঙ্গীত বা অনাদিমঙ্গল* কাব্যে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে এই সতীদাহপ্রথার উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি দ্বাদশ শতাব্দী থেকে এদেশের সমাজে সতীদাহপ্রথার যে ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়েছিল তা সমগ্র মধ্যযুগে অব্যাহত ছিল এবং অষ্টাদশ শতকের শেষ এবং উনিশ শতকের প্রথমদিকে তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। কেননা এসময় ব্রিটিশ সরকার এই অমানবিক প্রথার বীভৎসতা সম্পর্কে সচেতন হয়েও এদেশের প্রথা ও ধর্মবিশ্বাসে আঘাত না হানার জন্যে এই নিষ্ঠুর প্রথার অবসানে কোনরকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ব্রিটিশ সরকার এদেশে নির্বিঘ্নে শাসনকার্য পরিচালনার জন্যে এদেশের মানুষের মনে কোন প্রকার অসন্তোষ তৈরি করতে চায়নি সতীদাহপ্রথার অবসান ঘটিয়ে। এছাড়া এসময় এদেশের অধিকাংশ মানুষই ছিল সতীপ্রথা সম্পর্কে হয় বিশ্বাসী, নয়তো উদাসীন। এভাবে এসময়ে এদেশে সতীদাহের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

উনিশ শতকের প্রথমদিকে হিন্দুধর্মের বিরোধী খ্রিস্টান মিশনারিরা হিন্দুধর্মের খারাপ দিক দেখানোর জন্যে হিন্দুসমাজে প্রচলিত অমানবিক প্রথা সতীপ্রথাকে আক্রমণ করেছিলেন। যেমন,

উইলিয়াম কেরীর সহযোগী রেভারেণ্ড জন টমাস এই প্রথার বিরোধিতা করেছিলেন এবং তা বন্ধ করার জন্যে সরকারকে অনুরোধ করেছিলেন। এছাড়া শ্রীরামপুর মিশনের তিন প্রধান ব্যক্তিত্ব—উইলিয়াম কেরী, মার্শম্যান এবং ওয়ার্ড সতীদাহপ্রথার বিরুদ্ধে ছিলেন এবং তাঁদের অধীনস্থ দেশীয় কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের কেউ যাতে এরকম পৈশাচিক ঘটনা না ঘটায় সেজন্য তাঁরা নানারকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। উইলিয়াম কেরী এসময় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের দেশীয় পণ্ডিতদের মাধ্যমে সতীপ্রথা সম্পর্কে বিভিন্ন শাস্ত্রে কী কী বিধান আছে তা জেনেছিলেন। আর এসব তথ্য সংগ্রহ করে উইলিয়াম কেরী সতীদাহপ্রথা নিষিদ্ধ করার জন্যে একটি আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন ওয়েলেসলির কাছে। তবে এই আবেদনপত্রটি ব্রিটিশ সরকারকে প্রভাবিত করতে না পারলেও এক্ষেত্রে উইলিয়াম কেরীর ভূমিকাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। অর্থাৎ রামমোহন রায়ের অনেক আগে থেকেই খ্রিস্টান মিশনারিরা সতীদাহপ্রথার উচ্ছেদ সাধনে নানারকম প্রচেষ্টা করেছিলেন।

এদেশে অনেক আগে থেকেই সতীদাহপ্রথার উচ্ছেদের জন্যে ভাবনা-চিন্তা শুরু হলেও মূলত রামমোহন রায়ই সতীদাহ আন্দোলনকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। অনেকের মতে রামমোহন তাঁর বউদি অলকামঞ্জরীকে চোখের সামনে সতী হতে দেখে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এই নিষ্ঠুর প্রথার উচ্ছেদ করবেন বলে। তবে এ বিষয়ে বিতর্ক থাকলেও রামমোহন যে স্বচক্ষে সতী হবার ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এবং এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি মূলত ধর্মের নামে নারীকে পুড়িয়ে মারার পৈশাচিক প্রথার উচ্ছেদ সাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন। তাই ১৮১৮ সাল থেকে রামমোহন সতীদাহপ্রথা বন্ধ করার জন্যে সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। যদিও রামমোহনের পূর্বে এদেশের কিছু প্রগতিশীল মানুষ, খ্রিস্টান মিশনারি, কিছু ইংরেজ ব্যক্তিবর্গ প্রমুখেরা অশাস্ত্রীয় সতীদাহপ্রথার নিন্দা ও বিরোধিতা করেছিলেন তবুও এই প্রথার বিরুদ্ধে তাঁরা কোন আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেননি। তাই তাঁদের চিন্তা-ভাবনাকে ব্রিটিশ সরকার প্রাধান্য দেয়নি। কেননা ব্রিটিশ সরকার হিন্দু সমাজের কোন প্রথায় আঘাত হেনে অসন্তোষ সৃষ্টি করতে চায়নি নির্বিঘ্নে শাসনকার্য পরিচালনার জন্যে। এই সতীদাহপ্রথা নিষিদ্ধ করার জন্যে আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন যিনি তিনি হলেন রামমোহন রায়। রামমোহন এক্ষেত্রে প্রথমেই সতীদাহপ্রথা নিষিদ্ধ করার জন্যে ব্রিটিশ সরকারের কাছে কোন আবেদন করলেন না। বরং তিনি এই প্রথার ভয়াবহতা ও নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তুলতে চাইলেন। সে জন্যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে কলকাতার বিভিন্ন শ্মশানে গিয়ে সতীপ্রথা যে অশাস্ত্রীয় এবং অনৈতিক

তা বিধবা নারীদের বুঝিয়ে তাদের সতী হওয়া থেকে বিরত করতে চেষ্টা করতেন। আবার রামমোহন রায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত *আত্মীয় সভা*-র সভ্যদের সঙ্গে সতীদাহপ্রথার নিষ্ঠুরতা নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন এবং এই প্রথা যে অশাস্ত্রীয় তা বৃহত্তর জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে তিনি কয়েকটি বই (*সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ*-১৮১৮ খ্রি., *সমহরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবতর্কের দ্বিতীয় সম্বাদ*-১৮১৯খ্রি., *সহমরণ বিষয়*-১৮২৯খ্রি.) লিখে তা বিনামূল্যে মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। এভাবে রামমোহন রায় পরিকল্পনামাফিক সতীদাহপ্রথাকে বন্ধ করার জন্যে এদেশের জনগণকে সতীপ্রথার অশাস্ত্রীয়তা ও নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে চেয়েছিলেন—যাতে এদেশের জনগণই সচেতন হয়ে এই প্রথাকে বন্ধ করে দেয়। তবে তিনি প্রথমদিকে আইন করে সতীদাহপ্রথা নিষিদ্ধ করার বিপক্ষে ছিলেন। তাই লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক আইন করে সতীদাহপ্রথা নিষিদ্ধ করার প্রাক্‌মুহূর্তে এ বিষয়ে রামমোহনের পরামর্শ শোনার জন্যে রামমোহনকে ডেকে পাঠালে রামমোহন মনে-প্রাণে এ প্রথা বন্ধ করার পক্ষে থাকলেও তিনি বেন্টিঙ্ককে আইন করে সতীদাহপ্রথা রদ করতে নিষেধ করেছিলেন। কেননা রামমোহন ভেবেছিলেন আইন করে সতীদাহপ্রথা নিষিদ্ধ করলে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে তা নিয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে এবং তার ফলে ব্রিটিশ শাসকদের শাসনকার্য পরিচালনায় নানারকম বাধার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই রামমোহন উইলিয়াম বেন্টিঙ্ককে পরামর্শ দিয়েছিলেন আইন প্রণয়ন করে সতীদাহপ্রথা নিষিদ্ধ না করে, বরং আরও কিছু বিধি-নিষেধ ও পুলিশ-দারোগার সাহায্যে এ প্রথার উচ্ছেদ করতে। কিন্তু রামমোহনের এই পরামর্শ উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক শোনেননি। তিনি ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে সতীদাহপ্রথাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাতিল ঘোষণা করেন। এই আইন প্রণয়নের পরেও যখন রক্ষণশীল সমাজে তা নিয়ে বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না তখন রামমোহন রায় ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম তাঁর সমর্থকদের নিয়ে উইলিয়াম বেন্টিঙ্ককে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন। আসলে রামমোহন রায় মনে-প্রাণে চেয়েছিলেন সতীদাহপ্রথার মতো বীভৎস ও নিষ্ঠুর প্রথার উচ্ছেদ করতে। তাই আইন করে যখন এ প্রথার উচ্ছেদ সম্ভব বলে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তখন তিনি সেই মুহূর্তেই সতীদাহপ্রথা নিরোধক আইন প্রণয়নের জন্যে বেন্টিঙ্ককে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। এরপর এই আইন যাতে এদেশে কার্যকরী হয় সেজন্যে তিনি সবরকম সহায়তা করেছিলেন। তাই আমরা বলতে পারি রামমোহন রায় প্রথমদিকে আইন করে সতীদাহপ্রথা নিষিদ্ধ করার বিপক্ষে থাকলেও সতীদাহপ্রথার উচ্ছেদের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকাও অনস্বীকার্য। কেননা সতীদাহপ্রথা যে

অশাস্ত্রীয় ও নিষ্ঠুর সে সম্পর্কে তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ লিখে এবং আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে পূর্বেই জনগণকে সচেতন করে তুলেছিলেন বলেই পরবর্তীকালে উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক আইন করে সতীদাহপ্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেও রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে তা নিয়ে বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। সেদিক থেকে সতীদাহপ্রথা নিষিদ্ধ করতে মূলকাজটি অর্থাৎ এই প্রথার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার কাজটি রামমোহনই করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে স্বপন বসু বলেছেন—

> ''সব মিলিয়ে সুস্পষ্টভাবে এবিষয়ক আইন প্রণয়নের বিরোধিতা করার জন্য সহমরণ নিবারণের গৌরব রামমোহনের প্রাপ্য না হলেও, এই প্রথার বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করে সমাজকে নাড়া দেবার, আইন পাশ হলে প্রকাশ্যে তার সমর্থনে এগিয়ে আসার ও এই আইন যাতে বলবৎ থাকে তার জন্য উদ্যোগী হবার গৌরব অবশ্যই তাঁর প্রাপ্য।''[৯]

উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক সতীদাহপ্রথা নিরোধক আইন প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। প্রথমেই আমাদের জানা দরকার যে, উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের পূর্বে এদেশে নিযুক্ত কোন গভর্নর জেনারেলই কিন্তু সতীদাহপ্রথা বন্ধ করতে সাহস করেননি। তবে উইলিয়াম বেন্টিঙ্কও এদেশে এসেই হঠাৎ করে সতীদাহপ্রথা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেননি। কেননা সে সময় সতীদাহপ্রথা নিয়ে এদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। রামমোহন রায়, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, হরিহর দত্ত প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যখন সতীদাহ বন্ধ করার পক্ষে ছিলেন তখন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকমল সেন, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সতীদাহপ্রথা বন্ধ করার বিপক্ষে ছিলেন। তাই বেন্টিঙ্ক প্রথমে সতীদাহ সম্পর্কে বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করতে থাকেন। ১৮২৯ সালের মে মাসে এদেশের মিশনারিরা সতীদাহ বন্ধ করার জন্যে বেন্টিঙ্কের কাছে একটি আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন। এভাবে বিভিন্ন জনের মতামত ও আবেদনপত্রের ভিত্তিতে বেন্টিঙ্ক মূলত রাজা রামমোহন রায়ের সামাজিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সতীদাহপ্রথা নিরোধক আইন প্রণয়ন করেছিলেন। এভাবে সতীদাহ নিরোধক আইন প্রণয়ন করে উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক সতীদাহ আন্দোলনকে সফল করেছিলেন।

হিন্দু রক্ষণশীল সমাজের বিরোধিতা সত্ত্বেও উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক যখন সতীদাহ নিরোধক আইন প্রণয়ন করলেন তখন হিন্দু রক্ষণশীল সমাজ তা কিছুতেই মেনে নিতে পারল না। এমনকি, সতীদাহ আইন প্রণয়নের পরেও রক্ষণশীল সমাজ এ বিষয়ে হাল ছাড়েনি। তাই রাজা রাধাকান্ত

দেব, গোপীমোহন দেব, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখরা রক্ষণশীল সমাজের পক্ষ থেকে সতীপ্রথা বিরোধী আইন প্রত্যাহারের জন্যে সতীপ্রথার সমর্থক অনেকের স্বাক্ষর সম্বলিত দুটি আবেদনপত্র উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের কাছে পেশ করলেও উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক সতীপ্রথা বিরোধী আইন প্রত্যাহার করতে অসম্মত হন। এ প্রসঙ্গে *সমাচার দর্পণ* পত্রিকায় লেখা হয়েছে—

> ''৫ মাঘ ১৭ জানুয়ারি রবিবার সংস্কৃত কালেজে কলিকাতাস্থ হিন্দু বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী প্রধান লোকেরদিগের এক সভা হইয়াছিল ঐ সভায় সম্ভ্রান্তসমূহ সমাগত হইলে প্রথম শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কহিলেন সতীর বিষয়ে যে আরজী শ্রীশ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেন্টিঙ্ক গবরনর জেনরল বাহাদুরকে দেওয়া গিয়াছিল তাহার যে উত্তর পাওয়া গিয়াছে তাহা আপনারা শ্রবণ করুন সকলের অনুমত্যনুসারে শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব পাঠ করিলেন তাহার স্থূল তাৎপর্য্য সতীনিবারণের যে আইন হইয়াছে তাহা রহিত করিবেন না এবং প্রার্থনাকারিয়া যদি এ বিষয় বিলাতে শ্রীযুত বাদশাহের নিকট আপীল করেন তবে শ্রীযুত গবর্‌নর্‌ জেনরল বাহাদুর সেই আরজী তুষ্টি পূর্ব্বক বিলাতে পাঠাইয়া দিবেন ...।''[১০]

—এভাবে বেন্টিঙ্ক আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যান করলে হিন্দুধর্ম এবং হিন্দুধর্মের যাবতীয় প্রথাকে টিকিয়ে রাখার জন্যে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের পক্ষ থেকে রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে গঠিত হয় *ধর্মসভা*। এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সতীপ্রথা বিরোধী আইন প্রত্যাহারের জন্যে ইংল্যাণ্ডের প্রিভি কাউন্সিলে আবেদন করা। এই *ধর্মসভা*-র উদ্যোগে রক্ষণশীল হিন্দুরা বহুজনের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি আবেদন পত্র ইংল্যাণ্ডে পাঠায় এবং শেষপর্যন্ত তাদের এই আবেদনও ব্যর্থ হয়। এরপর রক্ষণশীলরা এ বিষয়ে তাদের পরাজয় একপ্রকার স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়। এভাবে এদেশে সতীপ্রথা বিরোধী আইন সমাজে প্রচলিত থাকে এবং এর ফলে ধীরে ধীরে সতীদাহের সংখ্যা যেমন কমতে থাকে, তেমনি রক্ষণশীলদের পক্ষ থেকেও আর এ বিষয়ে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না।

উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের প্রভাবে সংঘটিত প্রথম সমাজ-সংস্কার আন্দোলন—সতীদাহ আন্দোলনের সাফল্য সেকালের সমাজ-সংস্কারকদের বাড়তি অক্সিজেনের জোগান দিয়েছিল। তাই সতীদাহ আন্দোলনের সমাপ্তিতে এদেশের সমাজ-সংস্কার আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়েনি, বরং আমরা দেখি সেসময় ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এদেশের প্রগতিশীল মানুষরা একের পর এক সমাজ-সংস্কার আন্দোলন সংঘটিত করেছেন। প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন পুরাণ ও

শাস্ত্রে বিধবা বিবাহের উল্লেখ রয়েছে। এ থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে, প্রাচীন ভারতে বিধবাবিবাহের প্রচলন ছিল। তবে এদেশে মুসলমান আমল থেকে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে বিধবাবিবাহ নিন্দনীয় হয়ে ওঠে এবং পরবর্তীকালে সমগ্র হিন্দু সমাজে বিধবাবিবাহ নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ হয়ে ওঠে।

বিদ্যাসাগরের পূর্বে উনিশ শতকের চারের দশকে মতিলাল শীল, হলধর মল্লিক প্রমুখ প্রগতিশীল ব্যক্তিরা বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্যে উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন। তবে তাঁদের ব্যক্তিগত প্রয়াস শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল। এছাড়া এসময় *বেঙ্গল হরকরা, ক্যালকাটা কুরিয়র, সমাচার দর্পণ* প্রভৃতি পত্রিকাগুলি বিধবাবিবাহ প্রচলনে উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। বিধবাবিবাহ প্রচলনে এসব পত্র-পত্রিকারও গুরুত্ব আছে। আমরা জানি সংবাদপত্র সাধারণত সহজ-সরল ভাষায় লেখা হয় এবং তা পাঠ করতে ও বুঝতে বিশেষ কোন জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। আর দেশের নানারকম খবর পরিবেশিত হওয়ায় সাধারণ মানুষের কাছে সংবাপত্রগুলির চাহিদা বিপুল। আর মানুষের এই চাহিদার জন্যেই সংবাদপত্রগুলি নিমিষেই শহর থেকে গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে। সংবাদপত্রে পরিবেশিত খবর চায়ের দোকানে, হাটে-বাজারে মানুষের মুখে মুখে ফিরতে থাকে। এভাবে সংবাদপত্রে পরিবেশিত খবর দ্রুত সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। তাই সংবাদপত্রে যখন বিভিন্ন সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের কথা এবং সামাজিক নানা কুপ্রথার অনিষ্টকারিতার কথা ছাপা হয় তখন তা দ্রুত সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং সাধারণ মানুষও এই সমাজ-সংস্কার আন্দোলনগুলির যৌক্তিকতা এবং সামাজিক কুপ্রথাগুলি বিষয়ে বিবেচনার সুযোগ পায়। তাই *বেঙ্গল হরকরা, সমাচার দর্পণ* প্রভৃতি পত্রিকা যখন বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সংবাদ পরিবেশন করে তখন তা সাধারণ মানুষের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং সাধারণ মানুষ বিধবাবিবাহের যৌক্তিকতা বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা করার অবকাশ পায়। তাই বিধবাবিবাহ প্রচলনে জনমত গড়ে তুলতে এসব সংবাদপত্রেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আর সংবাদপত্রের এই গুরুত্বের কথা অনুধাবন করে হিন্দু রক্ষণশীল সমাজ প্রকাশ করে *সমাচার চন্দ্রিকা* পত্রিকা। এই পত্রিকায় রক্ষণশীল সমাজ প্রগতিশীলদের এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা বিধবাবিবাহ প্রচলনে যেসব প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল সেসবের বিরোধিতা করতে থাকে। আবার বিধবাবিবাহ প্রচলনে বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছিল ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী। ইয়ংবেঙ্গলরা বিধবাবিবাহ প্রচলনের যৌক্তিকতা দেখাতে গিয়ে নানা যুক্তিগ্রাহ্য লেখা প্রকাশ করেছেন— *বেঙ্গল স্পেক্টেটর, জ্ঞানান্বেষণ* প্রভৃতি পত্রিকায়। সুতরাং আমরা দেখলাম

বিধবাবিবাহ প্রচলনে কিংবা বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ করতে সকলেই সংবাদপত্রকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন।

বিধবাবিবাহ আন্দোলনে বিদ্যাসাগরের ভূমিকাই ছিল সবথেকে কার্যকরী। বিধবাবিবাহ নিয়ে প্রগতিশীলদের সঙ্গে রক্ষণশীলদের তর্ক-বিতর্ক থেকে বিদ্যাসাগর বুঝতে পেরেছিলেন যে, প্রথমেই যদি আইন করে বিধবাবিবাহ প্রচলন করার চেষ্টা করা হয় তাহলে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ তা কিছুতেই মেনে নেবে না এবং তা নিয়ে হিন্দুসমাজে ব্যাপক অসন্তোষ তৈরি হবে। কেননা রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে তখনও পর্যন্ত বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ ছিল এবং সমাজপতিরা বিধবাবিবাহকে অশাস্ত্রীয় বলে প্রতিপন্ন করেছিল। বিদ্যাসাগর জানতেন এদেশের হিন্দু রক্ষণশীল সমাজ শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী সকল কাজ করে থাকে; শাস্ত্রে যা নিষিদ্ধ তা এদেশের মানুষ কখনই করে না। বিধবাবিবাহ এতদিন রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে অপ্রচলিত থাকায় কেউই বিধবাবিবাহ করার সাহস পাবে না, কিন্তু বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলে প্রতিপন্ন হলে বিধবাবিবাহে অনেকেরই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কেটে যাবে। তাই বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত কিনা তা প্রতিপন্ন করার জন্যে বিদ্যাসাগর গভীর অধ্যয়নের দ্বারা বিভিন্ন শাস্ত্র অনুসন্ধান করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি *বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব* (১৮৫৫খ্রি.) গ্রন্থে বলেছেন—

> ‘‘যদি যুক্তিমাত্র অবলম্বন করিয়া, ইহাকে কর্তব্য কর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন কর, তাহা হইলে এতদ্দেশীয় লোকে কখনই ইহা কর্তব্য কর্ম বলিয়া স্বীকার করিবেন না। যদি শাস্ত্রে কর্তব্য কর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা থাকে, তবেই তাহারা কর্তব্য কর্ম বলিয়া স্বীকার করিতে ও তদনুসারে চলিতে পারেন। এরূপ বিষয়ে এদেশে শাস্ত্রই সর্বপ্রধান প্রমাণ, এবং শাস্ত্রসম্মত কর্মই সর্বতোভাবে কর্তব্য কর্ম বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। অতএব বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত অথবা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম, ইহার মীমাংসা করাই সর্বাগ্রে আবশ্যক।’’[১১]

—বিদ্যাসাগর জানতেন প্রত্যেক যুগের জন্যে পৃথক পৃথক ধর্মশাস্ত্র রয়েছে। তিনি কলিযুগের তথা বর্তমান সময়ের ধর্মশাস্ত্রের অনুসন্ধান করতে গিয়ে *পরাশরসংহিতা*-য় এর উত্তর পেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি *পরাশরসংহিতা*-র প্রথম অধ্যায় থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করে লিখেছেন—

> ‘‘কোন যুগে কোন ধর্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবেক, পরাশরপ্রণীত ধর্মশাস্ত্রে সে সমুদয়ের নিরূপণ আছে। পরাশরসংহিতার প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে,

কৃতে তু মানবা ধর্মাস্ত্রেতায়াং গৌতমাঃ স্মৃতাঃ।
দ্বাপরে শাঙ্খলিখিতাঃ কলৌ পরাশরাঃ স্মৃতাঃ।।

মনুনিরূপিত ধর্ম সত্যযুগের ধর্ম, গৌতমনিরূপিত ধর্ম ত্রেতাযুগের ধর্ম, শঙ্খলিখিতনিরূপিত ধর্ম দ্বাপরযুগের ধর্ম, পরাশরনিরূপিত ধর্ম কলিযুগের ধর্ম।"[১২]

— বিদ্যাসাগর উপলব্ধি করেছিলেন সাধারণ মানুষের পক্ষে সংস্কৃত ভাষায় লেখা কলিযুগের ধর্মশাস্ত্র *পরাশরসংহিতা* পড়া ও বোঝা সম্ভব নয়। তাই তিনি বিধবাবিবাহ বিষয়ে *পরাশরসংহিতায়* কী নির্দেশ আছে সেকথা জনসাধারণকে বোঝানোর জন্যে জনসাধারণের উপযোগী করে সহজ-সরল বাংলা ভাষায় লিখলেন— *বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব* (১৮৫৫ খ্রি.) গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি *পরাশরসংহিতা*-র চতুর্থ অধ্যায় থেকে উদ্ধৃতি ও তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে, কলিযুগে তথা বর্তমান সময়ে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত—

''নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।।

... ...

স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব স্থির হইলে, সংসারধর্ম পরিত্যাগ করিলে, অথবা পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের পুনর্বার বিবাহ করা শাস্ত্রবিহিত। ...

পরাশর কলিযুগের বিধবাদিগের পক্ষে তিন বিধি দিতেছেন, বিবাহ, ব্রহ্মচর্য, সহগমন। তন্মধ্যে, রাজকীয় আদেশক্রমে, সহগমনের প্রথা রহিত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে বিধবাদিগের দুই মাত্র পথ আছে বিবাহ ও ব্রহ্মচর্য; ইচ্ছা হয় বিবাহ করিবেক, ইচ্ছা হয় ব্রহ্মচর্য করিবেক। কলিযুগে, ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া, দেহযাত্রা নির্বাহ করা বিধবাদিগের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এই নিমিত্তই, লোকহিতৈষী ভগবান্ পরাশর সর্বপ্রথম বিবাহেরই বিধি দিয়াছেন। সে যাহা হউক, স্বামীর অনুদ্দেশ প্রভৃতি পাঁচ প্রকার বৈগুণ্য ঘটিলে, স্ত্রীলোকের পক্ষে বিবাহের স্পষ্ট বিধি প্রদর্শিত হওয়াতে, কলিযুগে, সেই সেই অবস্থায়, বিধবার পুনর্বার বিবাহ করা শাস্ত্রসম্মত কর্তব্য কর্ম বলিয়া অবধারিত হইতেছে।"[১৩]

—এভাবে বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহকে শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ করে বালবিধবা নারীদের অসহ্য যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণের জন্যে এবং বিধবা-নারীদের জৈবিক তাড়নার জন্যে ব্যভিচার দোষ ও

ভ্রূণহত্যাজনিত পাপের মতো ঘটনা নিবারণের জন্যে বিধবাবিবাহের প্রচলনের প্রয়োজন আছে কিনা তা বিবেচনার দায়িত্ব জনসাধারণের ওপরে অর্পণ করে *বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব* (দ্বিতীয় পুস্তক, ১৮৫৫ খ্রি.) গ্রন্থে বলেছেন—

> ''দুর্ভাগ্যক্রমে যাহারা অল্প বয়সে বিধবা হয়, তাহারা যাবজ্জীবন যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে, এবং বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত না থাকাতে ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের স্রোত যে উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছে, ইহা, বোধ করি, চক্ষুকর্ণ বিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। অতএব, হে পাঠক মহাশয়বর্গ! আপনারা, অন্ততঃ কিয়ৎ ক্ষণের নিমিত্ত, স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া বলুন, এমন স্থলে, দেশাচারের দাস হইয়া, শাস্ত্রের বিধিতে উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক, বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত না করিয়া, হতভাগা বিধবাদিগকে যাবজ্জীবন অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণানলে দগ্ধ করা, এবং ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের স্রোত উত্তরোত্তর প্রবল হইতে দেওয়া উচিত; অথবা দেশাচারের অনুগত না হইয়া, শাস্ত্রের বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক, বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত করিয়া, হতভাগা বিধবাদিগের অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণা নিরাকরণ এবং ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের স্রোত নিবারণ করা উচিত। এ উভয় পক্ষের মধ্যে কোন পক্ষ অবলম্বন করা শ্রেয়ঃকল্প, স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া আপনারাই তাহার মীমাংসা করুন।''[১৪]

বিদ্যাসাগর গ্রন্থ প্রণয়ন করে একদিকে যেমন বিধবাবিবাহ বিষয়ে রক্ষণশীলদের বিরোধিতার উত্তর দিয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি জনসাধারণের মনে বিধবাবিবাহ সম্পর্কে যে ভ্রান্ত ধারণাগুলি ছিল তা দূর করতে চেয়েছেন। আসলে বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে জনমত গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন— যাতে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে বিধবাবিবাহ বিষয়ে আর কেউ তাদের বিভ্রান্ত করতে না পারে। আর বিধবাবিবাহ বিষয়ে যখন জনমত তৈরি হবে ও সাধারণ মানুষ বিধবাবিবাহের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে তখন আইন করে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হলে এবং রক্ষণশীলরা এর বিরোধিতা করলেও সাধারণ মানুষ আর তাদের দ্বারা প্রভাবিত হবে না। এভাবে বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ আন্দোলনে সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত প্রথম গ্রন্থ *বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা*

এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব গ্রন্থটি যে সেকালে অতি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা এই গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের দু'হাজার কপি সে সময়ে এক সপ্তাহের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। পরে আবার তিন হাজার বই ছাপা হলে তাও অল্প কয়েকদিনের মধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছিল। বিদ্যাসাগর এই গ্রন্থে যখন বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত হিসেবে প্রমাণ করে জনমত গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তখন রক্ষণশীলদের আজন্মলালিত সংস্কারে আঘাত লাগায় তারাও চুপ করে বসে থাকেনি। তাই আমরা দেখি বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ বিষয়ে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে রাধাকান্ত দেব, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখরা এর বিরোধিতা শুরু করেছিলেন। এসময়ে বিধবাবিবাহ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের মতকে অর্থাৎ বিধবাবিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত তা ভুল প্রমাণিত করার জন্যে অনেকগুলি প্রতিবাদ পুস্তক লেখা হয়েছিল। এগুলির মধ্যে অধিকাংশ গ্রন্থেই বিদ্যাসাগরকে ব্যঙ্গ ও কটূক্তি করা হয়েছিল এবং অনেক সময় শাস্ত্রের ভুল ব্যাখ্যা করে তাঁরা সাধারণ মানুষকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ।

আবার রক্ষণশীলরা অনেকগুলি বই লিখে যখন প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করলেন যে, বিধবা বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ তখন সাধারণ মানুষেরা অনেকেই অনেকগুলি গ্রন্থে একইরকম তথ্য দেখে তাকেই সত্য বলে মনে করেছিল— যেমনটি হয় বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে। তাই বিদ্যাসাগর এবার বিধবাবিবাহ বিষয়ে বিরোধীদের ভ্রান্ত যুক্তিগুলিকে খণ্ডন করার জন্যে লিখলেন বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি বিরোধীদের যুক্তিগুলিকে খণ্ডন করে পুনরায় প্রমাণ করে দেখালেন বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত। রক্ষণশীলরা এবারেও বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত দ্বিতীয় গ্রন্থের বিরুদ্ধে কয়েকটি প্রতিবাদী গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কিন্তু এবারে বিদ্যাসাগরের মত শিক্ষিত মানুষ থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই এসময় অনেক পুরুষের পাশাপাশি অনেক নারীও বিদ্যাসাগরের এই আন্দোলনকে স্বাগত জানিয়েছিল। এসময় অনেক পত্র-পত্রিকা, ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী বিদ্যাসাগরের এই আন্দোলনকে সমর্থন ও সহযোগিতা করেছিল। এভাবে বিদ্যাসাগর অক্লান্ত পরিশ্রমে বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে বৃহত্তর জনসমাজে ছড়িয়ে দিয়ে তাকে দৃঢ়ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ প্রচলন করার জন্যে গ্রন্থ প্রণয়ন করে তা শাস্ত্রসম্মত প্রতিপন্ন করে জনমত গড়ে তুলেই ক্ষান্ত হলেন না, তিনি এ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করার কথাও ভেবেছিলেন। কেননা তিনি জানতেন, শুধু জনমত গড়ে তুললেই হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলন সম্ভব হবে

না— সাধারণ মানুষরা বিধবাবিবাহের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবেও রক্ষণশীল সমাজপতিদের চাপে সে বিষয়ে অগ্রসর হওয়ার সাহস পাবে না। কিন্তু সতীদাহের মতো বিধবাবিবাহের ক্ষেত্রেও আইন প্রণয়ন করা হলে সমাজপতিদের অনেকেই বিধবাবিবাহ মেনে নিতে বাধ্য হবে এবং সাধারণ মানুষের অনেকেই বিধবাকে বিয়ে করতে পারবে। তাই বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহকে আইন সিদ্ধ করার জন্যে ৯৮৭ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্বাক্ষর সমন্বিত একটি আবেদনপত্র ব্রিটিশ সরকারকে পাঠিয়েছিলেন ১৮৫৫ সালের ৪ অক্টোবর। এভাবে বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়নের জন্যে বিদ্যাসাগর ব্রিটিশ সরকারের কাছে আবেদনপত্র পাঠালে ব্রিটিশ সরকার যখন তা নিয়ে বিবেচনা শুরু করেছিল তখন শুধু বাংলাদেশ থেকেই নয়, বাংলাদেশের বাইরে থেকেও এর পক্ষে একদিকে যেমন অনেক আবেদনপত্র জমা পড়ে, তেমনি রক্ষণশীলরাও এই আইন যাতে পাশ না হয় সেজন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছে অনেকগুলি প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছিল। তবে রক্ষণশীলদের বিরোধিতা সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত একটি বিল তৈরি করেছিল এবং গভর্নর জেনারেলের সম্মতিক্রমে ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই বিধবাবিবাহ আইন পাশ হয়েছিল।

রক্ষণশীল সমাজ যখন ব্রিটিশ সরকারের কাছে প্রতিবাদপত্র প্রেরণ করেও বিধবাবিবাহ আইনকে ঠেকাতে পারল না তখন তারা ভিন্ন পন্থা নিল। কেউ যাতে বিধবা বিবাহ করতে না পারে সেজন্য রক্ষণশীল সমাজ বিধবাবিবাহ করলে একঘরে করে দেওয়ার ভয় দেখাতে থাকল। তাই বিধবা বিবাহ আইন পাশ হলেও একদিকে যেমন কেউ বিধবা বিবাহ করার সাহস পায়নি, তেমনি কেউ নিজের বিধবা কন্যাকে বিয়ে দেওয়ারও সাহস করেনি। রক্ষণশীলদের এই বিরোধিতা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর হার মানলেন না— তিনি এক্ষেত্রে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। তিনি নিজে অক্লান্ত চেষ্টা করে বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা করতে লাগলেন। এভাবে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় প্রথম বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় ১৮৫৬ সালের ৭ ডিসেম্বর। এই বিবাহ হয়েছিল শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের সঙ্গে বালবিধবা কালীমতী দেবীর। এভাবে বিদ্যাসাগর নিজের উদ্যোগে অনেকগুলি বিধবাবিবাহ দিয়েছিলেন। তবে বিদ্যাসাগরের এই প্রচেষ্টাকেও ব্যর্থ করার জন্যে রক্ষণশীল সমাজ যারা বিধবাবিবাহ করতো তাদের একঘরে করার পাশাপাশি নানারকম সামাজিক অত্যাচার করতো। এভাবে বিধবাবিবাহকারী অনেকেই একসময় সামাজিক অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে প্রায়শ্চিত্ত করতে বাধ্য হতো। এছাড়া যারা বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠানে যোগ দিত তাদেরও নানাভাবে সামাজিক অত্যাচার করতো রক্ষণশীল সমাজ। এভাবে বিধবাবিবাহ যাতে কোনমতেই অনুষ্ঠিত হতে না

পারে সেজন্যে রক্ষণশীল সমাজের প্রতিনিধিরা একের পর এক চক্রান্ত চালিয়েই যায়। এসময় বিদ্যাসাগর অনেককে টাকা দিয়েও বিধবাবিবাহ করিয়েছেন। আবার কালীপ্রসন্ন সিংহও এসময় বিধবাবিবাহকে উৎসাহিত করার জন্যে বিধবাবিবাহকারী পাত্রকে এক হাজার টাকা অর্থপুরস্কার দেবেন বলে ঘোষণা করেছিলেন। সে সময় অনেকেই বিধবাবিবাহ করলেও অধিকাংশক্ষেত্রেই বিধবাবিবাহের মূলে ছিল অর্থপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা। কেননা এ সময় পুরুষের বহুবিবাহ প্রচলিত থাকায় অনেকেই টাকার লোভে প্রথমে একটি বিধবাবিবাহ করে পরে একটি কুমারী নারীকে বিয়ে করতো। এভাবে বিধবাবিবাহ প্রচলনের প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। এতে বিদ্যাসাগর পরবর্তীকালে মর্মাহত হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ মন্তব্য করেছেন—

> ''বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন বোধহয় উনিশ শতকের সবচেয়ে বড় সমাজসংস্কার আন্দোলন, যা শহরের গণ্ডি ছাড়িয়ে গ্রাম্যসমাজে পর্যন্ত খানিকটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, এবং বাংলাদেশ ছাড়িয়ে সর্বভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু ১৮৫৬ সালে বিধবাবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হবার পর উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত কয়েকটিমাত্র বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তার অধিকাংশই বিদ্যাসাগরের নিজের উদ্যম ও অর্থব্যয়ে অথবা তাঁর একান্ত ভক্তদের প্রচেষ্টায়। তাও দেখা গেছে বিধবাবিবাহ যাঁরা করতে অগ্রণী হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে সাময়িক অর্থলোভে শঠতার আশ্রয় নিয়েছেন, কোনো আদর্শপ্রীতির জন্য বিবাহ করেন নি। বিদ্যাসাগর নিজেও তা বুঝতে পেরে শেষজীবনে হতাশায় মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন।''[১৫]

বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন জনমতকে আলোড়িত করলেও শেষপর্যন্ত সমাজ তা গ্রহণ করেনি। কেননা বালবিধবা নারীদেরই বিবাহের প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশি এবং কৌলীন্যপ্রথার ফলে সাধারণত কুলীনদের ঘরেই বালবিধবা নারীর সংখ্যা ছিল বেশি। তাই বিধবাবিবাহের সমস্যাটি অন্যান্য বর্ণের নারীদের তুলনায় মূলত কুলীন নারীদের মধ্যেই মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল। আর বৃহত্তর নারীদের সমস্যা না হওয়ায় বিধবাবিবাহ আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে— এক্ষেত্রে রক্ষণশীলরাই জয়ী হয়েছে এবং সাধারণ মানুষ তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করার প্রয়োজন বোধ করেনি। আবার অনেক শিক্ষিত মানুষও আজন্মলালিত সংস্কারবশত বিধবাবিবাহের চাইতে বিধবাদের ব্রাহ্মচর্য পালনকেই শ্রেয় বলে মনে করেছিলেন। এছাড়া আজও যেখানে একজন

পুরুষ অনয়াসেই একজন বিধবা নারীকে বিবাহের কথা ভাবতে পারে না, সেখানে সেকালের পটভূমিতে বিধবা নারীকে বিয়ে করার মতো উদারমনস্ক পুরুষের সংখ্যা যে নিতান্তই সামান্য ছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আবার রক্ষণশীল সমাজের একঘরে করার ভয়ে সেকালের অনেক পুরুষই ইচ্ছে থাকলেও বিধবা বিবাহ করতে সাহস পেতো না। তাইতো আমরা দেখি যারা বিধবাবিবাহ আন্দোলনে বিদ্যাসাগরকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন তাঁদের অনেকেই বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়নের পর বিধবা বিবাহ করতে কিংবা অন্যকে বিধবা বিবাহ করার জন্যে উৎসাহিত না করে বরং নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ বলেছেন—

> ''বিধবাবিবাহ হিন্দুসমাজ গ্রহণ তো করেই নি, শিক্ষিত উচ্চসমাজে যাঁরা আদর্শের দিক থেকে একদা তা সমর্থন করেছিলেন, তাঁরাও কার্যক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করতে পারেন নি।''[১৬]

— আর এভাবেই বিদ্যাসাগরের মহৎ উদ্দেশ্যে সংঘটিত বিধবাবিবাহ আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে যায়।

বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন ব্যর্থ হলেও এক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের যে যুক্তি, নিষ্ঠা, পরিশ্রমী মানসিকতা, উদারতা, ভালোবাসা প্রকাশিত হয়েছে তার মূল্য অবশ্যই আছে। বিদ্যাসাগরের পূর্বে এদেশের কিছু প্রগতিশীল ব্যক্তি বিধবাবিবাহ বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠলেও তা স্বল্পসংখ্যক মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং রক্ষণশীলদের বিরোধিতায় তাঁদের প্রয়াস শুরুতেই বিনষ্ট হয়ে যায়। আবার বিদ্যাসাগরের পূর্বে ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী বিধবাবিবাহ বিষয়ে আলোচনা করলেও তাঁদের প্রয়াস মুষ্টিমেয় কিছু ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল— দেশের বৃহত্তর জনগণের সঙ্গে তাঁদের কোন যোগাযোগ ছিল না। এছাড়া ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী *জ্ঞানান্বেষণ* এবং *বেঙ্গল স্পেক্টেটর* পত্রিকা দুটিতে বিধবাবিবাহের সপক্ষে যেসব যুক্তি ও আলোচনা প্রকাশ করতো তাও সকলের কাছে পৌঁছত না। কেননা পত্রিকা দুটির প্রচার-সংখ্যা সীমিত ছিল। বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব এখানে যে, তিনি প্রথমেই গ্রন্থ লিখে যুক্তিসহ বিচার-বিশ্লেষণ করে সাধারণ মানুষকে বোঝাতে চাইলেন বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত। আর এভাবে বিধবাবিবাহ বিষয়ে জনমত গড়ে তুলে তিনি সর্বপ্রথম বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আবার বিদ্যাসাগর ইয়ংবেঙ্গলদের মতো শুধু যুক্তি দিয়ে নয়, হৃদয় দিয়েও বিধবাদের দুরবস্থা উপলব্ধি করে বিধবাবিবাহ প্রচলনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে রমাকান্ত চক্রবর্তী লিখেছেন—

> ''... 'হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর, বলিতে

> পারি না', বিদ্যাসাগর রচিত এই অবিস্মরণীয় বাক্যে যে ব্যথা ব্যঞ্জিত হয়েছে, যে হৃদয়বৃত্তি প্রকাশিত হয়েছে, তার তুলনা খুব বেশি ছিল না। অপ্রাপ্তবয়স্কা 'বিধবা'দের দেখে বিদ্যাসাগর যে অশ্রু বর্ষণ করেছিলেন, তার উৎস ছিল তাঁর হৃদয়, কোন বৈদেশিক মতবাদ নয়।"[১৭]

—বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন সাধারণ মানুষের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল বলেই সেকালে বিধবা বিবাহ নিয়ে বিস্তর তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল। এখানেই বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের গুরুত্ব।

বিধবাবিবাহ আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে গেলেও সমাজ-সংস্কারে বিদ্যাসাগর কিন্তু আগ্রহ হারাননি। বিধবাবিবাহ আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে গেলে বিদ্যাসাগর উপলব্ধি করেছিলেন যে, এদেশে বালবিধবাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে মূলত কৌলীন্যপ্রথার ফলে কুলীন ব্রাহ্মণদের বহুবিবাহ সমাজে প্রচলিত থাকায়। তাই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, এদেশে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ না হলে সমাজে বিধবাদের সমস্যার কোনদিনই নিষ্পত্তি হবে না। তাই বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে গেলে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করার জন্যে সংস্কার আন্দোলনে মনোনিবেশ করেছিলেন।

প্রাচীনকালেও এদেশের পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। তবে এক্ষেত্রে কিছু শর্তাবলী প্রযোজ্য ছিল। যেমন পিতৃতান্ত্রিক সমাজের লিখিত সংবিধান বলে বিবেচিত *মনুসংহিতা*-য় মনু পুরুষের পুনর্বার বিবাহের শর্ত দিয়ে লিখেছেন— কোন নারী যদি শুধু কন্যাসন্তানই জন্ম দেয় তাহলে তার স্বামী এগারো বছর অপেক্ষা করে পুত্রসন্তান কামনায় পুনর্বার বিয়ে পরতে পারবে, স্ত্রী বন্ধ্যা হলে তার স্বামী পুনরায় বিয়ে করতে পারবে, আবার কোন স্ত্রী যদি স্বামীকে খুশি করতে না পারে তাহলে তার স্বামী পুনর্বার বিয়ে করতে পারবে— এক্ষেত্রে মনু পুরুষের পুনর্বার বিয়ে করার ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত নিচু বর্ণের নারীকে বিয়ে করার বিধান দিয়েছেন। অর্থাৎ মনুর বিধান অনুযায়ী পুরুষ উপরিউক্ত কারণগুলি ছাড়া ইচ্ছেমতো বিয়ে করতে পারে না। কিন্তু কৌলীন্যপ্রথার ফলে বিশেষত দেবীবরের মেলবন্ধনের ফলে কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে বহুবিবাহ মারাত্মক আকার ধারণ করে। কুলীন ব্রহ্মণেরা অনেকেই কুলীন নারীর কুল উদ্ধারের নামে অনেক টাকা বরপণের লোভে শতাধিক সবর্ণ বিয়ে করতেও পিছপা হতো না। এভাবে উনিশ শতকে অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ বিবাহ ব্যবসায়ী হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে আবার কুলীন কন্যার পিতা কৃত্রিম কুল উদ্ধারের নামে বিবাহ ব্যবসায়ী কুলীন পাত্রের সঙ্গে, এমনকি উপযুক্ত কুলীন পাত্র না পেয়ে

কখনো কখনো মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধ কুলীন পাত্রের সঙ্গেও নিজের বালিকা কন্যাকে বিয়ে দিতে দ্বিধাবোধ করতো না। আর কুলীন ব্রাহ্মণেরা যেহেতু তাদের বিবাহিতা স্ত্রীদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিতো না সেহেতু কুলীন নারীদের আজীবন স্বামীসঙ্গ ব্যতিরেকে পরের আশ্রয়ে ঘৃণা-অপমান-তাচ্ছিল্য সহ্য করে জীবন-যাপন করতে হতো। আবার অনেক সময় বালিকা কুলীন নারীদের মৃত্যুপথযাত্রী মুমূর্ষু কুলীন পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হওয়ায় অবধারিত বৈধব্যের শিকার হতে হতো নিতান্ত বাল্যকালেই। এভাবে উনিশ শতকে এদেশে কৌলীন্যপ্রথার ফলে বালবিধবা নারীর সংখ্যা মারাত্মক আকার ধারণ করে। এই কৌলীন্যপ্রথার ফলে কুলীন কন্যারা স্বামীসঙ্গ ব্যতিরেকে, কিংবা বাল্যকালে বিধবা হওয়ার ফলে অনেক সময়ই জৈবিক তাড়নায় ব্যভিচারে লিপ্ত হতো— ফলস্বরূপ ভ্রূণহত্যার মতো মহাপাপ কুলীন নারীদের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর প্রমাণ পাওয়া যায় সেকালের সংবাদপত্রগুলিতে। যেমন, ৪ জুলাই ১৮৩৫ সালের *সমাচার দর্পণ* পত্রিকায় প্রকাশিত জনৈক পত্রলেখকের পত্রে এরকম ঘটনার উল্লেখ রয়েছে—

> ‘‘ধর্ম্মলোপের বিষয় যৎকিঞ্চিৎ বিদিত করিতে সঙ্কুচিত হইয়া লিখিতেছি যে এক ব্যক্তি হইতে বহু স্ত্রীর মনোভিলাষ কোনরূপেই পূর্ণ হইতে পারে না ইহাতে ঐ কুলীনের স্ত্রী প্রায়ই পরপুরুষরতা হইয়া জারজ সন্তান উৎপন্ন করিতেছে এবং পূর্ব্বোক্ত অবিবাহিতা স্ত্রীরা যৌবনযন্ত্রণায় কাতরা হইয়া পরাসক্তাতে তাহারদের গর্ভ হইতেছে। যদ্যপিও কুলে জলাঞ্জলি দিয়া এই কর্ম্ম করে কিন্তু ঐ সকল সন্তান রাখিলে কুল সমূলে বিনাশ পায় প্রযুক্ত ঐ পঞ্চম ষষ্ঠ অষ্টমমাসীয় জীবদিগকে অস্ত্রাঘাতে অথবা অন্য কোন উপায়ান্তরে নষ্ট করে যাহাতে ভ্রূণহত্যা মহাপাতক উৎপত্তি হইতেছে।’’[১৮]

—এভাবে কৌলীন্যপ্রথার ফলে কুলীন ব্রাহ্মণদের বহুবিবাহের কারণে কুলীন নারীদের একদিকে যেমন আজীবন পরের আশ্রয়ে তাচ্ছিল্য, অপমান সহ্য করতে হতো, অন্যদিকে জৈবিক তাড়নায় অনেকেই ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে ভ্রূণ হত্যার মতো মহাপাপে পতিত হতো। সুতরাং আলোচনা করে দেখা গেল উনিশ শতকে এদেশের পতিতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের বহুবিবাহের ফলে নারীর দুর্দশা মূলত কুলীন নারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কেননা উনিশ শতকে এদেশের রক্ষণশীল সমাজে কুলীন ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যান্য বর্ণের পুরুষরা পুনর্বার বিয়ে করতে পারলেও সেক্ষেত্রে কিছু শর্ত ছিল, কিন্তু কৌলীন্যপ্রথার ফলে কুলীন ব্রাহ্মণেরা বিনা শর্তে কুলীন কন্যাদের কৃত্রিম কুল উদ্ধারে নামে

অসংখ্য, কখনো কখনো শতাধিক বিয়ে পর্যন্ত করার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল। তাই উনিশ শতকে বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলন মূলত সংঘটিত হয়েছিল কৌলীন্যপ্রথাকে কেন্দ্র করে কুলীন ব্রাহ্মণদের বহুবিবাহের ফলে। স্বাভাবিকভাবেই এসময় যাঁরা বহুবিবাহের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করেছিলেন তাঁরা সকলেই কৌলীন্যপ্রথাকে আক্রমণ করেছেন এবং যুক্তি দিয়ে কৌলীন্যপ্রথার অনিষ্টকারিতা ও এটি যে অশাস্ত্রীয় তা বোঝাতে চেয়েছিলেন।

রামমোহন রায় সতীদাহ সমস্যার কথা আলোচনা করতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে বহুবিবাহ সমস্যার কথাও তুলে ধরেছেন। তিনি কুলীন ব্রাহ্মণদের বহুবিবাহের ফলে কুলীন নারীদের দুরবস্থার চিত্র তুলে ধরেছেন *সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ* (১৮১৯ খ্রি.) গ্রন্থে। এই গ্রন্থে তিনি কুলীন ব্রাহ্মণদের বহুবিবাহের ফলে কুলীন নারীদের আজীবন পরের আশ্রয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য-অপমান সহ্য করে জীবন কাটানোর চিত্রকে তুলে ধরেছেন। তিনি কৌলীন্যপ্রথার অবসান ঘটিয়ে কুলীন নারীদের দুরবস্থা মোচনের জন্যে ব্রিটিশ সরকারের কাছে সুপারিশ করেছিলেন যে, যদি এক স্ত্রী বর্তমানে কেউ দ্বিতীয় বিবাহ করতে চায় তাহলে তাকে শাস্ত্র নির্দেশিত শর্ত অনুযায়ী করতে হবে এবং এ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীর অনুমতি নিতে হবে। এভাবে বিদ্যাসাগরের বহুপূর্বেই রামমোহন রায় এদেশের বহুবিবাহ সমস্যার সমাধানের কথা ভেবেছিলেন। আবার ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী বিধবাবিবাহ সমস্যা নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি বহুবিবাহ সমস্যা নিয়েও আলোচনা করেছে। ইয়ংবেঙ্গলরা কুলীন ব্রাহ্মণদের বহুবিবাহের সমালোচনা করে বিভিন্ন সভা-সমিতি ও পত্র-পত্রিকায় এ বিষয়ে আলোকপাত করেছিলেন। এঁদের মধ্যে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় *এনকোয়ারার* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বিবাহব্যবসায়ী কুলীনদের তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন। ইয়ংবেঙ্গল বা নব্যবঙ্গদের আরেকটি পত্রিকা *জ্ঞানান্বেষণে* ১৮৩৬ সালে ২৭ জন বিবাহব্যবসায়ী কুলীন ব্রাহ্মণের নাম, পরিচয় সহ তাদের বিবাহ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল — এদের মধ্যে আবার কয়েকজনের বিবাহের সংখ্যা অর্ধশতাধিক। এর মধ্যে দিয়ে ইয়ংবেঙ্গলরা দেখাতে চেয়েছেন কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে বহুবিবাহ মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর পাশাপাশি খ্রিস্টান মিশনারিরাও কুলীন ব্রাহ্মণদের বহুবিবাহের বিরোধিতা করেছিলেন। মিশনারিদের পক্ষ থেকে ক্লডিয়াস বুকানন কৌলীন্যপ্রথার ফলে কুলীন নারীদের দুরবস্থার কথা আলোচনা করেছিলেন।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বহুবিবাহের কুফল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার জন্য কয়েকটি

পত্রিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। *সমাচার দর্পণ* পত্রিকা বিভিন্ন সময়ে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে সম্পাদককে লেখা সাধারণ মানুষের বিভিন্ন চিঠি-পত্র মুদ্রিত করে প্রকাশ করেছে এবং রক্ষণশীলদের বহুবিবাহকে টিকিয়ে রাখার ভ্রান্ত প্রচেষ্টার প্রতিবাদ করেছে। কৌলীন্যপ্রথা যে শাস্ত্রসম্মত নয় এবং তা যে কুলীন নারীদের জীবনের অনিষ্টের মূল তাও *সমাচার দর্পণ* পত্রিকায় বিভিন্ন সময় দাবি করা হয়েছে। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের *রিফর্মার* পত্রিকার একটি সম্পাদকীয় অংশে কৌলীন্যপ্রথার অনিষ্টকারিতা দেখিয়ে এই প্রথা নিবারণের জন্যে সরকারের কাছে প্রার্থনা জানানো হয়েছিল— সেইসঙ্গে সম্পাদক এও জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, এই প্রথা হিন্দুশাস্ত্র বিরোধী। এযাবৎ বিভিন্ন সমাজ-সংস্কারে ব্রিটিশ সরকার এদেশের ধর্মীয় ও সামাজিক প্রথায় সাধারণত হস্তক্ষেপ করতে চাইতো না জনগণের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হবে বলে। তাই কৌলীন্যপ্রথা নিবারণে সরকার যাতে বিনা দ্বিধায় হস্তক্ষেপ করতে পারে সেজন্যে *রিফর্মার* পত্রিকার সম্পাদক কৌলীন্যপ্রথা যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ তার উল্লেখ করেছিলেন। আবার *ক্যালকাটা খ্রিশ্চান অবজার্ভার* পত্রিকা কৌলীন্যপ্রথাকে অনৈতিক ও দুর্নীতিগ্রস্ত বলে দাবি করেছিল এবং এই প্রথা নিবারণের জন্য সরকারি হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছিল। এভাবে সেকালের বহু পত্র-পত্রিকা কৌলীন্যপ্রথার বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করে জনমত গড়ে তুলে বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলনকে অনেকটাই জোড়ালো করেছিল।

বহুবিবাহ আন্দোলনে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ আন্দোলনের ব্যর্থতা থেকে উপলব্ধি করেছিলেন যে, কৌলীন্যপ্রথার ফলে অনেক সময় বৃদ্ধ কুলীন পাত্রের সঙ্গে অল্পবয়সী কুলীন কন্যার বিয়ে দেওয়ার ফলে সমাজে বালবিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আর রক্ষণশীল সমাজের বিরোধিতায় ও অত্যাচারে বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়নের পরেও যেহেতু বিধবা নারীর বিয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না সেহেতু বিধবা নারীর দুঃখ-কষ্ট দূর করার একটা উপায় হচ্ছে কৌলীন্যপ্রথার উচ্ছেদ ঘটনো। এই কৌলীন্যপ্রথার ফলে এদেশের কুলীন নারীরা যে বিবাহিত হয়েও আজীবন পরের আশ্রয়ে ও অনুগ্রহে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য-অপমান সহ্য করে জীবন-যাপন করে এবং কখনো কখনো জৈবিক তাড়নায় ব্যভিচারে লিপ্ত হয় সে বিষয়েও বিদ্যাসাগর আলোকপাত করেছেন তাঁর বহুবিবাহ সংক্রান্ত প্রথম গ্রন্থ *বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব*-এ (১৮৭১ খ্রি.)। এই গ্রন্থে বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ প্রথাকে এদেশের নারীদের দুরবস্থা ও অনিষ্টের মূল বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন এ বিষয়ে বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বহুবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছেন এবং তাঁরা সকলেই এই প্রথা রদ করার

সপক্ষে। বিদ্যাসাগরের ভাষায়—

> ‘‘... বহুবিবাহপ্রথা এক্ষণে সর্বাপেক্ষা অধিকতর অনিষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। এই অতিজঘন্য অতিনৃশংস প্রথা প্রচলিত থাকাতে, স্ত্রীজাতির দুরবস্থার ইয়ত্তা নাই। এই প্রথার প্রবলতাপ্রযুক্ত, তাঁহাদিগকে যে সমস্ত ক্লেশ ও যাতনা ভোগ করিতে হইতেছে, যৎ সমুদায় আলোচনা করিয়া দেখিলে, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। ফলতঃ, এতন্মূলক অত্যাচার এত অধিক ও এত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে যে, যাঁহাদের কিঞ্চিন্মাত্র হিতাহিতবোধ ও সদসদ্বিবেকশক্তি আছে, তাদৃশ ব্যক্তিমাত্রেই এই প্রথার বিষম বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা, এই প্রথা এই দণ্ডে রহিত হইয়া যায়।’’[১৯]

—কিন্তু এসময় রক্ষণশীলরা দাবি করেছিল যে, বর্তমানে কুলীনদের মধ্যে বহুবিবাহের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে বলে আইন করে আর বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। মূলত রক্ষণশীলদের এসব কুযুক্তির উত্তর দিতে গিয়েই বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ সংক্রান্ত প্রথম গ্রন্থ *বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব* লিখেছিলেন। এই গ্রন্থে তিনি রক্ষণশীলদের মতকে ভুল প্রমাণিত করার জন্য সেসময় হুগলী জেলার ১৩৩ জন কুলীন ব্রাহ্মণদের নাম, বাসস্থান সহ তাঁদের বহুবিবাহের সংখ্যা উল্লেখ করে যে তালিকা দিয়েছেন তাতে দেখা যায় যে, অনেকেই অর্ধশতাধিক বিয়ে করেছেন। এভাবে রক্ষণশীলদের মতকে ভুল প্রমাণিত করে বিদ্যাসাগর লিখেছেন—

> ‘‘হুগলী জিলাতে বহুবিবাহকারী কুলীনের যত সংখ্যা, বধর্মান, নবদ্বীপ, যশর, বরিশাল, ঢাকা প্রভৃতি জিলাতে তদপেক্ষা ন্যূন নহে; বরং কোনও কোনও জিলায় তাদৃশ কুলীনের সংখ্যা অধিক। কুলীনদিগের বিবাহের যে সংখ্যা প্রদর্শিত হইল, তাহা ন্যূনাধিক হইবার সম্ভাবনা। যাঁহারা অধিকসংখ্যক বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহারা নিজেই স্বকৃত বিবাহের প্রকৃত সংখ্যা অবধারিত বলিতে পারেন না। সুতরাং, অন্যের তাহা অবধারিত জানিতে পারা সহজ নহে।... অনুসন্ধান দ্বারা যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাই নির্দেশ করিয়াছি; জ্ঞানপূর্বক কোনও বৈলক্ষণ্য করি নাই।’’[২০]

—আবার রক্ষণশীলরা বহুবিবাহপ্রথাকে শাস্ত্রসম্মত বলে দাবি করেছিল। এর উত্তর দিতে গিয়ে বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ সংক্রান্ত প্রথম গ্রন্থ *বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাবে*

হিন্দু রক্ষণশীলদের যাবতীয় আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, প্রথা নিয়ন্ত্রিত হয় যে শাস্ত্রের দ্বারা সেই *মনুসংহিতা*-র বচন উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে, বিনাকারণে একাধিক বিয়ে করা এবং একাধিক সবর্ণ বিয়ে করা *মনুসংহিতা* অনুসারে নিষিদ্ধ। তাহলে কুলীন ব্রাহ্মণদের কৌলীন্যপ্রথার দোহাই দিয়ে যে অসংখ্য সবর্ণ বিবাহ তা *মনুসংহিতা* অনুসারে নিষিদ্ধ। এভাবে বিদ্যাসাগর বহুবিবাহকে শাস্ত্রনিষিদ্ধ প্রমাণ করে লিখেছেন—

> ''এ দেশের লোকে, কোনও কালে, কোনও বিষয়ে শাস্ত্রের ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন করিয়া চলেন না; তাঁহাদের যাবতীয় ব্যবহার শাস্ত্রীয় বিধি ও শাস্ত্রীয় নিষেধ অনুসারে নিয়মিত; যদি ইহা স্থির সিদ্ধান্ত হইত, তাহা হইলে, এ দেশের লোকের ব্যবহার-দর্শনে, হয় তা যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এরূপ সন্দেহ করিলে নিতান্ত অন্যায় হইত না। কিন্তু যখন যাদৃচ্ছিক বহুবিবাহব্যবহার শাস্ত্রকারদিগের মতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ দৃষ্ট হইতেছে, তখন তাদৃশব্যবহারদর্শনে, উহা শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এরূপ মীমাংসা করা কোনও মতে সঙ্গত হইতে পারে না। তবে, এদেশের লোক অনেক বিষয়ে শাস্ত্রের নিষেধ লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া থাকেন, সুতরাং বিবাহবিষয়েও তাঁহারা তাহা করিতেছেন, এজন্য তাহা বিশেষ দোষাবহ হইতে পারে না, এরূপ নির্দেশ করিলে, বরং তাহা অপেক্ষাকৃত ন্যায়ানুগত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত।''[২১]

বিদ্যাসাগর তাঁর বহুবিবাহ সংক্রান্ত প্রথম পুস্তকে বহুবিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ প্রমাণ করলে অনেকেই এবিষয়ে অসন্তুষ্ট হয়ে বিদ্যাসাগরকে আক্রমণ করেছিলেন এবং তাঁরা দেখাতে চেয়েছিলেন যে বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত। বিদ্যাসাগর বিরোধীদের আক্রমণের উত্তর দিয়ে পুনরায় বহুবিবাহকে শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলে সিদ্ধান্ত করেছিলেন তাঁর বহুবিবাহ সংক্রান্ত দ্বিতীয় পুস্তক *বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিৎ কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার* (১৮৭৩খ্রি.) গ্রন্থে। এভাবে রক্ষণশীলদের সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে এবং বহুবিবাহের কুফল সম্পর্কে জনমত গড়ে তুলে বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ আন্দোলনকে একটা দৃঢ়তা দিয়েছিলেন।

আইন করে বহুবিবাহপ্রথা নিষিদ্ধ করার জন্যে *বন্ধুবর্গ সমবায়* সভার পক্ষ থেকে কিশোরীচাঁদ মিত্রের উদ্যোগে ব্রিটিশ সরকারের কাছে একটি আবেদনপত্র পাঠানো হয়েছিল ১৮৫৫ সালের প্রথম দিকে। এটি সরকারের কাছে প্রেরিত কৌলীন্যপ্রথা নিবারণ করার জন্যে প্রথম আবেদনপত্র।

বস্তুত এই আবেদনপত্র পাঠানো হলে রক্ষণশীল সমাজও চুপ করে থাকেনি। এর প্রতিক্রিয়ায় রক্ষণশীল সমাজের পক্ষ থেকে রাধাকান্ত দেব বহুবিবাহ প্রথাকে শাস্ত্রসম্মত বলে ঘোষণা করে এবং এই প্রথা উচ্ছেদ করলে হিন্দুধর্ম ও সংস্কারে আঘাত হানা হবে বলে এই প্রথা নিষিদ্ধ না করার জন্য সরকারের কাছে আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন। এরপর ১৮৫৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর আইন করে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করার জন্যে সরকারের কাছে একটি আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের পর বিভিন্ন স্থান থেকে বহুবিবাহ রদ করার জন্যে সরকারের কাছে আবেদনপত্র পাঠানো হয়। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য— বর্ধমানের মহারাজার আবেদন, নদীয়ার রাজার আবেদন, কলকাতার অধিবাসীদের আবেদন প্রভৃতি। বস্তুত বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ আন্দোলনের ফলেই এদেশের অনেক প্রগতিশীল মানুষ বহুবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতন হয়ে বহুবিবাহ আইন করে নিষিদ্ধ করার জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছে বিভিন্ন প্রস্তাব ও একের পর এক আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন।

রক্ষণশীল সমাজের বিরোধিতা সত্ত্বেও বহুবিবাহ রদ করার পক্ষে অনেকগুলি আবেনপত্র পেয়ে গ্রান্ট সাহেব বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করতে বিল প্রস্তুত করলেও তা শেষপর্যন্ত আইনে পরিণত হয় না। কেননা এসময় সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হওয়ায় ব্রিটিশ সরকার তা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং এরকম পরিস্থিতিতে দেশীয় মানুষদের মনে অসন্তোষ সৃষ্টি হতে পারে ভেবে ব্রিটিশ সরকার এদেশে প্রচলিত কোন প্রথায় হস্তক্ষেপ করতে চায়নি। এছাড়া ১৮৫৮ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারত শাসনের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়ে ঘোষণা করেছিলেন যে, ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের ধর্মীয় আচার-আচরণ, প্রথা প্রভৃতিতে হস্তক্ষেপ করবে না। তাই আইন করে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করার সব ব্যবস্থা ঠিক থাকলেও ব্রিটিশ সরকার আর বহুবিবাহ নিষিদ্ধ আইন প্রণয়ন করেনি। তবে বহুবিবাহ বিরোধী আইন প্রণীত না হলেও বহুবিবাহ আন্দোলনকে আমরা পুরোপুরি ব্যর্থ বলতে পারি না। বিভিন্ন প্রগতিশীল ব্যক্তিবর্গ, সাময়িক পত্রে বহুবিবাহের কুফল সম্পর্কে যেসব আলোচনা হয়েছে তা একেবারে ব্যর্থ হয়নি। কেননা বহুবিবাহ আন্দোলনের ফলে দেশীয় মানুষদের মনে বহুবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে ওঠে। তাইতো বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেকগুলি আবেদনপত্র সরকারের কাছে জমা পড়েছিল। আর আমরা জানি কোন কিছু প্রবর্তন কিংবা নিষিদ্ধ করতে আইন প্রণয়নের চেয়ে সবথেকে বেশি প্রয়োজন গণসচেতনতা। কেননা দেশের মানুষ সচেতন না হলে আইন শুধু কাগজে-কলমেই থেকে যায়, বাস্তবে তা কার্যকরী হয় না। বহুবিবাহ

রদ আইন প্রণীত না হলেও বহুবিবাহ আন্দোলনের ফলে বহুবিবাহের কুফল সম্পর্কে যে গণসচেতনতা গড়ে উঠেছিল তা থেকেই পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে এদেশে পুরুষের বহুবিবাহের সংখ্যা অনেকটাই হ্রাস পেয়েছিল।

বাল্যবিবাহ আন্দোলন বিষয়ে আলোচনার পূর্বে বিবাহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শাস্ত্রে কী নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা জেনে নেওয়া যাক। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের লিখিত সংবিধান *মনুসংহিতা*-য় নারীর বিবাহের বয়স নির্দেশ করতে গিয়ে বলা হয়েছে নারীর বিয়ের সর্বাধিক বয়স বারো বছর, আর নারীর বিয়ের স্বাভাবিক বয়স ঋতুমতী হওয়ার সময়। তবে উপযুক্ত পাত্র পাওয়া গেলে নারী ঋতুমতী না হলেও বিয়ে দেওয়া যাবে বলে মনু বিধান দিয়েছেন। আবার অঙ্গিরার মতে, আট থেকে দশ বছর বয়স হল নারীর বিবাহের আদর্শ সময়। তবে অঙ্গিরা পুরুষের ক্ষেত্রে বিয়ের কোন নির্দিষ্ট বয়সের কথা বলেননি। অর্থাৎ আমরা দেখলাম বিভিন্ন শাস্ত্রে বাল্যবিবাহের নির্দেশ আছে। মধ্যযুগেও বাল্যবিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল— মধ্যযুগের বিভিন্ন সাহিত্যে এর প্রমাণ রয়েছে। মধ্যযুগ থেকে শুরু করে এদেশে উনিশ শতকের আগে পর্যন্ত বাল্যবিবাহ নির্বিচারে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। কিন্তু উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের ফলে এদেশের স্বল্পসংখ্যক মানুষ চেতনার জাগরণে বাল্যবিবাহকে মেনে নিতে পারেননি। কেননা বাল্যবিবাহের ফলে নারী ও পুরুষ উভয়ের ওপরেই খারাপ প্রভাব পড়ে— বিশেষত নারীদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার অবনতি ঘটে। মূলত বাল্যবিবাহের ফলে নারীদের করুণ পরিণতি নিয়ে ভাবনা-চিন্তা শুরু করে উনিশ শতকের নতুন ভাবনায় ভাবিত এদেশের কিছু প্রগতিশীল মানুষ। তাই তো উনিশ শতকে এদেশের প্রগতিশীল মানুষরা নানাভাবে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে থাকেন। এভাবে বিভিন্ন জনের প্রচেষ্টায় উনিশ শতকে এদেশে নারীকেন্দ্রিক আরেকটি সমাজ-সংস্কার আন্দোলন— বাল্যবিবাহ আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল।

বিদ্যাসাগর অন্যান্য সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের মতো বাল্যবিবাহ আন্দোলনেও একটি স্মরণীয় নাম। তিনি বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। তিনি মনে-প্রাণে চেয়েছিলেন বাল্যবিবাহ নিবারণ করতে। সেজন্যে তিনি বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে *বাল্যবিবাহের দোষ* (১৮৫০ সালে *সর্বশুভকরী* পত্রিকায় প্রকাশিত) নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি মূলত বাল্যবিবাহের ফলে অল্পবয়সে সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে এদেশের নারীদের অকাল মৃত্যু ও তাদের শারীরিক অবস্থার অবনতি, অপরিণত-দুর্বল সন্তানের

জন্ম, নারী-পুরুষের নৈতিক অবক্ষয়, দাম্পত্যসংকট প্রভৃতি সমস্যা তথা খারাপ দিককে তুলে ধরে বাল্যবিবাহ নিবারণের জন্যে গণসচেতনতা তৈরি করতে চেয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের ভাষায়—

> ‘‘বাল্যকালে বিবাহ হওয়াতে বিবাহের সুমধুর ফল যে পরস্পর প্রণয়, তাহা দম্পতিরা কখন আস্বাদ করিতে পায় না, সুতরাং পরস্পরের সপ্রণয়ে সংসারযাত্রার নির্বাহকরণ বিষয়েও পদে পদে বিড়ম্বনা ঘটে, আর পরস্পরের অত্যন্ত অপ্রীতিকর সম্পর্কে যে সন্তানের উৎপত্তি হয়, তাহাও তদনুরূপ অপ্রশস্ত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। আর নব-বিবাহিত বালক-বালিকারা পরস্পরের চিত্তরঞ্জনার্থে রসালাপ, বিদগ্ধতা, বাক্‌চাতুরী, কামকলাকৌশল প্রভৃতি অভ্যাসকরণে ও প্রকাশকরণে সর্বদা সযত্ন থাকে, এবং তত্তদ্বিষয়ে প্রয়োজনীয় উপায়পরিপাটী পরিচিন্তনেও তৎপর থাকে, সুতরাং তাহাদিগের বিদ্যালোচনায় বিষম ব্যাঘাত জন্মিবাতে সংসারের সারভূত বিদ্যাধনে বঞ্চিত হইয়া কেবল মনুষ্যের আকারমাত্রধারী, বস্তুতঃ প্রকৃতরূপে মনুষ্যগণনায় পরিগণিত হয় না।’’[২২]

—বিদ্যাসাগরের পাশাপাশি *সোমপ্রকাশ, গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা, অমৃতবাজার* প্রভৃতি পত্রিকা বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে নানা লেখা প্রকাশ করে এদেশের মানুষদের বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে চেয়েছিল। এভাবে বাল্যবিবাহ আন্দোলনে এদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

উনিশ শতকে বাল্যবিবাহ আন্দোলনে ব্রাহ্মসমাজও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সেকালে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে যে ব্রাহ্মবিবাহ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তা হিন্দুবিবাহ পদ্ধতি থেকে ভিন্ন এবং এই ব্রাহ্মবিবাহে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মসমাজ মূলত জাতিভেদপ্রথার অবসানের জন্যে অসবর্ণ বিবাহ পদ্ধতির প্রবর্তন করেছিল। কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মবিবাহে এই অসবর্ণ বিবাহকে আইন সিদ্ধ করার জন্যে উদ্যোগী হয়ে উঠেছিলেন এবং মূলত তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৮৭২ সালে ব্রাহ্মবিবাহের জন্যে নতুন একটি বিবাহবিধি চালু হয়— তা *তিন আইন* বিবাহবিধি নামে পরিচিত। এই বিবাহবিধির কয়েকটি শর্তের মধ্যে একটি শর্তে পুরুষের বিবাহের বয়স স্থির করা হয় কমপক্ষে আঠারো এবং নারীর বিবাহের বয়স স্থির করা হয় কমপক্ষে চোদ্দ বছর— যা বাল্যবিবাহের পরিপন্থী। এর ফলে সমগ্র বাংলাদেশে না হলেও ব্রাহ্মদের মধ্যে বাল্যবিবাহ হ্রাস পেয়েছিল। আবার এসময় বাংলাদেশের ব্রাহ্মরাও বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন এবং বাল্যবিবাহ

নিবারণের জন্যে তাঁরা *বাল্যবিবাহ নিবারণী সভা* স্থাপন করেছিলেন। এই সভায় স্থির করা হয় পুরুষের বিবাহের বয়স কমপক্ষে একুশ বছর এবং নারীর বিবাহের বয়স কমপক্ষে চোদ্দ বছর। এই সভার সভ্যরা নিজেদের বিয়ের ক্ষেত্রে এই নিয়ম মেনে চলতেন। এভাবে সেকালে ব্রাহ্মসমাজ নিজেদের মধ্যে হলেও বাল্যবিবাহ নিবারণ করতে সক্ষম হয়েছিল। তাই বাল্যবিবাহ আন্দোলনে ব্রাহ্মসমাজেরও ভূমিকা আছে।

বাল্যবিবাহ আন্দোলনের ফলে উনিশ শতকে বাল্যবিবাহ বিরোধী আইন প্রণীত না হলেও এই আন্দোলনের প্রেক্ষিতেই পরবর্তীকালে ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৯ সালে এই আইন পাশ করেছিল ব্রিটিশ সরকার। আর ১ এপ্রিল ১৯৩০ সালে বাল্যবিবাহ বিরোধী আইনটি কার্যকর হয়েছিল। এই আইনটি সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের জন্যে কার্যকর হয়েছিল। এই আইন অনুযায়ী পুরুষের বিবাহের বয়স কমপক্ষে একুশ বছর এবং নারীর বিবাহের বয়স কমপক্ষে আঠারো বছর স্থির করা হয়েছিল। ১৯৫০ সালে ভারতীয় সংবিধান গৃহীত হলে ১৯২৯ সালের ব্রিটিশ সরকার প্রণীত আইনে নারী ও পুরুষের বিবাহের বয়স এক রেখে নানা সংশোধন করা হয়েছিল। তবে এই আইন প্রণয়নের পরেও ভারতে বাল্যবিবাহ একেবারে নির্মূল হয়নি, এমনকি আজও ভারতের শহরে-গ্রামে বাল্যবিবাহ প্রতিনিয়ত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এসব কথা মনে রেখেও আমরা বলতে পারি যে, উনিশ শতকে এদেশের সমাজ-সংস্কারকরা যে বাল্যবিবাহ আন্দোলন করেছিলেন মূলত তার ওপর ভিত্তি করেই বাল্যবিবাহ বিরোধী আইন প্রণীত হয়েছিল— তার ফলে এদেশে বাল্যবিবাহের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে এবং অদূর ভবিষ্যতে আরও হ্রাস পাবে। তাই উনিশ শতকের বাল্যবিবাহ বিরোধী আন্দোলনকে একেবারে ব্যর্থ বলা যায় না।

উনিশ শতকে এদেশের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নারীকেন্দ্রিক সমাজ-সংস্কার আন্দোলন হল নরী শিক্ষা আন্দোলন। উনিশ শতকের আগে পর্যন্ত এদেশের নারীদের শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল। পরে উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে এদেশের কিছু প্রগতিশীল ব্যক্তি নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। এরপর উনিশ শতকে একের পর এক বিভিন্ন ব্যক্তিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে নানা বিরোধিতার মধ্য দিয়ে নারী শিক্ষার সূচনা হয়েছিল। এই স্ত্রীশিক্ষা তথা নারী শিক্ষার সূচনা ও বিস্তার বিষয়ে তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আমরা বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখলাম যে, উনিশ শতকে এদেশে নবজাগরণের পূর্বে নারীদের

দুরবস্থা নিয়ে সেরকম কোন ভাবনা-চিন্তা না হলেও নবজাগরণের প্রভাবে যেসব সমাজ-সংস্কার আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল সেগুলির অধিকাংশই নারী কেন্দ্রিক। অর্থাৎ উনিশ শতক থেকেই এদেশে নারী ভাবনার তথা নারীদের দুর্দশা থেকে মুক্ত করার জন্যে ব্যাপকভাবে ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়েছিল। তারই ফলশ্রুতিতে উনিশ শতকে এদেশে একের পর এক নারীকেন্দ্রিক সমাজ-সংস্কার আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। তবে এসব সমাজ-সংস্কার আন্দোলনগুলির অধিকাংশই ব্যর্থ হলেও এগুলির মধ্য দিয়ে নারীকে মুক্ত করার যে প্রাথমিক সোপান রচিত হয়েছিল তার ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে নারীরা অন্ধকার থেকে আলোর দিশা খুঁজে পেয়েছিলেন। তাই উনিশ শতকের পিতৃতান্ত্রিক রক্ষণশীল সমাজের প্রেক্ষাপটে নারী ভাবনার উন্মেষে এই সমাজ-সংস্কার আন্দোলনগুলির গুরুত্ব আছে। কেননা এই সমাজ-সংস্কার আন্দোলনগুলির মাধ্যমে নারীদের নিয়ে যে ভাবনা-চিন্তার সূত্রপাত হয়েছিল তাই পরবর্তীকালে বিস্তৃত হয়ে নারী স্বাধীনতার পথকে অনেকটাই প্রশস্ত করেছিল।

তথ্যসূত্র:

১. শরীফ আহমদ : বাঙলা, বাঙালী ও বাঙালীত্ব, অনন্যা, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ: আগস্ট ২০০৭, পৃ. ১৮৭

২. রায় অন্নদাশঙ্কর : শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ, বাণীশিল্প, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ: অক্টোবর ২০০১, পৃ. ১৯৮

৩. শরীফ আহমদ : বাঙলা, বাঙালী ও বাঙালীত্ব, অনন্যা, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ: আগস্ট ২০০৭, পৃ. ১৮৩, ১৮৪

৪. ঘোষ বিনয় : বাংলার নবজাগৃতি, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ: বৈশাখ ১৪২৩, পৃ. ১৫৮, ১৫৯

৫. মজুমদার উজ্জ্বলকুমার (সম্পাদনা): বাঙালির সাংস্কৃতিক দিগন্ত, সোনার তরী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: আগস্ট ২০০১, পৃ. ১৫৪

৬. বসু স্বপন : বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ: আগস্ট ২০১৬, পৃ. ১০০

৭. প্রাগুক্ত : পৃ. ১০১

৮. বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ : সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য

(সঙ্কলিত ও সম্পাদিত) পরিষদ্ মন্দির, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ: আষাঢ় ১৩৪৪, পৃ. ২৮৫

৯. বসু স্বপন : বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ: আগস্ট ২০১৬, পৃ. ১১৮

১০. বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ : (সঙ্কলিত ও সম্পাদিত) সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ মন্দির, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ: আষাঢ় ১৩৪৪, পৃ. ৩০০, ৩০১

১১. চক্রবর্তী সুবোধ (সম্পাদনা) : বিদ্যাসাগর রচনাবলী (অখণ্ড সংস্করণ), কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ: চৈত্র ১৪১৬, পৃ. ৫৬৯

১২. প্রাগুক্ত : পৃ. ৫৭০, ৫৭১

১৩. প্রাগুক্ত : পৃ. ৫৭৩

১৪. প্রাগুক্ত : পৃ. ৬৮০, ৬৮১

১৫. ঘোষ বিনয় : বাংলার নবজাগৃতি, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ: বৈশাখ ১৪২৩, পৃ. ১৬২

১৬. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৬২

১৭. বসু স্বপন, চৌধুরী ইন্দ্রজিৎ (সম্পা.): উনিশ শতকের বাঙালিজীবন ও সংস্কৃতি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ২৯ নভেম্বর ২০০৩, পৃ. ১৬৯

১৮. বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ : (সংঙ্কলিত ও সম্পাদিত) সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ: পৌষ ১৪০১, পৃ. ২৪৯, ২৫০

১৯. চক্রবর্তী সুবোধ (সম্পাদনা) : বিদ্যাসাগর রচনাবলী (অখণ্ড সংস্করণ), কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ: চৈত্র ১৪১৬, পৃ. ৬৮৮

২০. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭১৭

২১. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭৪৮

২২. প্রাগুক্ত : পৃ. ৫৫৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

উনিশ শতকের লেখিকাদের পরিচিতি এবং তাঁদের রচনার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

আমরা যদি প্রাচীন ভারতবর্ষের দিকে তাকাই তাহলে দেখব সেসময় নারীদের স্থান ছিল সবদিক থেকেই উন্নত। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে নারীদের সম্মানজনক স্থান ছিল— তাঁরা ছিলেন শিক্ষিতা। বৈদিক যুগের এরকম শিক্ষিতা নারীরা হলেন ঘোষা, লোপামুদ্রা, গার্গী প্রমুখ। কিন্তু নারীদের এই সামাজিক অবস্থান বেশিদিন স্থায়ী হল না। নারীদের সামাজিক অবস্থানের অবনতি ঘটল মুসলমান আমলে, বিশেষত মোগল আমলে। এ সময় থেকেই শুরু হল সবদিক থেকে নারীদের পিছিয়ে রাখার বা বন্দী করে রাখার নানা কৌশল। এক্ষেত্রে নানা ধরনের কুসংস্কার দিয়ে নারীদের বন্দী করে ফেলা হলো। আমরা জানি শিক্ষাই আনতে পারে প্রকৃত মুক্তি। নারীরা যাতে এই মুক্তির আস্বাদ না পায়, সেজন্য প্রথমেই যে কাজটি করা হল, তা হল নারীদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা। আর সেজন্য হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগানো হল সামাজিক নানা কুসংস্কার— নারীরা শিক্ষিতা হলে বিধবা হবে ইত্যাদি। স্বাভাবিকভাবেই নারীদের কাছে শিক্ষার দরজা বন্ধ হয়ে গেল। এরকম অশিক্ষিতা হয়ে পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মতো নারীদের দিন কেটেছিল অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। মধ্যে শুধু চন্দ্রাবতী তাঁর নিজের কাহিনি শুনিয়ে গেছেন আমাদের কাছে; তারপরে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এদেশের নারীদের কোনো কণ্ঠস্বর আমরা শুনতে পাইনি সাহিত্যে। এভাবে নারীদের জীবনের সুখ-দুঃখ-কষ্টের, আনন্দ-বেদনার, শোকের ইতিবৃত্ত কেটে গেছে অন্তঃপুরেই, অন্ধকারের মধ্যেই। তবে আমরা জানি অন্ধকার যত বেশি হয় ততই আলোর সম্ভাবনাও প্রকট হয়। নারীদের এই অন্ধকারময় জীবনে আলোর বার্তা বহন করে এনেছিল উনিশ শতকের নবজাগরণ। নবজাগরণের ফলে ধর্ম, বিজ্ঞান, সমাজ, শিক্ষা প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই নতুন করে বিচার-বিশ্লেষণ শুরু হলো। বিশেষত শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীদেরও যে পুরুষদের মতই সমান অধিকার আছে— এ বিষয়ে বিস্তর বিচার-বিশ্লেষণ হল। নবজাগরণের একটি বড় দিক হল নারী জাগরণ অর্থাৎ নারীমুক্তি। আর নারীমুক্তির জন্য প্রথম প্রয়োজন নারীদের শিক্ষিত করা। এদিকে উনিশ শতকে ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে এদেশের শিক্ষিত যুবকেরা তাদের উপযুক্ত সঙ্গিনী হিসেবে শিক্ষিতা নারী চাইল। ফলস্বরূপ অনেক প্রগতিশীল মানুষ ঘরেই মেয়েদের শিক্ষা দিতে লাগল এবং অনেকে আবার

স্ত্রীকে নিজের উপযুক্ত করে তোলার জন্য বিয়ের পরে স্ত্রীকে শিক্ষাদান করতে লাগল। এছাড়া এসময় ব্রাহ্মসমাজ, ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী, প্রগতিশীল মানুষেরা নারীদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য নানা চেষ্টা করতে লাগলেন। পরে বেথুন সাহেবের প্রচেষ্টায় *ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল* প্রতিষ্ঠিত হলে অনেক নারী বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষিতা হওয়ার সুযোগ পায় এবং বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় পরবর্তীকালে অনেকগুলি বালিকা বিদ্যালয় তৈরি হয়েছিল। যদিও সেসময় রক্ষণশীল সমাজের চাপে অনেক নারীই বালিকা বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষা লাভ করতে পারেনি তবুও বাংলাদেশে এসময় থেকেই নারী শিক্ষার একটা জোয়ার এসেছিল। নারী শিক্ষা বিষয়ে আর বিস্তৃত আলোচনা আমরা এ অধ্যায়ে করব না, কেননা এ অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য বিষয় ভিন্ন। তবে প্রসঙ্গক্রমে নারী শিক্ষা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে করা হল— এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে করেছি।

উনিশ শতকে এভাবে নারী শিক্ষার সূত্রপাত হলে নারীরাও কিছু কিছু সাহিত্য রচনা করতে লাগলেন। নারীদের এই সাহিত্য সৃষ্টিকে নারী মুক্তির প্রথম আত্মপ্রকাশ বলা যায়। তবে আমরা একথা কখনই বলব না যে, শিক্ষিত হলেই সাহিত্য সৃষ্টি করা যায়। কেননা সাহিত্য প্রতিভা না থাকলে সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না। এ প্রসঙ্গে জীবনানন্দ দাশ বলেছিলেন—

> ''সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি; কবি— কেননা তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধরে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্য-বিকীরণ তাদের সাহায্য করছে। সাহায্য করছে; কিন্তু সকলকে সাহায্য করতে পারে না; যাদের হৃদয়ে কল্পনা ও কল্পনার ভিতরে অভিজ্ঞতা ও চিন্তার সারবত্তা রয়েছে তারাই সাহায্য প্রাপ্ত হয়; নানা রকম চরাচরের সম্পর্কে এসে তারা কবিতা সৃষ্টি করবার অবসর পায়।''[১]

— আর আমরা জানি যাঁদের এই কাব্যপ্রতিভা তথা সাহিত্যপ্রতিভা থাকে তাঁরা সবসময় তাঁদের সেই প্রতিভাকে বাইরে প্রকাশ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকেন— এক্ষেত্রে সেই সাহিত্যপ্রতিভা বহিঃপ্রকাশের মাধ্যম হল ব্যঞ্জনাময় ভাষা। সেজন্য প্রয়োজন শিক্ষা, কেননা শিক্ষিত না হলে সেই সাহিত্যপ্রতিভা ব্যঞ্জনাময় ভাষার মধ্য দিয়ে লিখিত আকারে প্রকাশিত হবার সুযোগ পাবে না। তাই উনিশ শতকে নারী শিক্ষার সূত্রপাত হলে যাঁরা শিক্ষিতা হবার সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁদের সকলের

সাহিত্যপ্রতিভা না থাকলেও কিছু সংখ্যক নারীর যে সাহিত্যপ্রতিভা ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত অনেক নারীর সাহিত্যপ্রতিভা থাকলেও শুধুমাত্র শিক্ষার অভাবে সে প্রতিভার অপমৃত্যু হয়েছে, কেননা লেখার মধ্য দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ সম্ভব হয়নি। তাই উনিশ শতকে যখনই নারী শিক্ষার সূত্রপাত হলো তখনই যেসকল নারীর সাহিত্যিক প্রতিভা ছিল তার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকল, লেখনীর মধ্য দিয়ে তাঁরা আত্মপ্রকাশের মাধ্যম খুঁজে পেলেন। এক নতুন বিপ্লব ঘটে গেল। হ্যাঁ, একে আমরা বিপ্লবই বলব, কেননা এই উনিশ শতক থেকেই আমরা সাহিত্যে পেয়ে গেলাম অনেক মহিলা কবি, কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার ইত্যাদি— যে বাংলা সাহিত্য সৃষ্টিতে পুরুষদেরই একচ্ছত্র অধিকার ছিল সেখানে নারীরাও তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করলেন। এ বিষয়ে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন—

> ''... উনিশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন হলে মহিলারাও সাহিত্য রচনা, বিশেষত কবিতায় আত্মপ্রকাশ করতে লাগলেন। স্বামী বা নিকট আত্মীয়ের সহায়তায় তাঁরা পুরুষ-কবিদের পাশে সসঙ্কোচে স্থান পেলেন। এ ধরনের মহিলা-কবির সংখ্যা কিন্তু অল্প নয়।''[২]

উনিশ শতকে নারী শিক্ষার প্রচলনের ফলে বাংলা সাহিত্যে অনেক মহিলা সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটেছিল— একথা আমরা বলেছি এবং সকলে একথা একবাক্যে স্বীকার করবেন। তবে নারীদের সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার পেছনে তৎকালীন সাময়িক পত্রিকাগুলির অবদানের কথা বিস্মৃত হলে আমাদের চলবে না। কেননা উনিশ শতকে নারীরা শিক্ষিতা হলে তাঁরা তাঁদের সাহিত্যিক প্রতিভা লিখিত আকারে প্রকাশের সুযোগ পেলেন, কিন্তু সেই প্রতিভা সকলের সামনে তুলে ধরার কাজটি করেছিল তৎকালীন সাময়িক পত্রিকাগুলি। এছাড়া সেসময়ের অনেক শিক্ষিতা নারী সাময়িক পত্রিকাগুলি পড়তেন— যা থেকে তাঁরা কখনো কখনো সাহিত্য সৃষ্টির অনুপ্রেরণা পেতেন। তাঁরাও ভাবতে সাহস পেয়েছিলেন যে, তাঁদের মনের আবেগ; তৎকালীন সমাজ-জীবন বিষয়ে নিজেদের চিন্তা-ভাবনাকে সাহিত্যের মাধ্যমে সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশ করে সকলের কাছে নিজেদের প্রতিভাকে তুলে ধরার কথা। এ প্রসঙ্গে সুতপা ভট্টাচার্য প্রাসঙ্গিকভাবেই জানিয়েছেন—

> ''উনিশ শতকের প্রথমার্ধে মেয়েরা যে অল্প কয়েকটি চিঠিও লিখতে সাহস পেয়েছিলেন, তার পিছনে কোনো কোনো সাময়িক পত্রের বিশেষ ভূমিকা ছিল বলে মনে হয়। ... উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মেয়েদের লেখা দু-তিনটি দুঃসাহসী

> চিঠি প্রকাশ করতে পেরেছিলেন 'সোমপ্রকাশ', ... নিতান্ত অল্পসংখ্যক মেয়ে, যাঁরা কোনোভাবে লেখাপড়া শেখার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁরা নিশ্চয়ই এসব সাময়িক পত্র পড়তেন, যার ফলে তাঁরা ভাবতে পেরেছিলেন এদের মাধ্যমে সমাজবিধির বিষয়ে নিজেদের ভাবনাকে প্রকাশ করার কথা।"[৩]

উনিশ শতকের নারীদের সাহিত্যিক প্রতিভাকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে যেসব সাময়িক পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাময়িক পত্রিকাগুলি হল— *বামাবোধিনী*, *সোমপ্রকাশ*, *সমাচার দর্পণ*, *সম্বাদ কৌমুদী* ইত্যাদি। বিশেষত *বামাবোধিনী* পত্রিকা লেখালেখি করার জন্য নারীদের বিশেষভাবে উৎসাহ দিত এবং নারীদের লেখা প্রকাশ করত। তবে সেসময় বেশিরভাগ সাময়িকপত্রে নারীদের লেখা কবিতাই প্রকাশিত হত। বিশেষত পুরুষতান্ত্রিক সমাজ মনে করতো নারীরা গুরুগম্ভীর বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে না— গদ্য লেখা নারীদের কর্ম নয়। তবে *সোমপ্রকাশ*, *বামাবোধিনী* প্রভৃতি সাময়িক পত্রে নারীদের লেখা যুক্তিসম্মত গদ্য-নিবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে। সমাজ-রাষ্ট্র প্রভৃতি বিষয়েও যে নারীদের নিজস্ব ভাবনা-চিন্তা আছে, বিভিন্ন সাময়িকপত্রে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত নারীদের লেখা গদ্য নিবন্ধগুলি তার নিদর্শন। যদিও তৎকালীন সাময়িক পত্রিকাগুলি গদ্য লেখার ব্যাপারে নারীদের বিষয় নির্বাচন করে দিয়েছিল তবুও মাঝে মাঝে নারীদের লেখা কিছু কিছু ভাবনামূলক গদ্যের নিদর্শন পেয়েই যাই সেই সময়কার সাময়িক পত্রিকাগুলিতে।

এভাবে উনিশ শতকে নারী শিক্ষা প্রচলিত হওয়ায় এবং সেই সময়কার বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকাগুলি নারীদের লেখা প্রকাশ করায় একে একে বহু লেখিকার আবির্ভাবে এবং তাঁদের সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে উনিশ শতক থেকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে লেখিকাদের সাহিত্যচর্চার ধারাবাহিকতা দেখা যায়। এ সময় যেমন অনেক লেখিকার আবির্ভাব হয়, তেমনি তাঁদের রচনায় শুধু কবিতা নয়, নাটক; গল্প; উপন্যাস; প্রবন্ধ; আত্মকথা প্রভৃতি সবই আমরা পেয়ে গেলাম— যা নিঃসন্দেহে নারীমুক্তির বার্তাবাহক। কেননা এতদিন পর্যন্ত নারীদের দুঃখ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, পরাধীনতা, শোক ইত্যাদির কোনো মূল্য ছিল না পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কাছে। কিন্তু সাহিত্যের মধ্য দিয়ে নারীদের এসব ভাবনা যখন প্রকাশ পেল তখন নারীদের এসব ভাবনাকেও মর্যাদা দেওয়া হল। এভাবে উনিশ শতকে নারী শিক্ষার প্রচলন হলে বহু নারী লেখাপড়া শিখে নিজস্ব জীবন-অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় রূপ দিতে থাকেন। আবার অনেক নারী লেখাপড়া

না শিখলেও নিজেদের জীবন-কথাকে স্মৃতির আকারে অপরের লেখনীর সাহায্যে লিপিবদ্ধ করে গেছেন এবং তা সাহিত্য পদবাচ্যও হয়েছে। লেখাপড়া না শিখেও যে মুখে মুখে সাহিত্য রচনা করে অপরের লেখনীর সাহায্যে তা প্রকাশ করা যায়— এ বিষয়টি নিয়ে একটু আলোচনার প্রয়োজন আছে। কেননা আমরা পূর্বেই বলেছি যে, উনিশ শতকে নারী শিক্ষার সূত্রপাত হলে অনেক নারী লেখাপড়া শিখে তাঁদের সাহিত্যপ্রতিভাকে লেখনীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। তাই অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন যে, লেখাপড়া না শিখেই যদি সাহিত্য রচনা করা যায় তাহলে উনিশ শতকের পূর্বে যখন এদেশে নারী শিক্ষার প্রচলন ছিল না তখন চন্দ্রাবতী ছাড়া আর কোন নারী কেন সাহিত্য রচনা করলেন না? এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি উনিশ শতকে যতজন লেখিকার আবির্ভাব ঘটেছিল তাঁদের বেশিরভাগই ছিলেন শিক্ষিতা, আর আমরা জানি শিক্ষার মধ্য দিয়েই আমাদের ভাবনা-চিন্তা সুসংবদ্ধ হয় এবং তা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে স্থায়ীরূপ লাভ করে। কাজেই ব্যতিক্রম যদি নিয়ম না হয় তাহলে আমরা বলতেই পারি, নারী শিক্ষার প্রচলনেই উনিশ শতকের নারীরা সাহিত্য রচনা করেছেন। আর উনিশ শতকে নবজাগরণের ফলে মানুষের চিন্তা-ভাবনার মধ্যে নানা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। তখন অনেকেই প্রগতিশীল ভাবনার দ্বারা ভাবিত হয়ে নারীদেরও যে সাহিত্যপ্রতিভা আছে, নারীরাও যে ভাবনা-চিন্তা করতে পারে— তা মেনে নিয়েছিলেন। ফলে উনিশ শতকে লেখাপড়া না শিখেও অনেক নারী অন্যের লেখনীর সাহায্যে তাঁদের সাহিত্যপ্রতিভাকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন যখন তাঁরা দেখলেন অনেক নারীই পুরুষের মতো সাহিত্য সৃষ্টি করছেন। অপর দিকে উনিশ শতকের পূর্বে যখন নারীদের মানুষ হিসেবেই বিবেচনা করা হতো না তখন নারীদের ভাবনা-চিন্তার কোন মূল্যই ছিল না পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কাছে। স্বাভাবিকভাবেই উনিশ শতকের পূর্বে অনেক নারীরই সাহিত্যিক প্রতিভা থাকলেও সে প্রতিভার অপমৃত্যু হয়েছে সামাজিক নানা কুসংস্কার, বিধি-নিষেধের চপেটাঘাতে। তাই উনিশ শতকের পূর্বে যখন এদেশে নারী শিক্ষার সূত্রপাত হয়নি তখন নারীদের পক্ষেও সাহিত্য রচনা করা সম্ভব হয়নি।

উনিশ শতক নানা কারণে ঘটনাবহুল সময়, আর এ সময়ে একে একে অনেক লেখিকার আবির্ভাব এবং সব ধরনের সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের জগতে তাঁদের স্থান পাকা করে নেওয়া একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ সময়ে বাংলা সাহিত্যে রাসসুন্দরী দাসী, সারদাসুন্দরী দেবী, কৈলাসবাসিনী দেবী, প্রসন্নময়ী দেবী, বিনোদিনী দাসী, কৃষ্ণভাবিনী দাসী, নিস্তারিণী দেবী, কামিনী রায়, সুদক্ষিণা সেন, শরৎকুমারী দেব, ইন্দিরা দেবী, মানকুমারী বসু, লীলাবতী মিত্র, আমোদিনী

দাশগুপ্ত, মনোদা দেবী দাশগুপ্তা, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, কৃষ্ণকামিনী দাসী, প্রিয়ম্বদা দেবী, হিরণ্ময়ী দেবী, হেমাঙ্গিনী দেবী, হেমলতা সরকার, সরলাদেবী চৌধুরাণী, রাজলক্ষ্মী দেব্যা, সরোজকুমারী গুপ্তা প্রমুখ লেখিকাদের আবির্ভাব ঘটে। তাঁরা সাহিত্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

রাসসুন্দরী দাসী:

১৮০৯ সালে বর্তমান বাংলাদেশের পাবনা জেলার পোতাজিয়া গ্রামে রাসসুন্দরী দাসী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম পদ্মলোচন রায়। তাঁর যখন বারো বছর বয়স তখন বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার রামদিয়া গ্রামের ভূস্বামী সীতানাথ সরকারের (শিকদার) সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। রাসসুন্দরী দাসী যেসময় জন্মগ্রহণ করেন সেসময়ে বাংলাদেশে মেয়েদের পড়াশোনা করার সুযোগ ছিল না— বিশেষত সামাজিক নানা কুসংস্কারের ঘেরাটোপে মেয়েদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। রাসসুন্দরী দাসীর পড়াশোনার প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহ ও নিষ্ঠা থাকার ফলে তিনি নিজের চেষ্টা-পরিশ্রমে পঁচিশ বছর বয়সে পড়তে শেখেন এবং পঞ্চাশ বছরের অধিক বয়সে লিখতে শেখেন। তিনি ছিলেন ভক্তিমতী মহিলা— তাঁর পড়াশোনা শেখার আগ্রহের মূলে ছিল ধর্মপুস্তক পড়ার সদিচ্ছা। পৌত্রী সরলাবালা সরকারের স্মৃতিকথায় তাঁর শেষ জীবনের কথা আমরা জানতে পারি। ১৯০০ সালে রাসসুন্দরী দাসী ইহলোক ত্যাগ করেন।

যে কারণে রাসসুন্দরী দাসী বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন, সেটি হল তাঁর আত্মজীবনী *আমার জীবন*। গ্রন্থটি বাঙালি নারীর লেখা প্রথম আত্মজীবনী তথা বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রকাশিত আত্মজীবনী। তবে শুধু প্রথম প্রকাশিত আত্মজীবনী হিসেবে নয়, উনিশ শতকের সমাজ-সংস্কৃতির দলিল হিসেবেও গ্রন্থটির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। গ্রন্থটি রামব্রহ্ম মুখোপাধ্যায় কর্তৃক কলকাতার সুচারু যন্ত্রে মুদ্রিত হয়ে ১৮৭৬ সালে বা ১২৮৩ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৮ সালে বা ১৩০৫ বঙ্গাব্দে। প্রথম প্রকাশকালে রাসসুন্দরী দাসী *আমার জীবন*-এর প্রথম ভাগে তাঁর চৌষট্টি বছর বয়স পর্যন্ত জীবনের নানা বৈচিত্র্যময় ঘটনার বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় সংস্করণে রাসসুন্দরী দাসী ষাট পরবর্তী জীবনের নানা ঘটনাকে তুলে ধরেছেন। এভাবে *আমার জীবন* গ্রন্থে রাসসুন্দরী দাসী প্রায় অষ্টাশি বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতা, অনুভব, উপলব্ধিকে সহজ-সরল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। এভাবে গ্রন্থটিতে নিজের জীবনের

কথা বলতে গিয়ে রাসসুন্দরী দাসী উনিশ শতকের সমাজ, নারী শিক্ষা, সংস্কৃতির যে পরিচয় তুলে ধরেছেন সেদিক থেকে উনিশ শতকের সমাজ-সংস্কৃতির দলিল হিসেবে গ্রন্থটির গুরুত্ব আছে।

সারদাসুন্দরী দেবী:

১৮১৯ সালে সারদাসুন্দরী দেবী ত্রিবেণীতে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল চব্বিশ পরগণা জেলার গৌরীভা গ্রামে। পিতার নাম গৌরহরি দাস। সেকালের প্রথা অনুযায়ী মাত্র ন'বছর বয়সে প্রসিদ্ধ দেওয়ান রামকমল সেনের দ্বিতীয় পুত্র প্যারীমোহন সেনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। সারদাসুন্দরী দেবী বিয়ের পর স্বামী প্যারীমোহনের উৎসাহে কিছুটা লেখাপড়া শিখেছিলেন। কেননা সেকালে মেয়েদের লেখাপড়া শেখা ছিল নিষিদ্ধ। সেকালের ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনের নেতা স্বনামধন্য কেশবচন্দ্র সেনের জননী ছিলেন তিনি। পরম ভক্তিমতী ছিলেন সারদাসুন্দরী দেবী। মাত্র ঊনত্রিশ বছর বয়সে তিনি বিধবা হন। পুত্র কেশবচন্দ্র সেন মারা যাওয়ার পরও তেইশ বছর জীবিত ছিলেন তিনি। ফলে একদিকে স্বামীর অকাল মৃত্যু এবং অন্যদিকে পুত্রের অকাল মৃত্যুর শোক বুকে নিয়েই সারদাসুন্দরী দেবীর দীর্ঘজীবন অতিবাহিত হয়েছিল। ১৯০৭ সালে তাঁর জীবনাবসান হয়।

সারদাসুন্দরী দেবী বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন— *আত্মকথা* গ্রন্থটির জন্য। কেননা এই গ্রন্থটি হয়ে উঠেছে তৎকালীন সমাজ জীবনের ঐতিহাসিক দলিল। গ্রন্থটি তিনি স্বহস্তে লেখেননি— মুখে মুখে বলেছেন, আর তার অনুলিখন করেছেন যোগেন্দ্রলাল খাস্তগীর। গ্রন্থটি *মহিলা* পত্রিকায় ১৩১৪ বঙ্গাব্দের পৌষ থেকে ১৩১৬ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে ১৯১৩ সালে সারদাসুন্দরী দেবীর *আত্মকথা* গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

কৈলাসবাসিনী দেবী:

গোরাচাঁদ ঘোষের কন্যা কৈলাসবাসিনী দেবীর জন্ম হয়েছিল আনুমানিক ১৮২৯ সালে। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল রাজপুর। আনুমানিক এগারো বছর বয়সে *ইন্ডিয়ান ফিল্ড* পত্রিকার সম্পাদক এবং *আলালের ঘরের দুলাল*-এর রচয়িতা সুবিখ্যাত প্যারীচাঁদ মিত্রের ভাই কিশোরীচাঁদ মিত্রের সঙ্গে কৈলাসবাসিনী দেবীর বিয়ে হয়েছিল। তাঁদের একমাত্র সন্তান ছিল কুমুদিনী। স্বামী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন বলে স্বামীর কর্মসূত্রে কৈলাসবাসিনী দেবীকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল। তার ফলে তিনি লাভ করেছিলেন জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে বিচিত্র অভিজ্ঞতা। ১৮৯৫ সালে তাঁর জীবনাবসান হয়।

কৈলাসবাসিনী দেবী বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন *ডায়েরী* বা *জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী* নামক আত্মকথাটির জন্য। সুকুমার সেন কৈলাসবাসিনী দেবী সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

> '' যতদূর জানা যায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে ছাপার অক্ষরে লেখা পড়া শেখা প্রথম বাঙ্গালী মহিলা সাহিত্যিক হইতেছেন প্যারীচাঁদ মিত্রের ছোটভাই ... কিশোরীচাঁদ মিত্রের (১৮২২-১৮৭৩) পত্নী কৈলাসবাসিনী দেবী (? - ১৮৯৫)।"[৪]

কৈলাসবাসিনী দেবীর একমাত্র কন্যা কুমুদিনীর দৌহিত্র-পুত্র ডক্টর সুশীলকুমার দে কৈলাসবাসিনী দেবীর জীবনের নানা ঘটনার বিবরণযুক্ত একটি পুরোনো খাতা পান। সেটি সুশীলকুমার দে-র কন্যা সুধীরা বসু ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ-কার্তিক সংখ্যায় মাসিক *বসুমতী* পত্রিকায় *গত যুগের জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী* নামে প্রকাশ করেছিলেন। কৈলাসবাসিনী দেবীর লেখা আত্মকথাটি সম্পাদনা করেছিলেন সুশীলকুমার দে। মাসিক *বসুমতী* পত্রিকায় এই আত্মকথাটি প্রকাশের দীর্ঘ ঊনত্রিশ বছর পর ১৩৮৮ বঙ্গাব্দে শারদীয়া *এক্ষণ* পত্রিকায় এটি *জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী* নামে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল।

প্রসন্নময়ী দেবী:

১৮৫৭ সালে বর্তমান বাংলাদেশের পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন প্রসন্নময়ী দেবী। তাঁর পিতা দুর্গাদাস চৌধুরী ভূস্বামী ছিলেন, পরে জমিদারীর বেশির ভাগ হস্তান্তরিত হলে তিনি গভর্ণমেন্টের অধীনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে যোগদান করেন। প্রসন্নময়ী দেবীর কনিষ্ঠ ভ্রাতারা সকলেই স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন। যেমন— হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার আশুতোষ চৌধুরী; *সবুজপত্রে*-র সম্পাদক, কবি ও প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ। প্রসন্নময়ী যেসময় জন্মগ্রহণ করেন সে সময়ে মেয়েদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় গড়ে উঠলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারী শিক্ষার তেমন প্রচলন ছিল না— কেননা নারীদের শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত করে রাখার জন্য সামাজিক বিধি-নিষেধগুলো জগদ্দল পাথরের মতো সমাজের বুকে চাপানো হয়েছিল, তা পুরোপুরি সরানো যায়নি। কিন্তু হরিপুরের চৌধুরী বংশের নারীরা এতসব সামাজিক বিধি-নিষেধ থাকা সত্ত্বেও কিছু লেখাপড়া শিখতেন। এমনকি প্রসন্নময়ী দেবীর পিসিমারাও লেখাপড়া শিখেছিলেন। প্রসন্নময়ী দেবী প্রথমে বাড়িতে পিতা দুর্গাদাস চৌধুরীর কাছে পড়তেন। বংশের নিয়মানুসারে মাত্র দশ বছর বয়সে বর্তমান বাংলাদেশের পাবনা জেলার গুণাইগাছা গ্রামের কুলীনশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণকুমার বাগচীর সঙ্গে প্রসন্নময়ী দেবীর বিয়ে হয়। কিন্তু স্বামীর সঙ্গসুখ তিনি বেশিদিন পাননি। কেননা বিয়ের মাত্র দু'বছর পরে তাঁর

স্বামী কৃষ্ণকুমার বাগচী উন্মাদরোগগ্রস্ত হলে তিনি পিত্রালয়ে চলে আসেন— এভাবে অল্প বয়সে বিবাহিত জীবন ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় তিনি বাকি জীবন পিত্রালয়েই কাটান এবং পড়াশোনার মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। এসময় পিতার কাছে তিনি বাংলা ও সংস্কৃত বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং ইংরাজিও তিনি ভালোই শিখেছিলেন। প্রসন্নময়ী দেবীর একমাত্র কন্যা প্রিয়ম্বদা দেবীও বাংলা সাহিত্যে কবি হিসেবে সুপরিচিত হয়েছিলেন। ১৯৩৯ সালে প্রসন্নময়ী দেবীর মৃত্যু হয়।

প্রসন্নময়ী দেবীর স্বামী অল্প বয়সেই উন্মাদরোগগ্রস্ত হলে তাঁর জীবন বিষাদময় হয়ে ওঠে এবং তিনি পিত্রালয়ে এসে পড়াশোনায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন, কেননা সংসারে তাঁর বিশেষ কোন কাজ করতে হতো না। ফলে ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখকে ভুলে থাকার জন্য অল্পবয়স থেকেই তিনি পড়াশোনার পাশাপাশি সাহিত্য-চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি *ভারতবর্ষ, মানসী ও মর্মবাণী, মাতৃমন্দির* প্রভৃতি মাসিকপত্রে নিয়মিত লিখতেন। প্রসন্নময়ী দেবীর বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত রচনাগুলি হল—

কাব্য: ১. *আধ আধ ভাষিণী* (১৮৭০ খ্রি:)—এটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা।

২. *বনলতা* (১৮৮০ খ্রি:)

৩. *নীহারিকা* (প্রথম ভাগ-১৮৮৪ খ্রি:, দ্বিতীয় ভাগ-১৮৯৬ খ্রি:)

উপন্যাস: *অশোকা* (১৮৯০খ্রি:)

ভ্রমণ কাহিনি: *আর্য্যাবর্ত্ত* (১৮৮৮ খ্রি:)—এটি বাঙালি মহিলার লেখা প্রথম ভারত ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

জীবনী গ্রন্থ: *তারাচরিত* (১৯১৭ খ্রি:)—এতে লেখিকার কন্যা প্রিয়ম্বদা দেবীর স্বামী তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনকথা বর্ণিত হয়েছে।

আত্মজীবনী: *পূর্ব্বকথা* (১৯১৭ খ্রি:)-এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে কুমুদিনী মিত্র সম্পাদিত *সুপ্রভাত* পত্রিকায় ১৩১৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিন থেকে ১৩২০ বঙ্গাব্দের কার্তিক পর্যন্ত মোট ১৪টি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

বিনোদিনী দাসী:

সমকালের কলকাতার খ্যাতনামা নাট্যাভিনেত্রী বিনোদিনী দাসী ১৮৬৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি থাকতেন মাতামহী এবং মায়ের সঙ্গে তৎকালীন কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের ১৪৫ নম্বর বাড়িতে। অল্পবয়সে তাঁর বিয়ে হলেও স্বামী তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যাননি। শৈশব নানা অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হওয়ায় তিনি মাত্র বারো বছর বয়সে সাধারণ রঙ্গালয়ে

যোগদান করেছিলেন অর্থোপার্জনের জন্য। বিনোদিনীর অভিনয় জীবনের সূত্রপাত হয় ১৮৭৪ সালের ১২ ডিসেম্বর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত *শত্রু সংহার* নাটকে দ্রৌপদীর সখীর ভূমিকায় অভিনয়ের মধ্য দিয়ে। এরপর তিনি নায়িকা চরিত্রে একের পর এক নাটকে সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন— তাঁকে আর ফিরে তাকাতে হয়নি। অভিয়ের জন্য তিনি *সাইনোরা, ফ্লাওয়ার অব দি নেটিভ স্টেজ* ইত্যাদি উপাধি পেয়েছিলেন। তিনি অভিনয়ের শিক্ষা লাভ করেছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষের কাছে। স্টার থিয়েটার নির্মাণে তাঁর ভূমিকা এবং আত্মত্যাগ ছিল গুরুত্বপূর্ণ— কেননা এই থিয়েটার নির্মাণের জন্য তাঁকে গুর্মুখ রায়ের রক্ষিতা হিসেবে থাকতে হয়েছিল। গিরিশচন্দ্র ঘোষের *চৈতন্যলীলা* নাটকে চৈতন্য চরিত্রে বিনোদিনী দাসীর অভিনয় এতটাই নিখুঁত হয়েছিল যে স্বয়ং রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সেই অভিনয় দেখে তাঁকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন 'মা তোমার চৈতন্য হউক'। থিয়েটারের সহকর্মীদের সঙ্গে মনোমালিন্যের কারণে ১৮৮৭ সালে মাত্র চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সে বিনোদিনী দাসী অভিনয় জীবন থেকে অবসর নেন। এভাবে বিনোদিনী দাসী মাত্র চোদ্দ বছরের অভিনেত্রী জীবনে পঞ্চাশটি নাটকে ষাটটিরও বেশি চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। তিনি একমাত্র কন্যা শকুন্তলাকে শিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁর সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি। অনাদর, অবহেলা, উপেক্ষায় তাঁর শেষ জীবন ছিল বড়ই করুণ। ১৮৪১ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

বিনোদিনী দাসী মাত্র চব্বিশ/পঁচিশ বছর বয়সে অভিনয় জীবন থেকে অবসর নিয়ে সাহিত্যচর্চা করেছেন— লিখেছেন অনেক কবিতা, আত্মকথা। তাঁর বিভিন্ন সময়ে লেখা গ্রন্থগুলি হল—

কাব্যগ্রন্থ: *বাসনা*

কাব্যোপন্যাস: *কনক ও নলিনী*

অসমাপ্ত আত্মকথা: ১. *আমার অভিনেত্রী জীবন*

২. *অভিনেত্রীর আত্মকথা*

আত্মজীবনী: *আমার কথা* (১৩১৯ বঙ্গাব্দ)

কৃষ্ণভাবিনী দাসী:

১৮৬৪ সালে কৃষ্ণভাবিনী দাসীর জন্ম হয়েছিল মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের অন্তর্গত কাজলা গ্রামে মতান্তরে নদীয়ার চুয়াডাঙ্গায়। তাঁর পিতার নাম জয়নারায়ণ সর্বাধিকারী। মাত্র ন'বছর বয়সে উকিল শ্রীনাথ দাসের পুত্র দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কৃষ্ণভাবিনীর বিয়ে হয়। কৃষ্ণভাবিনী দাসীর স্বামী

দেবেন্দ্রনাথ বিলেত থেকে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ করে দেশে ফিরলে তখনকার সমাজ সমুদ্র পার হয়ে বিলেত যাওয়ার অপরাধে দেবেন্দ্রনাথকে জাতিচ্যুত করে এবং শ্রীনাথ দাস তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র করে। দেশে ফেরার কিছুদিন পরে দেবেন্দ্রনাথ পুনরায় বিলেত যাত্রার উদ্যোগ নিলে কৃষ্ণভাবিনী দাসীও স্বামীর সঙ্গে বিলেত যাত্রা করেন। দেবেন্দ্রনাথ কৃষ্ণভাবিনীকে লেখাপড়া শেখান। ইংল্যাণ্ডে যাত্রার আগে কৃষ্ণভাবিনী তাঁর ছ'বছরের কন্যাকে শ্বশুরগৃহে রেখে যান। পরবর্তীকালে ইংল্যাণ্ডে বসে কৃষ্ণভাবিনী সংবাদ পান যে, তাঁর দশ বছরের কন্যার বিয়ে দিতে যাচ্ছেন তাঁর শ্বশুর। তবে কৃষ্ণভাবিনীর এ বিয়েতে মত না থাকলেও ইংল্যাণ্ডে বসে এ বিয়ে বন্ধ করতে তিনি পারেননি। বিদেশে আট বছর বাস করে দেবেন্দ্রনাথ ও কৃষ্ণভাবিনী দাসী কলকাতায় ফিরে এলেন। কুপাত্রের সঙ্গে বিয়ে হওয়ায় তাঁর কন্যার শোচনীয় পরিণতি হয়। তাই কৃষ্ণভাবিনী কন্যাকে বারবার পরামর্শ দিয়েছিলেন দুষ্ট স্বামী ত্যাগ করে সমাজ কল্যাণকর কাজে জীবন উৎসর্গ করতে। কিন্তু সংস্কারাচ্ছন্ন কন্যা মা-র এই পরামর্শ মেনে নিতে পারেননি। যদিও পরবর্তীকালে কৃষ্ণভাবিনীর মেয়ে কৃষ্ণভাবিনীর কাছে ফিরে আসেন। এর পরেই কৃষ্ণভাবিনীর জীবনে নেমে আসে শোকের ছায়া— মাত্র বাইশ দিনের ব্যবধানে তাঁর স্বামী ও কন্যার মৃত্যু হয়। এই ব্যক্তিগত বেদনাকে ভুলে থাকার জন্য তখন থেকে আমৃত্যু তিনি অবরোধবাসিনী মেয়েদের শিক্ষা দেবার কাজে জীবন উৎসর্গ করেন। কেননা কন্যার অকাল মৃত্যু থেকে তিনি বুঝতে পারেন মেয়েদের প্রকৃত শিক্ষা আর তাদের সংস্কারমুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা। তাঁর চেষ্টাতেই ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের তিনটি শাখা খোলা সম্ভব হয় এবং তিনি ছিলেন কলকাতার মণ্ডলের পরিচালিকা। ১৯১৯ সালে কৃষ্ণভাবিনী দাসীর মৃত্যু হয়।

কৃষ্ণভাবিনী দাসী লেখাপড়া শিখে সাহিত্যচর্চাও করেছিলেন। তাঁর বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত রচনাগুলি হল—

প্রবন্ধ— ১. *স্ত্রীলোকের কাজ ও কাজের মাহাত্ম্য* (*ভারতী ও বালক* পত্রিকায় ১২৯৮ বঙ্গাব্দ)

২. *শিক্ষিতা নারী* (*সাহিত্য* পত্রিকায় ১২৯৮ বঙ্গাব্দ)

৩. *অশিক্ষিতা ও দরিদ্রা নারী* (*সাহিত্য* পত্রিকায় ১২৯৮ বঙ্গাব্দ)

৪. *ইংরেজ মহিলার শিক্ষা ও স্বাধীনতার গতি* (*ভারতী ও বালক* পত্রিকায় ১২৯৭ বঙ্গাব্দ)

৫. *কার্য্যমূলক শিক্ষা ও জাতীয় উন্নতি* (*প্রদীপ* পত্রিকায় ১৩০৮ বঙ্গাব্দ)

আত্মকথা: *ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা* (১৮৮৫ খ্রি.)

নিস্তারিণী দেবী:

১৮৩৩ সালে বর্ধমান জেলার খন্যান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন নিস্তারিণী দেবী। তাঁর পিতা হরচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বিয়ে হয়েছিল খানাকুল, কৃষ্ণনগরের কুলীন ব্রাহ্মণ ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তবে বিয়ে হলেও নিস্তারিণী দেবী কোনোদিন শ্বশুরবাড়িতে যেতে পারেননি। কেননা তাঁর স্বামী ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিয়ে করাই ছিল পেশা— তাঁর স্বামীর তিরিশ-চল্লিশটি স্ত্রীর মধ্যে তাঁর নম্বরটি কত, তা তিনি জানতেন না। স্বাভাবিকভাবেই বিয়ের পর মাত্র দু'বার স্বামীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে— মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে তিনি বিধবা হন। ফলে মামার বাড়িতে ও ভাইদের বাড়িতে দাসীবৃত্তি করে আশ্রয় ও খাবার জুটেছে তাঁর। নিতান্ত অনাদর, অবহেলায় কেটেছে তাঁর সারা জীবন— বলতে গেলে সমস্ত জীবনটাই তিনি উদ্বাস্তুর জীবন কাটিয়েছেন। কেননা তিনি যেখানেই যেতেন দু'দিন পরে তাঁকে অন্যত্র চলে যাওয়ার জন্য বলা হতো। এভাবেই কেটে গিয়েছিল তাঁর সারাজীবন। শেষ জীবনে নিস্তারিণী দেবী আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র মন্মথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে— তখন তাঁর চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। সত্যিই মানব-সংসারে নিস্তারিণী দেবীর দুঃখের সীমা ছিল না— তিনি যেন *বল্লালী বালাই* হয়েই সারাজীবন কাটিয়ে দিলেন। ১৯১৬ সালে নিস্তারিণী দেবীর দুঃখময় জীবনের অবসান ঘটে।

নিস্তারিণী দেবী যেসময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেসময় মেয়েদের লেখাপড়া শেখা ছিল নিষিদ্ধ— যদিও উচ্চবিত্ত পরিবারগুলি বাড়িতেই মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিল, কিন্তু নিস্তারিণীর মতো অসহায়া নারীর পক্ষে সেসুযোগ লাভ করা কখনোই সম্ভব ছিল না। ফলে নিস্তারিণী দেবী কোনদিন লেখাপড়া শিখতে পারেননি। তবুও তাঁর একটি আত্মজীবনী *সেকেলে কথা* আমরা পড়ার সুযোগ পেয়েছি। আর এটি সম্ভব হয়েছে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র মন্মথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য। কেননা নিস্তারিণী দেবী যেভাবে তাঁর জীবনের কথা বলে গেছেন, সেভাবেই মন্মথ বন্দ্যোপাধ্যায় তা লিপিবদ্ধ করেছেন এবং *ভারতবর্ষ* পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়েছিল। এভাবেই নিস্তারিণী দেবী আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

কামিনী রায়:

১৮৬৪ সালের ১২ অক্টোবর বর্তমান বাংলাদেশের বাখরগঞ্জের বাসন্ডা গ্রামে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন কামিনী রায়। তাঁর পিতা স্বনামধন্য সাহিত্যিক চণ্ডীচরণ সেন। কামিনী রায়ের চার বছর বয়সে লেখাপড়া আরম্ভ হয়। মাতার কাছেই তিনি *বর্ণপরিচয়* প্রথম ভাগ ও

শিশুশিক্ষা দ্বিতীয় ভাগ শেষ করেন। পিতা চণ্ডীচরণ সেন তাঁকে গণিত খুব ভালোভাবে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। আট বছর বয়স থেকেই কামিনী রায় কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। তাঁর কবিতা রচনায় আগ্রহ দেখে পিতা চণ্ডীচরণ সেন তাঁকে কৃত্তিবাসের *রামায়ণ* ও কাশীরাম দাসের *মহাভারত* কিনে দিয়েছিলেন। পিতা চণ্ডীচরণ সেন কামিনী রায়কে গণিতের পাশাপাশি ইংরাজি, ইতিহাস, ভূগোল সব বিষয়েই শিক্ষা দিয়েছিলেন। ষোল বছর বয়সে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এর দু'বছর পরে তিনি এফ.এ.পরীক্ষা দেন। এর দু'বছর পরে তিনি সংস্কৃত বিষয়ে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন— তিনি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা অনার্স গ্র্যাজুয়েট। অর্থাৎ সেসময়ের প্রেক্ষিতে তিনি যে উচ্চশিক্ষিতা নারী ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ১৮৮৬ সালে তিনি বেথুন ফিমেল স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষিকারূপে যোগদান করে কর্মজীবন শুরু করেন এবং ১৮৯০-৯১ সালে তিনি বেথুন কলেজে অধ্যাপকের পদে উন্নীত হন। ১৮৯৪ সালে ত্রিশ বছর বয়সে বিপত্নীক কেদারনাথ রায়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তবে কিছুদিন পরেই তাঁর আনন্দময় জীবনে শোকের কালো ছায়া নেমে আসে— ১৯০০ সালে তাঁর একটি সন্তানের মৃত্যু হয়; ১৯০৮ সালে তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়; ১৯১৩ সালে কন্যা লীলা ও পুত্র অশোকের মৃত্যু হয়। এভাবে একের পর এক শোকের আঘাতে তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হলেও সেই শোক-দুঃখকে ভুলে থাকার জন্য তিনি নানান ধরনের সামাজিক ও ধর্মসম্পর্কিত কাজে এবং সাহিত্য রচনায় নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিলেন। ১৯৩০ সালে ভবানীপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে সাহিত্য শাখার সভানেত্রী হয়েছিলেন কামিনী রায় এবং ১৯৩২-৩৩ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাঁকে সহকারী সভাপতি পদে নির্বাচন করেছিল। ১৯৩৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর কামিনী রায়ের মৃত্যু হয়।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কামিনী রায় একটি স্মরণীয় নাম— শুধুমাত্র মহিলা সাহিত্যিক হিসেবে নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যেই তাঁর নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা আছে। এ প্রসঙ্গে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখেছেন—

> '' বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্যে কামিনী রায়ের স্থান অতি উচ্চে অবস্থিত। তিনি যে শুধু মহিলা কবিদেরই শীর্ষস্থানীয়া তাহা নহেন, বাঙ্গালা সাহিত্যেও তিনি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন।"[৫]

তিনি অল্পবয়স থেকেই কবিতা লিখতে শুরু করেন এবং তাঁর নীতিবাদী কবিতা ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তিনি খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত তাঁর রচনাগুলি

হল—

কাব্যগ্রন্থ:

১. *আলো ও ছায়া* (১৮৮৯খ্রি.)— প্রথম প্রকাশিত কাব্য।

২. *নির্মাল্য* (১৮৯১ খ্রি.)

৩. *পৌরাণিকী* (১৮৯৭খ্রি.)

৪. *গুঞ্জন* (১৯০৪ খ্রি.)

৫. *মাল্য ও নির্মাল্য* (১৯১৩ খ্রি.)

৬. *অশোক-সঙ্গীত* (১৯১৪খ্রি.)—পুত্র অশোকের মৃত্যুতে লেখা।

৭. *দীপ ও ধূপ* (১৯২৯খ্রি.)

৮. *জীবনপথে* (১৯৩০খ্রি.)

জীবনীগ্রন্থ: *অশোক-স্মৃতি* (১৯১৩খ্রি.)

নাট্যকাব্য: *অম্বা* (১৯১৫খ্রি.)

গদ্য নাটিকা: *সিতিমা* (১৯১৬খ্রি.)

আত্মকথামূলক জীবনীগ্রন্থ: *শ্রাদ্ধিকী* (১৯১৩খ্রি.)

অনুবাদ গল্প: *ধর্মপুত্র* (১৯০৭খ্রি.)

প্রবন্ধ: *বালিকা শিক্ষার আদর্শ— অতীত ও বর্তমান* (১৯১৮খ্রি.)

সুদক্ষিণা সেন:

১৮৫৯ সালে বর্তমান বাংলাদেশের বিক্রমপুরের সোহাগদল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন সুদক্ষিণা সেন। তাঁর পিতা জগদ্বন্ধু মুখোপাধ্যায় ও মাতা নিত্যকালী। তাঁর পৈতৃক নিবাস মাইজপাড়া হলেও তিনি মাতুলালয়েই বাস করতেন। অল্প বয়সে তাঁর পিতার মৃত্যু হলে তাঁর মাতা দেওরদের দ্বারা ছেলে-মেয়েদের অল্পবয়সে বিয়ে দেওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ছেলে-মেয়ে সকলকে নিয়ে গোপনে সোহাগদল ত্যাগ করে ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সুদক্ষিণা সেন সেখানে কেশবচন্দ্র সেনের নারী বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছেন, আবার মাতা নিত্যকালী খরচ কমানোর জন্য কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় চলে গেলে সেখানকার *এডাল্ট ফিমেল স্কুলে* সুদক্ষিণা সেন লেখাপড়া শিখেছেন। তাঁর বিয়ে হয় অম্বিকাচরণ সেনের সঙ্গে— তাঁদের একমাত্র কন্যা সরযু। ১৯৩৪ সালে সুদক্ষিণা সেনের মৃত্যু হয়।

সুদক্ষিণা সেন পারিবারিক কাজের সঙ্গে সঙ্গে নিজের জীবন-কথাও লিখেছেন। তাঁর আত্মজীবনীটির নাম হল— *জীবন স্মৃতি*। এটি ১৯৩২ সালে প্রকাশিত হয়।

শরৎকুমারী দেব:

১৮৬২ সালে কলকাতার বাগবাজারে শরৎকুমারী দেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হলেন কালীনাথ বসু। কোন্নগরের শিবচন্দ্র দেবের পুত্র সত্যপ্রিয়ের সঙ্গে পনেরো বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়। তিনি পিতৃগৃহে ইংরেজি ও বাংলা শিখেছিলেন পণ্ডিত ও মেমসাহেবের কাছে। তিনি *ভারত-আশ্রম* বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। তবে তিনি আসল শিক্ষা লাভ করেছিলেন শ্বশুরবাড়িতে স্বামীর সাহচর্যে। তাঁর শ্বশুরবাড়িতে প্রকাণ্ড লাইব্রেরী ছিল সেখানে তিনি পড়াশোনা করতেন। তাঁর বাপের বাড়ি এবং শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ব্রাহ্ম ছিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা সুনীতি দেবীর কোচবিহারের রাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের সঙ্গে হিন্দুমতে বিয়ে উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়ে ব্রাহ্মসমাজ— নববিধান ও সাধারণ নামে দুটি সমাজে ভাগ হয়ে যায়। এরপর শরৎকুমারী দেবের পিতা কালীনাথ বসু কেশবচন্দ্র সেনের নববিধান ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন এবং শরৎকুমারীর স্বামী ও শ্বশুর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। স্বভাবিকভাবে স্বামী ও পিতার মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত ব্রাহ্মসমাজের মতাদর্শ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হলে তিনি খুব মর্মাহত হতেন। ১৯৪১ সালে শরৎকুমারী দেবের মৃত্যু হয়।

শরৎকুমারী দেবের তিন ছেলে-মেয়ে। শেষ জীবনে তিনি সকলের অনুরোধে স্মৃতিকথামূলক আত্মকাহিনি *আমার সংসার* রচনা করেন। বইটি তাঁর মৃত্যুর পরে ১৯৪১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। এতে তাঁর নিজের পরিবার জীবনের কাহিনির পাশাপাশি দ্বিধাবিভক্ত ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসও উঠে এসেছে।

ইন্দিরা দেবী:

১৮৬৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন ইন্দিরা দেবী। তিনি ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাধানাথ ঠাকুরের পৌত্র শ্রীনাথ ঠাকুর ও হেমাঙ্গিনী দেবীর কন্যা। শৈশবে ইন্দিরা দেবী বাড়িতে পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে লেখাপড়া শিখেছিলেন। শিক্ষার ব্যাপারে পিতা শ্রীনাথ ঠাকুর তাঁকে যথেষ্টই উৎসাহ দিতেন এবং কখনো তিনি মেয়ের সঙ্গে কবিতা নিয়ে আলোচনা করতেন, আবার কখনো মেয়েকে কবিতা রচনায় উৎসাহ দিতেন। এভাবে ইন্দিরা দেবীর মানসিক গঠনে পিতা শ্রীনাথ ঠাকুর অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করেছেন। তেরো বছর বয়সে ইন্দিরা দেবীর বিয়ে হয় ব্রাহ্ম প্রিয়নাথ

শাস্ত্রীর সঙ্গে। তাঁদের ন'টি সন্তান হয়েছিল। ১৯৩৯ সালে ইন্দিরা দেবীর মৃত্যু হয়।

শৈশবে লেখাপড়ার পাশাপাশি সাহিত্যচর্চাতেও তিনি মনোযোগী হয়েছিলেন। ফলস্বরূপ তিনি লিখেছিলেন স্মৃতিকথা *আমার খাতা* গ্রন্থটি। এটি ১৯১২ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়া তিনি লিখেছিলেন জীবনীগ্রন্থ *মহাত্মা প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবন চরিত*— এটি ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।

মানকুমারী বসু:

১৮৬৩ সালের ২৩ জানুয়ারি বর্তমান বাংলাদেশের যশোহর জেলার শ্রীধরপুর গ্রামে মাতুলালয়ে মধুসূদন দত্তের জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্রী মানকুমারী বসুর জন্ম হয়। তাঁর নামকরণ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন যে, শৈশবে তাঁকে *অভিমানিনী* মনে করেই তাঁর নামকরণ করা হয়েছিল মানকুমারী। পিতা আনন্দমোহন দত্ত চৌধুরীর বিশেষ প্রভাব রয়েছে তাঁর জীবনে। তিনি শৈশবে পিতৃগৃহেই লেখাপড়া শুরু করেছিলেন। পিতৃগৃহে বাবা, বৌদি, দিদির কাছে পড়াশোনা করতেন তিনি। পিতা আনন্দমোহন দত্ত চৌধুরী তাঁকে উপকথারূপে *রামায়ণ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ* প্রভৃতি শিক্ষা দিতেন। তাঁর পিতার মতো দাদাও স্ত্রীশিক্ষার অনুরাগী ছিলেন। তাঁর দাদা মাতুলালয়স্থ এনট্রান্স স্কুলের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন। তিনি সেখান থেকেই তাঁর স্ত্রীর লেখাপড়ার তত্ত্বাবধান করতেন। অর্থাৎ মানকুমারী বসুর বাড়িতেই স্ত্রীশিক্ষার অনুকূল পরিবেশ ছিল। আট বছর বয়সে তিনি *চারুপাঠ, বস্তুবিচার, শিশুবোধ ব্যাকরণ* প্রভৃতি পাঠ্যগ্রন্থ মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। ১৮৭৩ সালে মাত্র দশ বছর বয়সে বিবুধশঙ্কর বসুর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। পিতৃগৃহে বৈঠকখানায় একজন পণ্ডিত মানকুমারী বসুকে নিয়মিত পড়াতে আসতেন। বিয়ের পরও এগারো বছর বয়স পর্যন্ত তিনি সেই পণ্ডিতের কাছে নিয়মিত পড়াশোনা করতেন। তাঁর বারো বছর বয়সে সেই পণ্ডিত অন্যত্র চলে গেলে তিনি ঘরে বসেই লেখাপড়া করতেন। তাঁর শ্বশুর রাসবিহারী বসুও স্ত্রীশিক্ষার অনুরাগী ছিলেন বলে সেখানেও তিনি লেখাপড়া করবার পরিবেশ পেয়েছিলেন। মানকুমারী বসু এবং বিবুধশঙ্কর বসুর একমাত্র কন্যা প্রিয়বালা। মানকুমারী বসু মাত্র উনিশ বছর বয়সে বিধবা হন। তারপর তিনি একমাত্র কন্যাকে নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেই কন্যারও মৃত্যু হলে শেষজীবনে তিনি মর্মান্তিক মানসিক আঘাত পেয়েছিলেন। ১৯৪৩ সালের ২৬ ডিসেম্বর মানকুমারী বসুর মৃত্যু হয়।

বাংলা সাহিত্যে মহিলা কবিদের মধ্যে মানকুমারী বসুর নাম সর্বজন পরিচিত। ছোটবেলা থেকেই কবিতা রচনার প্রতি তাঁর উৎসাহ ছিল। তাঁর সধবা ভ্রাতৃজায়া *বামাবোধিনী* পত্রিকা রাখতেন

এবং এতে মহিলাদের রচনা প্রকাশিত হত দেখে মানকুমারী বসুরও কবিতা লিখতে ইচ্ছে করত। তাঁর পিতাও কবিতা রচনার ব্যাপারে তাঁকে উৎসাহ দিতেন এবং বিয়ের পর স্বামীর ইচ্ছায় তিনি কবিতা লিখেছিলেন *পুরন্দরের প্রতি ইন্দুবালা*—এটি *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এটিই ছিল তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা। এরপর তিনি কাব্য, ছোটগল্প, প্রবন্ধগ্রন্থ, উপন্যাস, আত্মজীবনী প্রভৃতি রচনা করেছিলেন। ১৯৩৭ সালে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের কাব্যশাখার সভানেত্রী হয়েছিলেন। তাঁর সাহিত্যকর্মের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ১৯৩৯ সালে *ভুবনমোহিনী* সুবর্ণ পদক এবং ১৯৪১ সালে *জগত্তারিণী* সুবর্ণ পদক দিয়ে সম্মানিত করেছিল। বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত তাঁর রচনাগুলি হল—

কাব্যগ্রন্থ: ১. *কাব্যকুসুমাঞ্জলি* (১৮৯৩ খ্রি.)

২. *কনকাঞ্জলি* (১৮৯৬ খ্রি.)

৩. *বীরকুমারবধ কাব্য* (১৯০৪খ্রি.)

প্রবন্ধগ্রন্থ: ১. *বাঙ্গালী রমণীদিগের গৃহধর্ম* (১৮৯০খ্রি.)

২. *দুইটি প্রবন্ধ* (১৮৯১খ্রি.)

উপন্যাস: *বনবাসিনী* (১৮৮৮খ্রি.)

ছোটগল্প: ১. *রাজলক্ষ্মী*, ২. *অদৃষ্ট চক্র*, ৩. *শোভা*

গদ্য-পদ্য রচনা: ১. *প্রিয়-প্রসঙ্গ* (১৮৮৪খ্রি.)

২. *শুভসাধনা* (১৯১১খ্রি.)

আখ্যায়িকা : *পুরাতন ছবি* (১৯৩৬খ্রি.)

আত্মজীবনী: *আমার অতীত জীবন* — এটি ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায় *উত্তরা* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

লীলাবতী মিত্র:

১৮৬৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন লীলাবতী মিত্র। তাঁর পিতা ছিলেন স্বনামধন্য রাজনারায়ণ বসু। রাজনারায়ণ বসু ছিলেন আদি ব্রাহ্মসমাজের সদস্য। লীলাবতী মিত্র সতেরো বছর বয়সে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সদস্য কৃষ্ণকুমার মিত্রকে বিয়ে করলে রাজনারায়ণ বসু প্রথমে এই বিয়েতে রাজি হননি। কেননা কেশবচন্দ্র সেনের মেয়ে সুনীতি দেবীর বিয়েকে উপলক্ষ করে ব্রাহ্মসমাজ নববিধান এবং সাধারণ— এই দুটি ভাগে ভাগ হয়ে গেলে দুই ব্রাহ্মসমাজের সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধ

দেখা দেয়। তাই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সদস্য হওয়ায় কৃষ্ণকুমার মিত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চাননি রাজনারায়ণ বসু। কিন্তু কৃষ্ণকুমার ও লীলাবতী মিত্র তিন আইন মতে বিয়ে করে নেন। তাঁদের তিন পুত্র-কন্যা। লীলাবতীর স্বামী কৃষ্ণকুমার ছিলেন নারী-হিতৈষী, স্বদেশপ্রেমিক, *সঞ্জীবনী* পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি লীলাবতীকে সমাজসেবামূলক মহৎ কাজকর্ম করবার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। ফলত লীলাবতী সমাজসেবার কাজে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। মেয়েদের শিক্ষিত ও সৎপাত্রে দান করার দায়িত্ব তিনি নিয়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বালবিধবা নারীদের লীলাবতীর কাছে পাঠিয়েছিলেন। লীলাবতী তাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন, শিক্ষিত করেছিলেন, স্বাবলম্বী করে সৎপাত্রের সঙ্গে তাদের বিয়ে দিয়েছিলেন। এভাবে বহু অসহায় নারীদের জীবন বদলে দিয়েছিলেন তিনি। ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অগাধ বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা ছিল তাঁর। একসময় তিনি ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করবার জন্য পায়ে হেঁটে পূর্ববঙ্গে গিয়েছিলেন। ১৯২৪ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

আজীবন শিক্ষানুরাগিনী লীলাবতী মিত্র প্রতিদিন দিনপঞ্জী লিখতেন। পরবর্তীকালে তিনি এই দিনপঞ্জীর সাহায্যে তাঁর স্মৃতিকথামূলক রচনা *জীবনকথা* সম্পূর্ণ করেন। এটি তাঁর মৃত্যুর পরে ১৯২৪ সালের শেষ দিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

আমোদিনী দাশগুপ্ত.:

১৮৭৩ সালে বর্তমান বাংলাদেশের খুলনা জেলার উজিরপুর গ্রামে মাতুলালয়ে আমোদিনী দাশগুপ্তর জন্ম হয়েছিল। তবে তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল খুলনা জেলার সেনহাটি গ্রামে। আমোদিনী দাশগুপ্তর যখন এগারো বছর বয়স তখন তাঁর মা টাকার লোভে বাখরগঞ্জ জেলার গৈলা গ্রামের তেতাল্লিশ বছরের বিপত্নীক চন্দ্রকুমার কবিভূষণের সঙ্গে চতুর্থ পক্ষে তাঁর বিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর জীবনের কাহিনি নিয়ে *আমার জীবন-কাহিনি* নামে একটি স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এটি নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত *এক্ষণ* পত্রিকায় ১৩৯৭ বঙ্গাব্দের শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৩৯ সালে আমোদিনী দাশগুপ্ত পরলোক গমন করেন।

মনোদা দেবী দাশগুপ্তা:

১৮৭৮ সালে বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা জেলার বিক্রমপুর গরগণার সোনারঙ গ্রামে মনোদা দেবী দাশগুপ্তার জন্ম হয়। তাঁর পিতা শ্রী কৈলাসচন্দ্র সেন এবং মাতা নবশশী দেবী। দশ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয় বিক্রমপুর পরগণার বিদ্‌গ্রামের বগলামোহন দাশগুপ্তের সঙ্গে। তাঁদের চারজন সন্তান। তাঁর বড় মেয়ে আশালতা লেখিকা, সমাজসেবিকা, স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। মনোদা দেবী দাশগুপ্তা

মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে দিক্ষিতা ছিলেন এবং সারাজীবন হরিজন-উন্নয়ন ও চরকার কাজ করেছিলেন। তিনি *জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী* নামে একটি স্মৃতিকথা রচনা করেছিলেন। এটি সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলির উৎসাহে ১৩৬১ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন থেকে ১৩৬২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র পর্যন্ত মাসিক *বসুমতী* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৬৩ সালে মনোদা দেবী দাশগুপ্তার মৃত্যু হয়।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী:

১৮৫০ সালে বর্তমান বাংলাদেশের যশোহর জেলার দক্ষিণডিহি গ্রামে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন অভয়াচরণ রায়। মাত্র আট বছর বয়সে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ান অফিসার— তাঁর স্ত্রী হিসেবে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী স্বামীর সঙ্গে বহু জায়গায় ভ্রমণ করেছিলেন। ফলে বৃহত্তর জগতের সঙ্গে মেলামেশা করবার জন্য জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর দৃষ্টিভঙ্গি হয়েছিল উদার। তিনি বাংলার নারীজাগরণের অন্যতম নেত্রী হয়েছিলেন। তিনি তাঁর আচার-আচরণে নারীদের অবস্থান যে পুরুষের সমান হওয়া উচিত, তা দেখাতে চেয়েছিলেন। তাঁর পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ও কন্যা ইন্দিরা দেবী রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। ১৯৪১ সালে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী পরলোক গমন করেন।

অভিনয়, সাহিত্য, সংগীত সব বিষয়েই জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর প্রবল উৎসাহ ছিল। তিনি ১৮৮৫ সালে ছোটদের জন্য *বালক* পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। অবসর সময়ে তিনি নিজেও সাহিত্য রচনা করতেন। তাঁর বিভিন্ন সময়ে লেখা রচনাগুলি হল—

নাটিকা: ১. *সাত ভাই চম্পা*

২. *টাক ডুমাডুম*

— এই দুটি ছোটদের জন্য লেখা।

প্রবন্ধ: ১. *ইংরাজ নিন্দা ও দেশানুরাগ*

২. *স্ত্রীশিক্ষা*

৩. *কিন্টার গার্ডেন*

গল্প: *আশ্চর্য্য পলায়ন*— এটি ছোটদের জন্য দীর্ঘ আয়তনের একটি গল্প।

স্মৃতিকথা: *পুরাতনী*— এটি বৃদ্ধ বয়সে তিনি মুখে মুখে বলেছেন এবং তাঁর কন্যা ইন্দিরা তা অনুলিখন করেছেন।

স্বর্ণকুমারী দেবী :

১৮৫৫ সালে কলকাতায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন স্বর্ণকুমারী দেবী। তিনি ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বারো-তেরো বছর বয়সে ১৮৬৭ সালে ১৭নভেম্বর জানকীনাথ ঘোষালের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁর দুই কন্যা হিরণ্ময়ী দেবী ও সরল দেবী বাংলা সাহিত্যে পরিচিত নাম। বাংলাদেশের নারী শিক্ষা ও প্রগতিমূলক যেকোনো বিষয়ে তিনি উৎসাহী ছিলেন। মেয়েদের সার্বিক উন্নতির জন্য তিনি কলকাতায় *সখী সমিতি* প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩২ সালে স্বর্ণকুমারী দেবীর মৃত্যু হয়।

স্বর্ণকুমারী দেবী বাইরের কোনো বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেননি, খড়দহের বৈষ্ণবী, ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন শিক্ষকের কাছ থেকে তিনি কিছু লেখাপড়া শিখেছিলেন। এছাড়া তিনি মধ্যম ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে কিছু লেখাপড়া শিখেছিলেন এবং স্বামীর কাছেও কিছু বিদ্যার্জন করেছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবী শৈশবে ছড়া বেঁধে কবিতার ছন্দে কথা বলতেন। এভাবেই তাঁর সাহিত্য রচনার সূত্রপাত। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

> ''স্বর্ণকুমারীর সবচেয়ে বড়ো পরিচয়— তাঁর সাহিত্যপ্রতিভা। সেকালে কোনো মহিলাই গদ্য-পদ্য-নাটক ও উপন্যাস-ছোটগল্পে এত অদ্ভুত দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেননি।''[৬]

তিনি *ভারতী* পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে *জগত্তারিণী* সুবর্ণ পদক প্রদান করে তাঁর সাহিত্যপ্রতিভাকে সম্মানিত করেছিল। তবে তিনি প্রায় সব ধরনের সাহিত্য রচনা করলেও উপন্যাস রচনাতেই তাঁর প্রতিভা অনেক বেশি ব্যাপক ও গভীর। তাঁর বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত রচনাগুলি হল—

কাব্য : ১. *গাথা* (১৮৮০ খ্রি.) — প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ।

২. *কবিতা ও গান* (১৮৯৫খ্রি.)

গীতিনাট্য: ১. *বসন্ত-উৎসব* (১৮৮০ খ্রি.)

২. *বিবাহ-উৎসব* (১৮৯২খ্রি.)

কাব্যনাট্য: ১. *দেবকৌতুক* (১৯০৬ খ্রি.)

২. *যুগান্ত* (১৯১৮খ্রি.)

নাটক: ১. *নিবেদিতা*

২. *দিব্যকমল*

প্রহসন: ১. *কনেবদল* (১৯০৬খ্রি.)

২. *পাকচক্র* (১৯১১খ্রি.)

প্রবন্ধগ্রন্থ: *পৃথিবী* (১৮৮২ খ্রি)— এটি বাংলা সাহিত্যে প্রথম মহিলা রচিত বিজ্ঞান গ্রন্থ।

পত্র সংগ্রহ: *গাজীপুর* (১২৯৬ বঙ্গাব্দ)

উপন্যাস: ১. *দীপনির্বাণ* (১৮৭৬ খ্রি.)- প্রথম উপন্যাস।

২. *ছিন্নমুকুল* (১৮৭৯ খ্রি.)

৩. *মালতী* (১৮৮০খ্রি.)

৪. *মিবাররাজ* (১৮৮৭ খ্রি.)— ঐতিহাসিক রোমান্স।

৫. *হুগলীর ইমামবাড়ী* (১৮৮৮ খ্রি.)

৬. *বিদ্রোহ* (১৮৯০ খ্রি.)

৭. *স্নেহলতা* (১৮৯০ খ্রি.)

৮. *ফুলের মালা* (১৮৯৫খ্রি.)

৯. *কাহাকে?* (১৮৯৮ খ্রি.)

১০. *বিচিত্রা* (১৯২০খ্রি.)

১১. *স্বপ্নবাণী* (১৯২১ খ্রি.)

১২. *মিলনরাত্রি* (১৯২৫ খ্রি.)

গল্পগ্রন্থ: ১. *গল্পস্বল্প* (১৮৮৯ খ্রি.)

২. *নবকাহিনী* (১৮৯২ খ্রি.)

শিশুপাঠ্য গ্রন্থ: ১. *সচিত্র বর্ণবোধ* (১৯০২ খ্রি.)

২. *বাল্যবিনোদ* (১৯০২ খ্রি.)

৩. *আদর্শ-নীতি* (১৯০৪ খ্রি.)

৪. *প্রথম পাঠ্য ব্যাকরণ* (১৯১০খ্রি.)

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী:

১৮৫৮ সালে কলকাতার ভবানীপুরে মাতুলালয়ে গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হারাণচন্দ্র মিত্রের আদি নিবাস কলকাতার চারক্রোশ উত্তরে গঙ্গাতীরবর্তী পাণিহাটি

গ্রামে। তিনি বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে কিছু পড়াশোনা করেছিলেন। শৈশব থেকেই শিক্ষার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। খেলাধূলা অপেক্ষা গ্রন্থপাঠ তাঁর কাছে অধিক প্রিয় ছিল। মেধা ও বুদ্ধির জন্য বালিকা বয়সে বিদ্যালয় থেকে তিনি রৌপ্যপদক পেয়েছিলেন। বালিকা বয়সেই তিনি এক শিক্ষকের কাছ থেকে ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা লাভ করেছিলেন। পিতার কাছ থেকে বিজ্ঞান বিষয়ে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। দশ বছর বয়সে নরেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গে গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর বিয়ে হয়। বিয়ের পর তিনি শ্বশুরালয়ে কিছুদিন ইংরাজি শিখেছিলেন। তাঁর স্বামী নরেশচন্দ্রের শরীর কখনো ভালো ছিল না। তাই স্বাস্থ্যের কারণে স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁকেও অধিকাংশ সময় প্রবাসেই কাটাতে হয়েছিল। ১৯২৪ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

ছোট থেকেই কবিতার প্রতি অনুরাগ ছিল গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর। তাঁর পিতার উৎসাহে এবং বিভিন্নভাবে তাঁর কাব্য প্রতিভার বিকাশ ঘটে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি কবি হিসেবে পরিচিত হলেও পরিণত বয়সে চিত্র-শিল্পেও তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এছাড়া ১৩১৪ বঙ্গাব্দে তিনি *জাহ্নবী* পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত রচনাগুলি হল—

কাব্যগ্রন্থ: ১. *কবিতাহার* (১৮৭৩ খ্রি.) — প্রথম প্রকাশিত কাব্য।

২. *ভারত-কুসুম* (১৮৮২ খ্রি.)

৩. *অশ্রুকণা* (১৮৮৭ খ্রি.)

৪. *আভাষ* (১৮৯০খ্রি.)

৫. *শিখা* (১৮৯৬খ্রি.)

৬. *অর্ঘ্য* (১৯০২খ্রি.)

৭. *স্বদেশিনী* (১৯০৬খ্রি.)

৮. *সিন্ধুগাথা* (১৯০৭খ্রি.)

নাট্যকাব্য: *সন্ন্যাসিনী বা মীরাবাঈ* (১৮৯২খ্রি.)

প্রবন্ধ: *জনৈক হিন্দু মহিলার পত্রাবলী* (১৮৭২খ্রি.)

কৃষ্ণকামিনী দাসী:

কৃষ্ণাকামিনী দাসীর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য আমরা এখনো জানতে পারিনি। তবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন তাঁর *চিত্তবিলাসিনী* গ্রন্থের

জন্য। এটি ১৮৫৬ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। এটিকে বলা যায় চম্পূকাব্য, কেননা এটি গদ্যে ও পদ্যে রচিত। এই গ্রন্থটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব হল এটি বঙ্গমহিলা রচিত সর্বপ্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। এই গ্রন্থের আরেকটি গুরুত্ব হল এই গ্রন্থে কৃষ্ণকামিনী দাসী সেই সময়ে দাঁড়িয়ে কৌলীন্যপ্রথার সমালোচনা করেছিলেন এবং বিধবা বিবাহের সমর্থন করেছিলেন।

প্রিয়ম্বদা দেবী:

১৮৭১ সালে বর্তমান বাংলাদেশের পাবনা জেলার গুণাইগাছা গ্রামে প্রিয়ম্বদা দেবী জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কৃষ্ণকুমার বাগচী ও মাতা কবি প্রসন্নময়ী দেবী। বালিকা বয়সে প্রিয়ম্বদা দেবী কৃষ্ণনগর বালিকা বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন এবং এখান থেকে তিনি শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বৃত্তিলাভ করেন। দশ বছর বয়সে ১৮৮২ সালে তিনি বেথুন স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৮৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি বৃত্তিলাভ করেন। তিনি ১৮৯০ সালে এফ.এ. এবং ১৮৯২ সালে বি.এ. পাশ করে সংস্কৃত বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতার জন্য রৌপ্যপদক পুরস্কার পান। অর্থাৎ তিনি ছিলেন উচ্চশিক্ষিতা নারী। ১৮৯২ সালে তাঁর বিয়ে হয় মধ্যপ্রদেশের বিখ্যাত আইনজীবী তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। বিয়ের পর তিনি স্বামীর সঙ্গে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত রায়পুরে গমন করেন। ১৮৯৪ সালে তাঁর একমাত্র পুত্র তারাকুমারের জন্ম হয়। তাঁর দাম্পত্য জীবন সুখের হলেও— তা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। কেননা ১৮৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁর স্বামী তারাদাসের মৃত্যু হয়। আবার বিধবা নারীর একমাত্র অবলম্বন প্রিয় পুত্রটিকেও তিনি অকালে হারান। এরপর স্বাভাবিকভাবেই তাঁর জীবন বিষাদময় হয়ে ওঠে। তবে জীবনের এই দুঃখ-বিষাদের করালগ্রাসে তিনি হারিয়ে যাননি, নতুন করে জীবন শুরু করেছেন নানারকম সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে নিজের জীবন উৎসর্গ করে। ১৯১৫ সালে তিনি ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে অবৈতনিকভাবে শিক্ষাদান শুরু করেন এবং বহুদিন সেখানে শিক্ষাদানের পর শারীরিক অসুস্থতার কারণে অবসর গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে শরীর সুস্থ হলে সরলা দেবী প্রতিষ্ঠিত *ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল*-এর কার্যভার গ্রহণ করেন তিনি। কিছুদিন এই দায়িত্ব দক্ষতার সঙ্গে পালন করেন তিনি এবং সরলা দেবী পাঞ্জাব থেকে ফিরে এলে তাঁকে সে দায়িত্ব ফিরিয়ে দেন। এরপর তিনি *হিরণ্ময়ী বিধবা আশ্রম*-এর সম্পাদিকা রূপে এর উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। ১৯৩৫ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রিয়ম্বদা দেবীর নাম বাংলা সাহিত্যে পরিচিত নাম, বিশেষত মহিলা কবি হিসেবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর বিভিন্ন সময়ে লেখা কাব্যগুলি হল—

১. *রেণু* (১৯০০ খ্রি.)— প্রথম প্রকাশিত কবিতা সংকলন গ্রন্থ।

২. *পত্রলেখা* (১৯১১খ্রি.)

৩. *অংশু* (১৯২৭খ্রি.)

৪. *চম্পা ও পাটল* (১৯৩৯ খ্রি.)-এটি তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত।

হিরণ্ময়ী দেবী:

১৮৭০ সালে হিরণ্ময়ী দেবী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জানকীনাথ ঘোষাল ও মাতা লেখিকা স্বর্ণকুমারী দেবী। তিনি ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্রী এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর মামা ছিলেন। তিনি কলকাতা বেথুন কলেজে পড়াশোনা করেছিলেন। পনেরো বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁর অনেকগুলি সন্তান হলেও অধিকাংশ সন্তানই অকালে মারা যায়। স্বর্ণকুমারী দেবী প্রতিষ্ঠিত *সখী সমিতি*— যার উদ্দেশ্য ছিল স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, সেই সমিতির কর্মকর্ত্রীরূপে হিরণ্ময়ী দেবীই সকল কাজ পরিচালনা করতেন; এমনকি তিনি কয়েকজন বালিকাকে নিজের বাড়িতে স্থান দিয়ে তাদের ভরণ-পোষণ ও শিক্ষার সকল দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে *সখী-সমিতি* অস্তিত্বের সংকটে পড়লে হিরণ্ময়ী দেবী নিজের সঞ্চিত অর্থ দিয়ে একটি বিধবা আশ্রম খুলে সেই সমিতিকে পুনর্জীবিত করেন। এই বিধবা আশ্রমটি স্থায়ী করার জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন এবং এতে তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ হলেও তিনি পিছপা হননি— এমনই ছিল তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠা। তাঁর বিধবা আশ্রম থেকে অনেকেই শিক্ষা লাভ করে পরবর্তীকালে স্কুল শিক্ষিকার কাজ করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এছাড়া অনেক আত্মীয়-স্বজনকেও তিনি প্রতিপালন করেছিলেন। ১৯২৫ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

হিরণ্ময়ী দেবী এক সময়ে *ভারতী* পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর অনেকগুলি সন্তান অকালে মারা যাওয়ায় তিনি গভীরভাবে শোকাহত হন। ফলে ধারাবাহিকভাবে সাহিত্যচর্চার সুযোগ পাননি তিনি। তবে বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত তাঁর কবিতাগুলি হল—

১. *নূতন জীবন*

২. *আগমনী* (*ভারতী ও বালক* পত্রিকা, আশ্বিন ১২৯৩)

৩. *সংসার* (*ভারতী ও বালক* পত্রিকা, আশ্বিন ১২৯৩)

৪. *প্রেমফোঁটা* (*ভারতী ও বালক* পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১২৯৩)

৫. *শ্রীপঞ্চমী* (*ভারতী ও বালক* পত্রিকা, মাঘ ১২৯৩)

৬. *কিরণের মৃত্যু* (*ভারতী ও বালক* পত্রিকা, মাঘ ১২৯৩)

৭. *ভাইফোঁটা* (*ভারতী* পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১৩০৪)

৮. *এ নহে বিদায়* (*ভারতী* পত্রিকা, চৈত্র ১৩০৪)

৯. *কবি* (*ভারতী* পত্রিকা, বৈশাখ ১৩০৪)

১০. *গতবর্ষ* (*ভারতী* পত্রিকা, বৈশাখ ১৩১৭)

১১. *শারদগীতি* (*ভারতী* পত্রিকা, আশ্বিন ১৩১৭)

হেমাঙ্গিনী দেবী:

হেমাঙ্গিনী দেবীর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কোন তথ্য আমরা জানতে পারিনি। তবে বাংলা সাহিত্যে যে দুটি গ্রন্থের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন সে দুটি গ্রন্থ হল— ১. *মনোরমা* (১৮৭৪খ্রি) এবং ২. *প্রণয় প্রতিমা* (১৮৭৭ খ্রি.)। এই দুটি গ্রন্থ হল উপন্যাস। মহিলা রচিত উপন্যাস হিসেবে এই গ্রন্থদুটির গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকার করতে হয়।

হেমলতা সরকার:

১৮৬৮ সালে চব্বিশ পরগণার মজিলপুরে হেমলতা সরকার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শিবনাথ শাস্ত্রী এবং মাতা প্রসন্নময়ী দেবী। তিনি কলকাতা বেথুন কলেজে লেখাপড়া করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন আশৈশব শিক্ষানুরাগিণী। ১৮৯৩ সালে পঁচিশ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয় চিকিৎসক বিপিনবিহারী সরকারের সঙ্গে। বিয়ের কয়েক বছর পর বিপিনবিহারী সরকার স্ত্রী হেমলতা সরকারকে নিয়ে নেপালের বীর হাসপাতালে চাকরি নিয়ে চলে যান। ১৯১৮ সালে বিপিনবিহারীর মৃত্যু হলে হেমলতা সরকার একা দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে পাঁচটি সন্তানকে উচ্চশিক্ষিত করে তোলেন। ১৯০৮ সালে হেমলতা সরকার দার্জিলিং শহরে সাধারণ মধ্যবিত্ত মেয়েদের শিক্ষার জন্য মহারাণী গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি ছিলেন এই বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা। তিনি দার্জিলিঙের মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম মহিলা কমিশনার হয়েছিলেন। তিনি দার্জিলিঙের ব্রাহ্মসমাজকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন এবং ব্রাহ্মদের উপাসনার জন্য ব্রাহ্মমন্দির তৈরি করেছিলেন। ১৯৪৩ সালে হেমলতা সরকারের জীবনাবসান হয়।

সাংসারিক, পারিবারিক, সামাজিক কাজকর্মের পাশাপাশি হেমলতা সরকার সাহিত্য সাধনা করে গেছেন নিজের মতো করে। তাঁর বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল—

জীবনীগ্রন্থ : *পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবন চরিত* (১৯২৯ খ্রি.)

প্রবন্ধগ্রন্থ: ১. *ভারতবর্ষের ইতিহাস* (১৮৯৮ খ্রি.)

২. *নেপালে বঙ্গনারী* (১৯১২ খ্রি.)

৩. *তিব্বতে তিন বৎসর* (এটি ১৩২৩ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩২৫ বঙ্গাব্দের মধ্যে *প্রবাসী* পত্রিকায় বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

সরলাদেবী চৌধুরাণী :

১৮৭২ সালে কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন সরলাদেবী চৌধুরাণী। তাঁর পিতা জানকীনাথ ঘোষাল এবং মাতা সুলেখিকা স্বর্ণকুমারী দেবী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন সরলাদেবী চৌধুরাণীর মামা। সরলাদেবী চৌধুরাণী ছিলেন স্বাধীনচেতা নারী। সরলাদেবী চৌধুরাণী কলকাতার বেথুন কলেজে পড়াশোনা করেছিলেন। তিনি ১৮৮৬ সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ১৮৯০ সালে বেথুন কলেজ থেকে ইংরেজি অনার্স সহ বি.এ. পাস করে *পদ্মাবতী* স্বর্ণপদক পান। তিনি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের মধ্যে সর্বপ্রথম গ্র্যাজুয়েট হন। কবি কামিনী রায়কে তিনি সহপাঠিনী হিসেবে পেয়েছিলেন। কলেজের পড়াশোনা শেষ করে তিনি কিছুদিন ফারসি ভাষা ও পারস্য ভাষা শিখেছিলেন। ১৮৯৫ সালে তাঁর কর্মজীবনের সূত্রপাত হয় মহীশূরে মহারাণী গার্লস স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেডেন্ট হিসেবে। একবছর সেখানে তিনি দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে পুনরায় কলকাতায় ফিরে এলেন। এ সময় থেকেই তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। তাই তিনি বাঙালি তরুণদের মনে-প্রাণে সাহস ও উদ্দীপনা জাগরিত করার জন্য প্রাচীন ভারতের বীরত্বের আদর্শে বীরাষ্টমীর প্রবর্তন করেছিলেন— তরুণদের মধ্যে লাঠি খেলা, অসি খেলা, মুষ্টিযুদ্ধ ইত্যাদি বীরত্বসূচক খেলার প্রচলন করেছিলেন এবং বাংলার ও ভারতের অতীত যুগের বীরগণের জন্মোৎসব পালন করেছিলেন। এ সময়েই প্রতাপাদিত্য উৎসব ইত্যাদি পালন করা হয়েছিল। পাশাপাশি তিনি তরুণীদের মধ্যেও তলোয়ার ও লাঠিখেলার প্রচলন করেছিলেন। ১৯০৫ সালে পাঞ্জাবের বিখ্যাত সমাজসেবী, আইনজীবী ও উর্দু পত্রিকা *হিন্দুস্থান*-এর সম্পাদক রামভুজ দত্ত চৌধুরীর সঙ্গে সরলাদেবী চৌধুরাণীর বিয়ে হয়। *হিন্দুস্থান* পত্রিকা প্রকাশের জন্য ব্রিটিশ রাজরোষে পড়ে রামভুজ দত্ত চৌধুরী গ্রেফতার হলে সরলাদেবী চৌধুরাণী এই পত্রিকাটি সম্পাদনা করেছিলেন। পাঞ্জাবের গ্রামে গ্রামে অন্তঃপুরে বন্দী থাকা মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা প্রচারের জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন তিনি। ১৯১১ সালে নারীদের সার্বিক উন্নতির জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন

ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল— লাহোর শহরে এর পঞ্চাশটি শাখা তৈরি হয়েছিল। আর ১৯৩০ সালে তিনি কলকাতায় *ভারত-স্ত্রী-শিক্ষাসদন* প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৯ সালে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এসময় তিনি মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে আকৃষ্ট হয়ে খদ্দরের শাড়ি পরে জনগণের মনে সাহস ও উৎসাহ দান করেছিলেন। ১৯২৩ সালে তাঁর স্বামী রামভুজ দত্ত চৌধুরীর মৃত্যু হয়। ১৯২৫ সালে তিনি সমগ্র ভারতের সামাজিক মহাসমিতির অধিবেশনে সভানেত্রীর কাজ করেছিলেন এবং বীরভূম ও লক্ষ্ণৌ শহরে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সভানেত্রী হয়েছিলেন। ১৯৪৫ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

ঠাকুরবাড়ির সাহিত্যিক পরিমণ্ডলের মধ্যে বেড় ওঠা সরলাদেবী চৌধুরাণীর বাল্যকাল থেকেই সাহিত্য-প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল। মাত্র দশ বছর বয়সে তিনি *সখা* পত্রিকা অনুষ্ঠিত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় প্রবন্ধ লিখে পুরস্কার পেয়েছিলেন। ইউরোপীয় এবং দেশীয় সঙ্গীতে তাঁর অসামান্য দক্ষতা ছিল। পিয়ানো, বীণা, বেহালা ইত্যাদি দেশী-বিদেশী বহু বাদ্যযন্ত্র তিনি বাজাতে পারতেন। বারো বছর বয়স থেকেই তিনি সঙ্গীত রচনা ও সুর-সংযোজনে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন— এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বিশেষ উৎসাহ দিতেন। তিনি *ভারতী* পত্রিকাও কিছুদিন সম্পাদনা করেছিলেন। তাঁর বিভিন্ন সময়ে লেখা রচনাগুলি হল—

কবিতা: ১. *প্রভুর দান*

২. *আহিতাগ্নিক*

প্রবন্ধ: *দুর্ভিক্ষ*

গল্প : *নববর্ষের স্বপ্ন* (১৯১৮খ্রি.)

সঙ্গীত সংকলন গ্রন্থ : *শতগান* (১৯০০খ্রি.)

স্মৃতিকথা: ১. *জীবনের ঝরাপাতা* (এটি *দেশ* পত্রিকায় ১৯৪৪ খ্রি. থেকে ১৯৪৫ খ্রি.-এর মধ্যে প্রকাশিত হয়)

২. *আমার বাল্যজীবনী* (এটি *ভারতী* পত্রিকায় ১৩১২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়)

রাজলক্ষ্মী দেব্যা:

আনুমানিক ১৮৬৫ সালে নদীয়ার শান্তিপুরে রাজলক্ষ্মী দেব্যা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা প্রাণনাথ মল্লিক। কৈলাসচন্দ্র বাগচীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁর পাঁচ পুত্র। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের একজন সদস্যা। তিনি ছিলেন প্রথম মহিলা যিনি শ্রীহট্টের ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায়

যোগ দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে প্রৌঢ় বয়সে রাজলক্ষ্মী দেব্যা এবং তাঁর স্বামী কৈলাসচন্দ্র বাগচী ব্রাহ্মধর্ম পরিবর্তন করে নব হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর সম্পর্কে এর বেশিকিছু জানা যায়নি।

রাজলক্ষ্মী দেব্যা বেশি লেখাপড়া না করলেও কিছু সাহিত্যচর্চা করে গেছেন। তাঁর বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত রচনাগুলি হল—

স্মৃতিকথা: *ব্রাহ্মসমাজের আদিচিত্র ও পরলোকতত্ত্ব*— এই গ্রন্থে তাঁর নিজের কথা ছাড়াও ব্রাহ্ম-সমাজের অনেক কথা আছে।

জীবনী: *ব্রজবিদেহী মহন্ত শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী সন্তদাস মহারাজের জীবনস্মৃতি*

ভ্রমণ কাহিনি : ১. *কেদার-বদরী ভ্রমণ কাহিনী*

২. *নেপালের পথে*

সরোজকুমারী গুপ্তা:

সরোজকুমারী গুপ্তার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে সেরকম কোন তথ্য এখন পর্যন্ত জানা যায়নি। তবে যে কারণে তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন সেটি হল তাঁর *কাহিনী বা ক্ষুদ্র গল্প* গ্রন্থ। এটি একটি গল্পগ্রন্থ। এতে রয়েছে এগারোটি গল্প।

আলোচনার উপসংহারে আমরা বলতে পারি, উনিশ শতকের লেখিকাদের রচনাগুলি বাংলা সাহিত্যে এক যুগান্তকারী ঘটনা। বহুদিন ধরে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অন্তঃপুরে বন্দী থেকে পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মতো যে মানসিক বেদনা নারীরা পেয়েছিলেন— তারই আক্ষেপ ফুটে উঠেছে অনেকের লেখায়, আবার কখনো তা হয়ে উঠেছে অম্লমধুর। এ প্রসঙ্গে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মন্তব্য করেছেন—

> ''মহিলা কবিগণের অভ্যুদয় বঙ্গসাহিত্যের পক্ষে প্রকৃতই শুভ লক্ষণ; যাঁহাদের স্নেহমিষ্টস্বর আমাদের সুখ-দুঃখের নিত্য সম্বল, বঙ্গ সাহিত্যে সেই স্বরের সুধামাখা প্রতিধ্বনি পাইয়া কে না সুখী হইবেন? সে-ভাষায় যদি কিছু গঞ্জনা ও তীব্রতা থাকে তাহা পীড়িত সমাজের পক্ষে মাতা কি ভগ্নী-প্রদত্ত ঔষধের ন্যায়ই গ্রহণীয়।''[৭]

এতদিন পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে পুরুষদেরই একচ্ছত্র অধিকার ছিল। সেজন্য নারীদের অন্তঃপুরের অনেক অজানা কথা আমাদের কাছে অজানাই থেকে গিয়েছিল— লেখকেরা সে বিষয়ে আলোকপাত করেননি তাঁদের রচনায়। কিন্তু উনিশ শতকে লেখিকারা যখন লেখনী ধারণ করলেন তখন সেই অজানা-অচেনা অন্তঃপুরের কথা আমরা জানতে পারলাম তাঁদের রচনা থেকে— বাংলা সাহিত্যের এক নতুন দিগন্ত খুলে গেল উনিশ শতকের লেখিকাদের রচনার মাধ্যমে। এছাড়া এতদিন পর্যন্ত নারীদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা কিছু লেখকদের লেখায় উঠে এলেও তাতে নারীদের

জীবনের দুঃখ-বেদনা সেভাবে ফুটে ওঠেনি। কেননা ভুক্তভোগী না হলে অপরের দুঃখ-বেদনাকে সেভাবে উপলব্ধি করা যায় না। তাই লেখকদের লেখায় নারীদের কথা আমরা যা পেলাম তা কৃত্রিম। আর নারীরা যখন লেখনী ধারণ করলেন তখন তাঁদের লেখায় তাঁদের জীবন জীবন্ত হয়ে আমাদের কাছে প্রকাশিত হল। এভাবে বাংলা সাহিত্যে নারীদের জীবন সহজ-স্বাভাবিকভাবে উঠে এল— বাংলা সাহিত্যের অসম্পূর্ণতা সম্পূর্ণ হল।

উনিশ শতকের লেখিকারা একদিকে যেমন সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাতে তাঁদের সাহিত্য সৃষ্টির নিদর্শন রেখেছেন, অন্যদিকে তেমনি নিজেদের জীবনের নানা কথা, নানা চাওয়া-পাওয়ার কথা, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা, দুঃখ-বেদনার কথা ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁদের সাহিত্যে। আর যাঁরা আত্মকথা লিখেছেন তাঁদের লেখায় উঠে এসেছে তাঁদের পারিবারিক জীবনের কথা, অন্তঃপুরের মান-অভিমানের কথা, নারীদের শিক্ষার নানা প্রতিবন্ধকতার কথা, সামাজিক নানা কুসংস্কারের কথা, বাল্যবিবাহ ও পুরুষের বহুবিবাহের কথা, বালবিধবা নারীর জীবন-যন্ত্রণার কথা, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের প্রতি অবহেলার কথা, শোক-বেদনার কথা, ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তির কথা প্রভৃতি বিচিত্র ধরনের প্রসঙ্গ। এ সব বিষয় গল্প-উপন্যাসের মতই উপভোগ্য, আবার এগুলি লেখিকাদের বাস্তব জীবন-অভিজ্ঞতার বিবরণ হওয়ায় হয়ে উঠেছে তৎকালীন সমাজ-সংস্কৃতির বিশ্বস্ত দলিল— ইতিহাসের থেকেও এর সত্যতা কোনো অংশে সামান্য নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রেই বেশি।

উনিশ শতকে নারী শিক্ষা প্রচলনের ফলে লেখিকাদের আবির্ভাবে এবং সাহিত্যচর্চার ফলে সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রে নারীরাও যে পুরুষদের মতই প্রতিভার অধিকারী সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। নারীরাও যে লিখতে পারে; তাঁদেরও যে নিজস্ব আবেগ, ভাবনা-চিন্তা আছে— তা তাঁদের লেখা রচনাগুলি থেকেই জানা যায়। তাঁরা যে শুধু সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রমাত্র নয়, তাঁরাও যে পারিবারিক-সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রে সুচিন্তিত মত পোষণ করতে পারেন— তা তাঁদের লেখা প্রবন্ধগুলি থেকে সহজেই আমরা বুঝতে পারি। আবার সাহিত্যের সমস্ত প্রকরণেই সাহিত্য সৃষ্টি করে উনিশ শতকের লেখিকারা একদিকে যেমন তাঁদের সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি বাংলা সাহিত্যকেও সমৃদ্ধ করেছেন। আর সব থেকে বড় বিষয় হল বাংলা সাহিত্যে তাঁরা তাঁদের জীবনকে উন্মোচন করে কিছুটা হলেও নতুনত্বের আমেজ নিয়ে এসেছেন। এভাবে বাংলা সাহিত্যে উনিশ শতক থেকে লেখিকারা যে ধারাবাহিক সাহিত্যচর্চা শুরু করেছিলেন তার ধারা আজও অব্যাহত এবং ভবিষ্যতেও সেই ধারা চলতেই থাকবে। এভাবে বাংলা সাহিত্যে লেখিকারাও

সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে আমাদের *দৈববাণী* শুনিয়ে যাচ্ছেন, আর সে বাণী শুনে আমরা মুগ্ধ হই, আনন্দিত হই। এ অধ্যায়ে আমরা শুধু উনিশ শতকের লেখিকাদের জীবনী এবং তাঁরা কী কী রচনা করেছেন তার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরলাম। উনিশ শতকের লেখিকাদের রচনার বিস্তারিত আলোচনা করলে লেখিকাদের রচনার বিষয় এবং আঙ্গিক সম্পর্কে একটা পূর্ণাঙ্গ ধারণা পাওয়া যেতো। তবে আমাদের আলোচনার বিষয় না হওয়ায় এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা আমরা করলাম না— পরবর্তীকালে গবেষকেরা এ বিষয়ে দীর্ঘ এবং পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করতে পারেন।

তথ্যসূত্র:

১. দাশ জীবনানন্দ : কবিতার কথা, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ: পৌষ ১৩৯৭, পৃ. ৭।

২. বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, অষ্টম খণ্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা:লি:, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ: ২০১৫-২০১৬, পৃ. ৩৭৩।

৩. ভট্টাচার্য সুতপা (সংকলন ও সম্পাদনা) : বাঙালি মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য: উনিশ শতক, ভূমিকাংশ, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ: ২০১৪, পৃ. ২।

৪. সেন সুকুমার : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা:লি:, কলকাতা, সপ্তম মুদ্রণ: কার্তিক ১৪১৬, পৃ. ৫২,৫৩।

৫. গুপ্ত যোগেন্দ্রনাথ : বঙ্গের মহিলা কবি, সম্পাদনা-অলোক রায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ: আগস্ট ২০১৩, পৃ. ৭৯।

৬. বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, অষ্টম খণ্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা.লি., কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ: ২০১৫-২০১৬, পৃ. ৩৭৫।

৭. গুপ্ত যোগেন্দ্রনাথ : বঙ্গের মহিলা কবি, সম্পাদনা-অলোক রায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ: আগস্ট ২০১৩, পৃ. ২৩

তৃতীয় অধ্যায়
নারীর আত্মকথায় উনিশ শতক: নারী শিক্ষার প্রসঙ্গ

উনিশ শতকের প্রথমদিকে এদেশের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মতই বন্দী করে রাখা হয়েছিল— সেজন্য পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীদের শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। আর নারীদের শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত করে রাখার জন্যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ হাতিয়ার হিসাবে কাজে লাগিয়েছিল সামাজিক নানা কুসংস্কার, যেমন— লেখাপড়া শিখলে নারীরা *'বিধবা হবে', 'অসতী হবে'* ইত্যাদি। নারী তথা যেকোনো মানুষকে পদানত করে রাখার সবথেকে সহজ এবং মোক্ষম পদ্ধতি হল তাকে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত করে রাখা। কেননা শিক্ষা আমাদের হৃদয়ে যে জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করে সেই আলোয় আলোকিত হয় আমাদের ব্যক্তিত্ব; আমরা তার দ্বারা স্বাবলম্বী হই। তাই আমরা বলতেই পারি উনিশ শতকে এদেশে নারীদের সামাজিক অবস্থার অবনতির মূলে ছিল অশিক্ষা। উনিশ শতকে এদেশে নারীদের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে গোলাম মুরশিদ জানিয়েছেন—

> ''আলোচ্যকালে বাঙালি সমাজে মহিলাদের মর্যাদা ছিলো খুবই নগণ্য। ১৮১৯ সালে প্রকাশিত সতীদাহ সম্পর্কিত তাঁর দ্বিতীয় পুস্তিকায় রামমোহন রায় বলেন, একই সঙ্গে রান্না করতে পারে, শয্যাসঙ্গিনী হতে পারে এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গে ঘরের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে এরূপ উপযোগী জন্তু ব্যতীত মহিলাদের আর কিছু বলে বিবেচনা করা হয় না। পুরুষদের তুলনায় মহিলারা নিকৃষ্ট— এ বিশ্বাস তখন কেবল ভারতবর্ষে নয়, কম বেশি সারা পৃথিবীতেই জনপ্রিয় ছিলো।''[১]

প্রাচীন ভারতে নারীদের অবস্থা এরকম শোচনীয় ছিল না; প্রাচীন ভারতে নারীরা যথার্থই শিক্ষিতা ছিল— ইতিহাসে তার প্রমাণ আছে। প্রাচীন ভারতে ঘোষা, অপালা, গার্গী প্রমুখ শিক্ষিতা নারীর নাম আমরা ইতিহাস থেকে জানতে পারি। তাহলে উনিশ শতকে এদেশের নারীদের এরকম শোচনীয় পরিণতি হল কী করে? এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি মুসলমান আমলে নারীদের অবস্থা সব দিক থেকেই শোচনীয় হয়ে ওঠে— তাদের সমস্তরকম স্বাধীনতা হরণ করা হয়। যদিও পরবর্তী বৈদিক যুগ থেকে নারীদের সামাজিক অবস্থানের অবনতি হতে থাকে তবুও সেসময় নারীদের অবহেলা করা হতো না। কিন্তু এদেশে মুসলমান আমলেই নারীরা পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মতো অসহায়, পরাধীন

হয়ে ওঠে। এদেশে নারীদের এরকম শোচনীয় অবস্থা চলতে থাকে উনিশ শতক পর্যন্ত।

রাজনৈতিক পালাবদলের ফলে পরবর্তীকালে এদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে এদেশের মানুষেরা পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার সুযোগ পায়। এসময় বিশেষত উনিশ শতকে অনেকেই পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠে। এই উনিশ শতকেও বাঙালি নারীদের সামাজিক অবস্থান ছিল নিম্নমানের এবং অধিকাংশ বাঙালি নারীই ছিল অশিক্ষিতা। ফলত এসময় এদেশের প্রগতিশীল ভদ্রলোকরা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হন এবং এদেশের নারীদের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হন— নারীদের নিয়ে তাঁরা নতুনভাবে ভাবতে শুরু করেন। গোলাম মুরশিদ জানিয়েছেন—

> ''ইংরেজদের আগমনের বহু পূর্ব থেকেই বঙ্গদেশ বিদেশি শাসনাধীনে ছিলো। সুতরাং বঙ্গদেশে ইংরেজ রাজত্বের যদি কোনো অভিনবত্ব থাকে, তা হলে তা বৈদেশিক বলে নয়; সে অভিনবত্ব ছিলো নতুন ধারণার। সাড়ে পাঁচশ বছরের মুসলিম আমলে যে-দেশের পরিবর্তন হয় সামান্যই এবং চিন্তার ক্ষেত্রে যে- দেশের মধ্যযুগীয় বৈশিষ্ট্য প্রায় অপরিবর্তিত থাকে, সেই বঙ্গদেশই ইংরেজ আমলে দ্রুতগতিতে আধুনিক ভাবধারা গ্রহণ করতে আরম্ভ করে। পাশ্চাত্যের অভিঘাতে বঙ্গদেশে কেবল যে নতুন প্রাণ-সঞ্চারিত হয়, তাই নয়; এ দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এলিট শ্রেণী অথবা ভদ্রলোকদের মনোভাবই যথেষ্ট পরিমাণে পাল্টে যায়। পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক ও যুক্তিবাদী ভাবধারার প্রভাবে বাঙালি ভদ্রলোকরা তাঁদের দৃঢ়মূল মূল্যবোধ এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার নতুন সংজ্ঞা দান করেন।''[২]

এদেশের নারীদের যখন ঘরের মধ্যে সাংসারিক কাজ-কর্মের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল এবং শিক্ষার আলো থেকে তাদের দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল তখন উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে এদেশের প্রগতিশীল ভদ্রলোকরা নারীদের অবস্থার উন্নতির জন্য নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। এভাবে উনিশ শতকে আমরা দেখব নারীদের অবস্থার উন্নতির প্রথম সোপান হিসেবে নারী শিক্ষার বিস্তারের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, নব্য শিক্ষিত প্রগতিশীল সমাজ সংস্কারক ব্যক্তিবর্গ, বেথুন সাহেব, বিদ্যাসাগর, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, ব্রাহ্মসমাজ এগিয়ে এসেছিল। এভাবে বিভিন্ন উদ্যোগে উনিশ শতকে এদেশের নারী শিক্ষার সূচনা ও বিস্তার

ঘটেছিল।

উনিশ শতকে এদেশে নারী শিক্ষার সূচনায় যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় খ্রিস্টান মিশনারিদের কথা। খ্রিস্টান মিশনারিরা মূলত এদেশের মানুষকে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করার জন্যই নানা জনহিতকর কাজ-কর্ম করেছিলেন— খ্রিস্টান মিশনারিদের এরকম একটি জনহিতকর কাজ ছিল এদেশের নিরক্ষর নারীদের শিক্ষিত করা। খ্রিস্টান মিশনারিদের মধ্যে এবিষয়ে প্রথমে যে মিশনারির নাম করতে হয়, তাঁর নাম রবার্ট মে। তিনি নারীদের শিক্ষিত করার জন্য ১৮১৮ খ্রি. চুঁচুড়ায় একটি বালিকা বিদ্যালয় তৈরি করেছিলেন। কিন্তু রবার্ট মে অকস্মাৎ মারা গেলে এদেশে নারী শিক্ষা চালু রাখার জন্য খ্রিস্টান মিশনারিদের পক্ষ থেকে *ক্যালকাটা ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি* তৈরি করা হয়। এই সোসাইটির উদ্দেশ্যে ছিল নারীদের শিক্ষা দেওয়া এবং এই উদ্দেশ্যে কিছু বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীকালে এই *ক্যালকাটা ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি* পরিচিত হয় *ক্যালকাটা ব্যাপটিস্ট ফিমেল স্কুল সোসাইটি* নামে। স্বপন বসু *ক্যালকাটা ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি* সম্পর্কে বলেছেন—

> ''১৮২৩-এ সোসাইটির পরিচালনাধীন স্কুলের সংখ্যা হয় ৮। এই বছরেই 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি' 'বেঙ্গল খ্রিশ্চান স্কুল সোসাইটি'র মহিলা বিভাগে পরিণত হয়। ১৮২৯-এ সোসাইটির স্কুলের সংখ্যা দাঁড়ায় ২০। ১৮৩২ সাল থেকে 'ক্যালকাটা ব্যাপটিস্ট ফিমেল স্কুল সোসাইটি' এই নতুন নামে সোসাইটির পরিচয় হয়।''[৩]

খ্রিস্টান মিশনারিদের মধ্যে মিস মেরি আন কুক উনিশ শতকের প্রথম দিকে এদেশে নারী শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ব্রিটিশ অ্যাণ্ড ফরেন স্কুল সোসাইটির প্রচেষ্টায় নারীদের শিক্ষিত করার মহান উদ্দেশ্য নিয়ে মিস কুক এদেশে এসেছিলেন ১৮২১ সালে। মিস কুক এদেশের নারীদের শিক্ষিত করার জন্য প্রথমে *স্কুল সোসাইটির* সাহায্য চাইলেও এ বিষয়ে সোসাইটির সভ্যগণের মধ্যে মতভেদ থাকায় মিস কুক সোসাইটির পক্ষ থেকে কোনো সাহায্য পাননি। পরে *চার্চ মিশনারি সোসাইটির* সভ্যগণ মিস কুককে সাহায্য করলে তিনি এদেশে নারী শিক্ষা বিস্তারের মহান কাজে নিজেকে নিযুক্ত করেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর মতে অল্প দিনের মধ্যে মিস কুক এদেশের নানা স্থানে অনেকগুলি বালিকা বিদ্যালয় তৈরি করেছিলেন এবং সেখানে কমপক্ষে ২৭৭ জন বালিকা লেখাপড়া করতো। মিস কুক এদেশের নারীদের শিক্ষিত করার জন্য একের পর এক বালিকা

বিদ্যালয় তৈরি করেছিলেন। এভাবে অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর তৈরি বিদ্যালয়ের সংখ্যা দশ থেকে বেড়ে হয়েছিল পনেরো। মিস কুকের নারীদের শিক্ষার জন্য তৈরি বিদ্যালয়ের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া এবং সেখানকার শিক্ষা প্রণালী অনেক মানুষকেই প্রভাবিত করতে পেরেছিল। যেমন, মিস কুকের তৈরি বালিকা বিদ্যালয় সম্পর্কে ৮ মার্চ ১৮২৩ সালে *সমাচার দর্পণ* পত্রিকায় লেখা হয়েছিল—

> ''কলিকাতা জরনেলে ২৮ ফেব্রুআরি তারিখে পাদরি শ্রীযুত করি সাহেব এক পত্র ছাপাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে এই বিবরণ আছে যে মিস কুকের শাসনের মধ্যে পনেরটা বালিকাপাঠশালা ছিল তাহাতে এগার পাঠশালা প্রস্তুত হইয়াছে। প্রথমত: কতক দিন পর্য্যন্ত বালিকারা ক খ লিখে তাহাতে প্রস্তুতা হইলে পর বাঙ্গালি ইতিহাসের ক্ষুদ্র২ পুস্তক পাঠ করে তাহাতে নৈপুণ্য জন্মিলে পর শিল্প বিদ্যা শিক্ষা করে এই কর্ম্মে যত লাভ হয় তাহা তাহারদিগকে পারিতোষিকের মত দেওয়া যায় সেই লাভ দেখিয়া শিল্প কর্ম্ম করিতে অনেকের লোভ জন্মিয়াছে তাহাতে ছয় পাঠশালাতে প্রায় এক হাজারখান গামছা কিনারা সিলাই হইয়াছে এবং কোন কোন পাঠাশালাতে মোজা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছে এখন পোনর পাঠশালাতে তিন শত বালিকা শিক্ষা পাইতেছে।''[৪]

বস্তুত সাময়িকভাবে হলেও মিস কুকের তৈরি বালিকা বিদ্যালয়গুলি সেসময় বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। তাই ১৮২৩ সালের মধ্যেই তাঁর তৈরি বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা পনেরো থেকে বেড়ে হয়েছিল বাইশ এবং ছাত্রীসংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। এভাবে দু'বছর মিস কুক এদেশে নারী শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন। পরে উইলসন নামে একজন মিশনারির সঙ্গে মিস কুকের বিয়ে হওয়ায় মিস কুক নারীদের শিক্ষিত করার মহান কাজে পূর্বের মতো আর সময় দিতে পারেননি। শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাষায়—

> ''অবশেষে তিনি (Mr. Wilson) উইলসন নামক একজন মিশনারি সাহেবের সহিত পরিণীতা হইলেন। বিবাহের পরেও তিনি স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে রত রহিলেন বটে, কিন্তু আর পূর্ব্বের ন্যায় সময় দিতে পারিতেন না।''[৫]

মিস কুক বিয়ের পর এদেশের নারী শিক্ষা বিস্তারে তেমন সময় দিতে না পারায় কলকাতার কিছু ইংরেজ মহিলা লেডী আমহার্ষ্টকে নেত্রী করে *Bengal Ladies' society* নামে এক সভা

তৈরি করেছিলেন এবং এই সভার উদ্যোগে এদেশে নারী শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে কলকাতার বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলি বালিকা বিদ্যালয় তৈরি হয়েছিল। এই সভার উদ্যোগে তৈরি বিদ্যালয়গুলি খ্রিস্টান ধর্মের মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে তৈরি হওয়ায় এই বিদ্যালয়গুলিতে খ্রিস্টান ধর্মের শিক্ষা দেওয়া হতো। এ প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন—

> ''এমনকি ১৮৩৪ সালে আডাম সাহেব বঙ্গদেশের শিক্ষার অবস্থা বিষয়ে যে রিপোর্ট প্রদান করেন, তাহাতে কলিকাতা ব্যতীত শ্রীরামপুর, বর্দ্ধমান, কালনা, কাটোয়া, কৃষ্ণনগর, ঢাকা, রাখরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম প্রভৃতি স্থানে ১৯টি বালিকা বিদ্যালয় ও প্রায় ৪৫০টি বালিকার উল্লেখ দেখা যায়; এবং ঐ সকল বিদ্যালয়ের অনেকগুলি লেডীস্ সোসাইটির সভ্য মহোদয়গণের উৎসাহে স্থাপিত বলিয়া উল্লিখিত হয়। কিন্তু এই সকল বালিকা-বিদ্যালয়ের অধিকাংশ খ্রীষ্টীয় মহিলাদিগের স্থাপিত ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যের অঙ্গীভূত ছিল।''[৬]

তাই উনিশ শতকের প্রথম দিকে খ্রিস্টান মিশনারিদের এদেশে নারী শিক্ষা বিস্তারের প্রাথমিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। কেননা যেসব ভদ্রলোক তাদের মেয়েদের শিক্ষিত করার পক্ষপাতি ছিল তারাও খ্রিস্টান মিশনারি পরিচালিত এইসব স্কুলকে সন্দেহের চোখে দেখত এবং ধর্মান্তরের ভয়ে তাদের মেয়েদের এসব স্কুলে পাঠাতে সাহস পেতো না। এসব স্কুলে শুধু নিচু শ্রেণির হিন্দু মেয়েরাই পড়তে যেতো; তবে তা শুধুমাত্র অর্থ পুরস্কারের এবং খেতে পাওয়ার লোভে। ফলে এদেশের বৃহত্তর নারীদের অংশগ্রহণ না থাকায় এদেশে নারী শিক্ষা বিস্তারের যে প্রচেষ্টা খ্রিস্টান মিশনারিরা করেছিলেন তা ব্যর্থ হয়ে যায়।

উনিশ শতকের প্রথম দিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে এদেশের অনেক মানুষেরই মানসিকতা পরিবর্তিত হয়। রাধাকান্ত দেবের মতো তথাকথিত রক্ষণশীল মানুষও নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং *ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি* (১৮১৭ খ্রি) পরিচালিত স্কুলগুলিতে সেসময় ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাবস্থা করা হয়েছিল আর মেয়েদের পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল রাধাকান্ত দেবের বাড়িতে। কাজেই রাধাকান্ত দেব রক্ষণশীল হলেও নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান কোন অংশে কম নয়। স্বপন বসু রাধাকান্ত দেব সম্পর্কে বলেছেন—

> ''পরবর্তীকালে প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে মেয়েদের পাঠানো সমর্থন না করলেও, নীতির

> দিক দিয়ে তিনি কখনও স্ত্রীশিক্ষার বিরোধিতা করেননি। জাতির নৈতিক চরিত্র ও সামাজিক সুখবৃদ্ধির জন্য স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তিনি উনিশ শতকের প্রথম দিকেই অনুভব করতে পেরেছিলেন। শুধু তাই নয়, স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে রামমোহন যেখানে দু'চার কথা লেখার বেশি কিছু করতে পারেননি, রাধাকান্ত সেখানে সক্রিয়ভাবে এ-বিষয়ে আগ্রহ দেখাতেও কুণ্ঠিত হননি। বেথুন যথার্থ কারণেই আধুনিক যুগে স্ত্রীশিক্ষার সমর্থক প্রথম হিন্দুর গৌরব রাধাকান্ত দেবকে দিয়েছেন।"[৭]

এছাড়া উনিশ শতকে অনেক উচ্চবিত্ত পরিবার তাদের মেয়েদের জন্য বাড়িতে সামান্য লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেছিল। সেসময় এদেশের অনেক প্রগতিশীল ব্যক্তি যে নারীদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও গ্রহণ করেছিলেন তার উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ১৮৪৭ সালে প্যারীচরণ সরকার ও নবীনকৃষ্ণ মিত্র বারাসাতে নারীদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় তৈরি করেছিলেন। তবে উনিশ শতকের প্রথম দিকে নারী শিক্ষা বিস্তারে এসব ব্যক্তিগত উদ্যোগের সীমাবদ্ধতা ছিল— খুব স্বল্পসংখ্যক মানুষই নারী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন এবং তাঁদের উদ্যোগে যে নারী শিক্ষার প্রচলন হয়েছিল তার সুবিধা মুষ্টিমেয় কয়েকজন নারী ছাড়া বেশিরভাগ নারীই পায়নি।

উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে ডিরোজিও এবং তাঁর ইয়ংবেঙ্গল সমাজ চেয়েছিল এদেশের নারীদের শিক্ষিত করতে। তাঁদের পরিচালিত *পার্থেনন* (১৮৩০খ্রি.) *জ্ঞানান্বেষণ* পত্রিকার নানা সংখ্যায় তাঁরা নারী শিক্ষার স্বপক্ষে অনেক কথা লিখেছিলেন। পরবর্তীকালে বেথুন সাহেব যখন এদেশে নারী শিক্ষার জন্য বালিকা বিদ্যালয় তৈরি করেছিলেন তখন প্যারীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ ইংয়বেঙ্গল সমাজের অনেকেই বেথুন সাহেবকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন।

উনিশ শতকে এদেশে নারী শিক্ষার সূচনার ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গেলে প্রথমেই যার নাম করতে হয়— তিনি হলেন ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন। ১৮৪৮ সালে বেথুন সাহেব এদেশে এসেছিলেন এবং এদেশে নারীদের শিক্ষার জন্য ১৮৪৯ সালে ৭ মে তিনি *ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল* প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্বপন বসু *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস* গ্রন্থে বলেছেন— *ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল*-কে কেন্দ্র করেই এদেশে প্রকৃত নারী শিক্ষার সূচনা হয়েছিল। কেননা এর পূর্বে খ্রিস্টান মিশনারিরা

এদেশের নারীদের ধর্মান্তরিত করার জন্যই শিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন এবং সেজন্য খ্রিস্টান মিশনারি পরিচালিত স্কুলগুলিতে খ্রিস্টধর্মের শিক্ষাই দেওয়া হতো। কিন্তু *ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল*-এ প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন বেথুন সাহেব— তিনি নারীদের শিক্ষার জন্যই স্কুল তৈরি করেছিলেন, সেখানে তাঁর আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। বেথুন সাহেবের এই মহৎ উদ্দেশ্যের জন্যই তাঁকে এ ব্যাপারে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ পণ্ডিত দেশীয় ব্যক্তিবর্গ সাহায্য করেছিলেন। বেথুন সাহেবের নারীদের শিক্ষার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠার পেছনে নারীদের প্রতি তাঁর আন্তরিকতা কতটা ছিল সে প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন—

> ''১৮৪৯ সালের ৭ই মে দিবসে তন্নাম-প্রসিদ্ধ বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বীটন্ এই কার্য্যে দেহ-মন-প্রাণ নিয়োগ করেন; হেয়ার যেমন বালকদিগের শিক্ষা লইয়া মাতিয়াছিলেন, বীটন্ তেমনি বালিকাদিগের শিক্ষা লইয়া একেবারে মাতিয়া যান। তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার নব-প্রতিষ্ঠিত স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিতেন; আসিবার সময় বালিকাদিগের জন্য নানা উপহার লইয়া আসিতেন; মধ্যে মধ্যে বালিকাদিগকে নিজ ভবনে লইয়া গিয়া মূল্যবান উপহার সামগ্রী দিয়া গৃহে প্রেরণ করিতেন; কখন কখনও চারি পায়ে ঘোড়া হইয়া শিশু বালিকাদিগকে পৃষ্ঠে তুলিয়া খেলা করিতেন।''[৮]

পূর্বে এদেশের মানুষ খ্রিস্টান মিশনারি পরিচালিত স্কুলগুলিতে তাদের মেয়েদের ধর্মান্তরের ভয়ে পাঠাতে চাইতো না। তবে বেথুন সাহেবের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা দেওয়া হলেও এদেশের বেশিরভাগ মানুষ তাদের মেয়েদের বেথুন প্রতিষ্ঠিত স্কুলে পাঠাতে সাহস পায়নি। কেননা তখনও রক্ষণশীল সমাজ মেয়েদের অন্তঃপুর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে শিক্ষা গ্রহণকে মেনে নিতে পারেনি। তাই বেথুন স্কুলকে কেন্দ্র করে হিন্দু রক্ষণশীল সমাজে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। যেসকল দেশীয় ব্যক্তি রক্ষণশীল সমাজের চোখ রাঙানিকে অগ্রাহ্য করে তাদের মেয়েদের বেথুন স্কুলে পাঠিয়েছিল তাদের একঘরে করে দেওয়া হল— মদনমোহন তর্কালঙ্কার তাঁর মেয়েদের বেথুন স্কুলে পড়তে পাঠিয়েছিলেন বলে তাঁকে একঘরে করে দিয়েছিল রক্ষণশীল সমাজ। বেথুন স্কুলের গাড়িতে যখন মেয়েরা বের হত তখন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে রক্ষণশীল সমাজ অনেক কটূক্তি করতো। প্রকৃতপক্ষে রক্ষণশীল সমাজ নারীদের শিক্ষালাভের বিষয়টিকে তখনও ভালো চোখে দেখেনি। এ প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী জানিয়েছেন—

''স্ত্রী-শিক্ষা লইয়া সমাজ-মধ্যে নানা আলোচনা উপস্থিত হইল। ... নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের গাড়ী যখন রাজপথে বাহির হইত, তখন লোকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকিত ও নানা কথা কহিত; এবং সুকুমারমতি শিশু বালিকাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া কত অভদ্র কথাই কহিত। লোকে বলিতে লাগিল— ''এইবার কলির বাকি যা ছিল হইয়া গেল! মেয়েগুলো কেতাব ধর্‌লে আর কিছু বাকি থাক্‌বে না।'' নাটুকে রামনারায়ণ রসিকতা করিয়া বাবুদের মজলিসে বলিতে লাগিলেন, ''বাপ্‌রে বাপ্‌, মেয়েছেলেকে লেখাপড়া শেখালে কি আর রক্ষা আছে! এক ''আন'' শিখাইয়াই রক্ষা নাই! চাল আন, ডাল আন, কাপড় আন করিয়া অস্থির করে, অন্য অক্ষরগুলো শেখালে কি আর রক্ষা আছে!'' লোকে শুনিয়া হা-হা করিয়া এক গাল হাসিতে লাগিল।''[৯]

এই তীব্র সামাজিক প্রতিক্রিয়ায় এদেশের মানুষের মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দেয়— যাঁরা একসময় নারী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন তাঁরাও এই সামাজিক প্রতিক্রিয়ার ঘূর্ণিচক্রে নারী শিক্ষার বিপক্ষে চলে যান। প্রখ্যাত কবি ও সাংবাদিক ঈশ্বর গুপ্ত প্রথম দিকে নারী শিক্ষার পক্ষে ছিলেন এবং *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকায় তিনি নারী শিক্ষার প্রশংসাও করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে তিনিই আবার সামাজিক প্রতিক্রিয়ার ঘূর্ণিচক্রে নারী শিক্ষাকে ব্যঙ্গ করে *দুর্ভিক্ষ* কবিতায় লিখেছেন—

''আগে মেয়েগুলো, ছিল ভালো,
ব্রত ধর্ম করতো সবে।
একা ''বেথুন'' এসে, শেষ করেছে,
আর কি তাদের তেমন পাবে?
যত ছুঁড়িগুলো, তুড়ি মেরে,
কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে।
তখন ''এ,বি,'' শিখে, বিবি সেজে,
বিলাতি বোল কবেই কবে।''[১০]

এভাবে নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে বেথুন স্কুল এগিয়ে চলে এবং পরবর্তীকালে এই স্কুলকে কলেজে রূপান্তরিত করে এদেশের নারীদের উচ্চ শিক্ষার পথ প্রশস্ত করা হয়েছিল। বস্তুত এদেশে নারী শিক্ষা বিস্তারে বেথুন সাহেবের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

উনিশ শতকে এদেশে নারী শিক্ষা বিস্তারে যিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন— তিনি হলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি বেথুন স্কুলের সেক্রেটারি হয়ে স্কুলগৃহ তৈরির জন্য অনেক টাকা দান করেছিলেন। বেথুন স্কুল পরিচালনার কাজে তিনি অনেক বছর নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। নারী শিক্ষার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। তাই পরবর্তীকালে তিনি সরকারি অর্থানুকূল্যে বর্ধমান, হুগলি, নদিয়া প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে অনেকগুলি বালিকা বিদ্যালয় তৈরি করেছিলেন। আবার বিদ্যাসাগর নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে কিছু গ্রন্থ লিখেছিলেন যেগুলি পাঠ করে এদেশের সাধারণ মানুষ কিছুটা হলেও নারী শিক্ষা বিষয়ে নমনীয় হয়েছিল এবং তারাও নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল। অর্থাৎ বিদ্যাসাগর বহুমুখী প্রচেষ্টার দ্বারা নারী শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে চেয়েছিলেন। এভাবে উনিশ শতকে নারী শিক্ষা নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে এবং কিছু নারী শিক্ষিতা হয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করেন। ফলস্বরূপ এই মহিলা সাহিত্যিকরা সমাজের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠেন— অনেকেই তখন নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং নিজেদের মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে থাকে। অর্থাৎ উনিশ শতকের মাঝামাঝি মহিলা সাহিত্যিকদের আবির্ভাবও নারী শিক্ষা বিস্তারে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এদেশে নারী শিক্ষা বিস্তারে ব্রাহ্মসমাজ ও কেশবচন্দ্র সেনের অবদানের কথা স্বীকার করতেই হবে। কেশবচন্দ্র সেন ব্রহ্মসমাজের পক্ষ থেকে ইংল্যাণ্ডে বিভিন্ন সময়ে যেসব বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তা থেকে নারী শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি মূলত নারীর তিন রূপ যথা— জায়া,জননী, ভগিনী এদের আদর্শের প্রতিমূর্তি করে তোলার জন্য নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে বিনয়ভূষণ রায় বলেছেন—

> ‘‘ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন সভায় তিনি যে বক্তৃতা দেন তা থেকে স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয় মহিলাদের শিক্ষা দিয়ে বিদুষী বউ, আদর্শ মা ও ভগ্নী হিসেবে গড়ে তোলাই ছিল তাঁর স্ত্রীশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য।’’[১১]

নারী শিক্ষা বিস্তারের এই উদ্দেশ্যে কেশবচন্দ্র সেন ও অন্যান্য ব্রাহ্মরা মিলে ১৮৬৩ সালে *ব্রাহ্মবন্ধু সভা* স্থাপন করেন। *ব্রাহ্মবন্ধু সভা-র* বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে নারী শিক্ষা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উনিশ শতকে এদেশে নারী শিক্ষার বিস্তারের ক্ষেত্রে একটি বড় অন্তরায় ছিল বাল্যবিবাহ প্রথা। ফলে অল্পবয়সে এদেশের অধিকাংশ নারীর বিয়ে হয়ে যাওয়ায় সংসারচক্রে পড়ে তাদের

লেখাপড়া আর হতো না। তাই *ব্রাহ্মবন্ধু সভা* নারীদের শিক্ষার জন্য *অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা* নামে একটি নতুন শিক্ষা পদ্ধতি চালু করেছিল। এই শিক্ষা পদ্ধতি অল্পবয়স্কা বিবাহিতা এবং বয়স্কা নারীদের জন্য তৈরি হয়েছিল। এই পদ্ধতিতে মেয়েদের বাইরে স্কুলে গিয়ে পড়াশোনা করার প্রয়োজন হতো না— এই পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট বিষয় অনুযায়ী মেয়েরা অন্তঃপুরেই পড়াশোনা করতো এবং অন্তঃপুরেই তাদের পরীক্ষা নেওয়া হতো। তাই এই পদ্ধতি সেকালে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল, কেননা রক্ষণশীল সমাজ তখনো প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে গিয়ে নারীদের শিক্ষা গ্রহণকে ভালো চোখে নিত না। এই *অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা* পদ্ধতিতে ব্রাহ্মসমাজের অনেক নারী শিক্ষিতা হয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাঁদের অনেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, আবার কেউবা সাহিত্যিক হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। কেশবচন্দ্র সেন ১৮৭০ সালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন *ভারত-সংস্কারসভা*— এই সভার পাঁচটি প্রধান বিভাগের অন্যতম ছিল স্ত্রী জাতির উন্নতি সাধন বিষয়ক বিভাগ। স্ত্রী জাতির উন্নতি সাধন বিষয়ক বিভাগের উদ্যোগে নারী শিক্ষা বিস্তারের জন্য শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় *(নর্মাল স্কুল)*, বয়স্কা নারী ও বালিকাদের জন্য বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এভাবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাহ্মসমাজ নারী শিক্ষার বিস্তারে নানা পরিকল্পনা নিয়েছিল এবং এই সমাজ থেকেই পরবর্তীকালে প্রথম বাঙালি মহিলা স্নাতক আমরা পাই।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এদেশে নারী শিক্ষার বিকাশে কিছু সাময়িক পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পত্রিকাগুলি হল— *মাসিক পত্রিকা* (১৮৫৪খ্রি.), *বামাবোধিনী পত্রিকা* (১৮৬৩ খ্রি.), *অবলাবান্ধব* (১৮৬৯খ্রি.) পত্রিকা ইত্যাদি। এসব পত্রিকা নারীদের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিল— নারীরা যাতে শিক্ষিতা হতে পারে সেজন্য কিছু লেখালেখি প্রকাশ করত এসব পত্রিকা। যার ফলে জনমানসে নারী শিক্ষার প্রতি একটা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করতে পেরেছিল এসব পত্রিকা। বিভিন্ন সামাজিক প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে কয়েকজন মুষ্টিমেয় নারী সেকালে শিক্ষিতা হয়ে নিজেদের ভাব-ভাবনাকে যখন সাহিত্যের মাধ্যমে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন তখন এসব পত্রিকা সাগ্রহে নবাগতা লেখিকাদের রচনা প্রকাশ করে নারীদের প্রতিভার প্রকাশে সাহায্য করেছিল। এছাড়া উনিশ শতকের সাতের দশকে তথাকথিত শহুরে শিক্ষিত সম্প্রদায় নারী শিক্ষার আবশ্যকতা স্বীকার করে নেয় এবং এসময় থেকেই বিবাহক্ষেত্রে অনেকেই শিক্ষিতা নারীর অনুসন্ধান করতে থাকে। ফলে যারা নারী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিল না তারাও ধনবান শিক্ষিত ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার জন্য তাদের মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলে। আবার এ শতকের আটের দশকে

সরকার নারী শিক্ষার প্রতি জনমানসে আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন রকম স্কিম এবং বৃত্তি বা আর্থিক সহযোগিতার ব্যবস্থা করেছিল। গোলাম মুরশিদ জানিয়েছেন—

> ''১৮৭১-৭৩ সালে সরকার প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে যে-ক্যাম্পবেল স্কিম গ্রহণ করে, স্ত্রীশিক্ষা বিকাশে তা বিশেষ সহায়ক হয়। কারণ সরকারি অর্থ-সাহায্য পাওয়ায় আলোচ্য কালে গ্রামে গ্রামে শত শত প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।''[১২]

এভাবে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক আলোচনায়; জনমানসে নারী শিক্ষার আবশ্যকতা অনুভব এবং সরকারি বিভিন্ন পরিকল্পনায় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এদেশে নারী শিক্ষার বিস্তৃতি ঘটে এবং এসময় নারী শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা কিছুটা হলেও নমনীয় হয় উনিশ শতকের প্রথমার্ধের তুলনায়।

১৮৪৯ সালের ৭মে বেথুন সাহেব প্রতিষ্ঠিত *ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল* প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এদেশের নারী শিক্ষার যথার্থ সূচনা হয়। পরবর্তীকালে এই স্কুল *বেথুন স্কুল* নামে পরিচিত হয় এবং প্রথম দিকে যখন এই স্কুল খোলা হয় তখন এখানে নারীদের প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হতো। এই স্কুলকে কেন্দ্র করে সেসময় নানা সামাজিক প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল সেকথা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। তবে নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকলেও স্বল্প সংখ্যক মানুষ চেয়েছিল, নারীরা যাতে চিঠিপত্র লিখতে-পড়তে পারে— এমন শিক্ষা গ্রহণ করুক এবং নারীরা যাতে তাদের সন্তানদের পরবর্তীকালে প্রাথমিক শিক্ষা দিতে পারে— এমন প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করুক। এভাবে সেসময় নানা প্রতিকূলতার পথ অতিক্রম করে নারীদের প্রাথমিক শিক্ষার পথ নিশ্চিত হল। এ প্রসঙ্গে *বাঙালি নারীর উচ্চশিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে ভূমিকা* প্রবন্ধে রুমা ঘোষ লিখেছেন—

> ''সেটা ১৮৪৯ সাল। বেথুন প্রতিষ্ঠা করলেন ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল। প্রথমদিকে বেথুন স্কুলের পড়াশোনা মোটামুটি প্রাথমিক স্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বেথুন স্কুলের উৎসাহে জেলায় জেলায় বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা সামাজিক ভাবে প্রচলিত হতে শুরু করেছে।''[১৩]

এভাবে এসময় এদেশের নারীরা শিক্ষার আলোর প্রথম সন্ধান পায়। শিক্ষালব্ধ জ্ঞানের আলোর মধ্য দিয়ে তারা মুক্তির আলো দেখতে পেল এবং দ্রুত সেই মুক্তির দ্বার খোলার চাবিকাঠি হিসেবে তারা উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল— উচ্চশিক্ষিতা হওয়ার জন্য তারা ব্যাকুল হয়ে

উঠল। আমরা জানি উচ্চ শিক্ষার জন্যে ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হলেও প্রথম বিশ বছর সেখানে কোনো নারীকে উচ্চ শিক্ষা লাভের অধিকার দেওয়া হয়নি। উচ্চশিক্ষিতা হওয়ার বাসনায় স্বল্পসংখ্যক নারী এসময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমতি চাইলেও এ ব্যাপারে কোনো নিয়ম না থাকায় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাদের অনুমতি দেয়নি উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে। অবশেষে অনেক আলোচনার পর ১৮৭৮ সালে তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড লিটন নারীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেওয়ার অধিকার সরকারিভাবে বিধিবদ্ধ করেন।

বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে নারীদের যখন প্রাথমিক শিক্ষা লাভের সুযোগ এল তখন যেমন সামাজিক প্রতিক্রিয়া তথা প্রতিকূলতা দেখা দিয়েছিল ঠিক তেমনি উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বাঙালি নারীদের অধিকার যখন সরকারিভাবে বিধিবদ্ধ হল তখনও তৎকালীন সমাজে তার নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ সেসময় নারীদের প্রাথমিক শিক্ষা মেনে নিয়েছিল তাদেরই প্রয়োজনে, অর্থাৎ নারীদের আদর্শ জননী, স্ত্রী ও ভগিনী হিসাবে গড়ে তুলতে তারা নারীদের প্রাথমিক শিক্ষাকে একপ্রকার বাধ্য হয়েই স্বীকার করেছিল। কিন্তু নারীরা যখন উচ্চশিক্ষিতা হয়ে স্বাবলম্বী হতে চাইল তখনই হিন্দু রক্ষণশীল সমাজের স্বার্থে আঘাত লাগল এবং তারা নারীর উচ্চ শিক্ষার বিরোধিতা করতে লাগল। এমনকি সেসময়ের নারী প্রগতির ধারক ও বাহক ব্রাহ্মসমাজেও নারীদের উচ্চ শিক্ষা নিয়ে মতবিরোধ দেখা গেল। দ্বিধাবিভক্ত ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নারীদের উচ্চ শিক্ষা নিয়ে সমালোচনা করেছে, অপরদিকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সদস্যরা নারীদের উচ্চ শিক্ষাকে সমর্থন করেছে। একটি বিষয় আমাদের ভাবতে হবে, যে ব্রাহ্মসমাজ নারী শিক্ষা বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল, সেই ব্রাহ্মসমাজেই যখন নারীদের উচ্চ শিক্ষা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হয়েছে তখন সাধারণ রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে এর প্রতিক্রিয়া কী মারাত্মক হয়েছিল? তবে এই সামাজিক প্রতিক্রিয়াকে অতিক্রম করে নারীরা শেষপর্যন্ত তাদের উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছে গিয়েছিল। নদীর স্রোতকে যেমন ফেরানো যায় না, তেমনি নারীদের কাছে উচ্চ শিক্ষার দ্বার যখন উন্মোচিত হল সরকারিভাবে তখন একে একে অনেক নারীই এগিয়ে এল উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে— তাদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে আর ফেরানো সম্ভব হল না, সামাজিক নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও। আমরা পূর্বেই বলেছি এদেশে প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা হয়েছিল উনিশ শতকে বেথুন স্কুলকে কেন্দ্র করে, আবার উনিশ শতকে এই প্রতিষ্ঠানকেই কেন্দ্র করে এদেশে নারীদের উচ্চ শিক্ষারও সূচনা হয়েছিল। কেননা এসময় বেথুন স্কুল থেকে বি.এ. ডিগ্রি করার অনুমোদন

দিয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। এই সুযোগে কাদম্বিনী বসু ও চন্দ্রমুখী বসু ১৮৮৩ সালে বি.এ. পরীক্ষায় পাশ করেন— তাঁরাই ভারতের প্রথম মহিলা স্নাতক। এভাবে বাঙালি নারীদের উচ্চ শিক্ষার জয়যাত্রা সূচিত হল উনিশ শতকে। বাঙালি নারীদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে গঙ্গা আনয়নের ক্ষেত্রে ভগীরথের মতো কাজ করলেন কাদম্বিনী বসু ও চন্দ্রমুখী বসু— তাঁদের দেখানো পথেই পরবর্তীকালে অনেক নারী উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য উৎসাহিত হয়ে এগিয়ে আসেন। এভাবে একে একে আমরা কামিনী সেন, কুমুদিনী খাস্তগীর, নির্মলা সোম, ইন্দিরা ঠাকুর প্রমুখ নারী স্নাতকদের পেয়ে যাই উনিশ শতকের শেষ দিকেই। এঁদের মধ্যে ইন্দিরা ঠাকুর ছিলেন প্রথম ভারতীয় নারী যিনি ফরাসি ভাষায় সাম্মানিক সহ স্নাতক হন।

উনিশ শতকের শেষদিকেই এদেশে নারীরা স্নাতক হওয়ার পরে আরও জ্ঞানলাভের জন্য স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পেতে উৎসাহিত হলেন। এক্ষেত্রেও তাঁরা সাফল্য লাভ করলেন এবং এম.এ. থেকে শুরু করে ডাবল এম.এ. ডিগ্রিও লাভ করলেন। এ প্রসঙ্গে রুমা ঘোষ লিখেছেন, ১৮৮৪ সালে চন্দ্রমুখী বসু দ্বিতীয় শ্রেণীতে এম.এ. পাশ করেন— তিনি হলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এম.এ.। আবার নির্মলাবালা সোম ১৮৯১ সালে ইংরেজিতে এবং ১৮৯৪ সালে দর্শনে এম.এ. পাশ করেন— তিনিই নারীদের মধ্যে প্রথম ডাবল এম.এ.। উনিশ শতকের শেষদিকে এভাবে বাঙালি নারীরা উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বি.এ. এবং এম.এ. ডিগ্রি পেয়ে যান অনেক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। তবে তাঁদের লড়াই এখানেই থেমে থাকেনি, উচ্চ শিক্ষার আরেক ক্ষেত্র চিকিৎসাবিদ্যার শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাঁরা উৎসাহী হয়ে উঠলেন, আর এক্ষেত্রেও নারীদের অনেক বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কেননা তখনও কলকাতা মেডিকেল কলেজে নারীদের শিক্ষার অধিকার ছিল না— তা নিয়ে মেডিকেল কলেজের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সরকারের ও প্রগতিশীল মানুষদের তর্ক-বিতর্ক চলতে থাকে। শেষপর্যন্ত কলকাতা মেডিকেল কলেজের কর্তৃপক্ষের আপত্তিকে উপেক্ষা করে তৎকালীন ছোটলাট স্যার রিভার্স থমসন সাহেবের হস্তক্ষেপে মেডিকেল কলেজেও নারীরা শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেয়ে যান। এ প্রসঙ্গে রুমা ঘোষ *বাঙালি নারীর উচ্চশিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে ভূমিকা* প্রবন্ধে বলেছেন—

> ''১৮৮৪—৮৫-তে কলকাতা মেডিকেল কলেজে তিনজন ছাত্রী ভর্তি হন। কাদম্বিনী, বিধুমুখী বসু ও ভার্জিনিয়া মেরী মিত্র। বিধুমুখী বসু ১৮৯০ সালে এম.বি. পরীক্ষায় পাশ করেন। তিনিই ভারতে প্রথম মহিলা এম.বি.। কাদম্বিনী লিখিত পরীক্ষায় পাশ করলেও প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন। তাঁকে

জি.বি.এম.সি. ডিগ্রী দেওয়া হয়। স্বাধীনভাবে প্র্যাকটিসের অনুমতি এটি। ... এইভাবে মেয়েদের চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা স্ত্রীশিক্ষার জগতে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে।"[১৪]

এভাবে আমরা দেখব উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে উনিশ শতকের শেষপর্যন্ত অনেক নারী প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ক্রমশ উচ্চ শিক্ষা লাভ করে, আর তার মাঝে পড়ে থাকে নানা সামাজিক-রাজনৈতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া।

এ পর্যন্ত আমরা উনিশ শতকে বাংলাদেশে নারী শিক্ষার সূচনা ও বিকাশের যে ইতিহাস— তার চিত্র সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলির মধ্যে রাসসুন্দরী দাসীর *আমার জীবন*, সারদাসুন্দরী দেবীর *আত্মকথা*, প্রসন্নময়ী দেবীর *পূর্ব্বকথা*, সুদক্ষিণা সেনের *জীবন স্মৃতি*, শরৎকুমারী দেবের *আমার সংসার*, কামিনী রায়ের *শ্রাদ্ধিকী*, নিস্তারিণী দেবীর *সেকেলে কথা*, ইন্দিরা দেবীর *আমার খাতা*, মানকুমারী বসুর *আমার অতীত জীবন* এবং মনোদা দেবী দাশগুপ্তার *জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী* গ্রন্থে উনিশ শতকে এদেশের নারী শিক্ষার সূচনার ও বিকাশের এই ঘাত-প্রতিঘাতময় ইতিহাস নানা প্রসঙ্গে উঠে এসেছে। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল যে, অনেক সমালোচক আত্মকথাকে ইতিহাসের বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি নন। আবার অনেকে এ ব্যাপারে আত্মকথার উপর নির্ভর করাকে *বিপজ্জনক* বলেছেন। তবে এ ধরনের ধারণা পুরোপুরি সত্য নয়— কেননা একই সময়ে লেখা আত্মকথাগুলিতে আমরা দেখি একই ঘটনা বিভিন্ন জনের লেখায় ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উঠে এসেছে, আর বিভিন্ন জনের দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আমরা ঘটনার সত্যতা বিচার করি তাহলে সেই সত্যের সন্ধান আরও দৃঢ় হয়। আমরা জানি ইতিহাসের সত্যও কিন্তু চিরন্তন নয়, তারও পরিবর্তন হয়। যিনি ঐতিহাসিক তিনিও কিন্তু ইতিহাস লেখার সময় ইতিহাসের সত্যকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে সবসময় নিরপেক্ষ থাকতে পারেন না। তাই ইতিহাসের সত্যও অনেক সময় যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায়, আবার ইতিহাসেরও কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। ইতিহাসে যে সময়ের ঘটনার ধারাবাহিক বর্ণনা থাকে, সেসময়ের সব ঘটনার উল্লেখ কিন্তু সবসময় ইতিহাসে বর্ণিত হয় না— বিশেষত সাধারণ মানুষের জীবন। তাই উনিশ শতকে এদেশে নারীদের শিক্ষার সূচনার ও বিকাশের যে ইতিহাস আমরা পাই তা যেমন সত্য, তেমনি উনিশ শতকের এদেশের নারীদের লেখা আত্মকথাগুলিতে সেসময়ের নারী শিক্ষার সূচনার ও বিকাশের যে ইতিহাস উঠে এসেছে— তার মূল্যও কোন অংশে সামান্য নয়, বরং তা অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য।

কেননা তাঁরা স্বচক্ষে যা প্রত্যক্ষ করেছেন, নিজেদের জীবন-অভিজ্ঞতা দিয়ে যা উপলব্ধি করেছেন— তাই তাঁদের আত্মকথাগুলিতে স্মৃতি রোমন্থনের মধ্য দিয়ে বর্ণনা করেছেন। যদিও আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলির কিছু সীমাবদ্ধতা আছে, ত্রুটি আছে তবুও আমরা যদি এসব সীমাবদ্ধতা এবং ত্রুটিকে বাদ দিয়ে বৃহত্তর তাৎপর্যে সত্যকে বহুকৌণিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করতে যাই তাহলে কিন্তু আত্মকথাগুলিতে বর্ণিত ঘটনার ঐতিহাসিক মূল্যও আমাদের স্বীকার করতেই হয়।

আমরা পূর্বেই বলেছি উনিশ শতকের প্রথমার্ধে, এমনকি দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত এদেশের বেশিরভাগ নারী ছিল অশিক্ষিতা। এর কারণ তখন হিন্দু রক্ষণশীল সমাজের ইচ্ছে-অনিচ্ছের ওপরেই সমাজের যাবতীয় কর্মকাণ্ড নির্ভর করতো— কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় তাদের বিরোধিতা করলেই শুরু হতো সামাজিক নানা প্রতিক্রিয়া। উনিশ শতকের প্রথমদিকে এদেশের নারীরা অশিক্ষিতা ছিল মূলত এই রক্ষণশীল সমাজের চাপেই। কেননা এসময় নারী শিক্ষাকে রক্ষণশীল সমাজ খুবই খারাপ চোখে দেখতো। তারা নারীকে পুরুষের চেয়ে সব দিক থেকে দুর্বল বলে মনে করতো। ইংরেজ আমলে এদেশে খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রচেষ্টায় নারী শিক্ষার ব্যবস্থা হলে রক্ষণশীল সমাজ নানা অপপ্রচারের মাধ্যমে এর বিরোধিতা করতে থাকে। এরকম পরিস্থিতিতে এদেশের অনেক নারীর লেখাপড়া শেখার ইচ্ছে থাকলেও রক্ষণশীল সমাজের ভয়ে তাদের সে ইচ্ছে ত্যাগ করতে হতো। কেননা সেসময় যে পরিবার রক্ষণশীল সমাজের বিরুদ্ধে গিয়ে কিছু করতে যেতো তাকেই একঘরে করে দেওয়া হতো। তাই রক্ষণশীল সমাজের অনুশাসনের ভয়ে অনেক নারী তাদের লেখাপড়া শেখার ইচ্ছে পরিবারকে জানাতে সাহস পায়নি। রাসসুন্দরী দাসীর কথায়—

> ''তখন আমার বয়ঃক্রম চোদ্দো বৎসর মাত্র। তখন আমার মনে মনে নিত্যন্ত চেষ্টা হইল যে, আমি লেখাপড়া শিখিয়া পুঁথি পড়িব। কিন্তু আমার অদৃষ্টক্রমে তখন মেয়েছেলে লেখাপড়া শিখিত না। তখনকার লোক বলিত, বুঝি কলিকাল উপস্থিত হইয়াছে দেখিতে পাই। এখন বুঝি মেয়েছেলেতেও পুরুষের কাজ করিবেক। ... এখন বুঝি সকল মাগিরা একত্র হইয়া লেখাপড়া শিখিবে।
>
> দশ পাঁচ জন এক স্থানে বসিয়া এই প্রকার আলাপ হইত। ওই সকল কথা শুনিয়া আমার অত্যন্ত ভয় হইত। আমার মনের কথা প্রকাশ করা দূরে থাকুক, কেহ জানিবে বলিয়া ভয়ে প্রাণ কাঁপিত।''[১৫]

উনিশ শতকের প্রথমদিকে নারীরা যাতে লেখাপড়া করতে না পারে সেজন্য রক্ষণশীল সমাজ নানা

উপায় অবলম্বন করেছিল। কেননা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ জানতো যে নারীরা লেখাপড়া শিখলে স্বাধীনভাবে চলতে পারবে, তাদের আর পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মতো পরাধীন করে রাখা যাবে না। তাই রক্ষণশীল সমাজ এক্ষেত্রে তাদের মোক্ষম চালটি চেলে দেয়— তারা প্রচার করতে থাকে লেখাপড়া শিখলে নারীরা *বিধবা হবে* তাদের *সর্বনাশ হবে*। কেননা রক্ষণশীল সমাজ জানতো যে, তখন এদেশের বেশিরভাগ মানুষই কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসে আচ্ছন্ন। ফলে এ অবস্থায় কোন ব্যক্তি বা পরিবার যদি জানতে পারে লেখাপড়া শিখলে নারীদের সমূহ সর্বনাশ হবে, তাহলে কোন ব্যক্তি বা পরিবারই তাদের মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতেচাইবে না। রাসসুন্দরী দাসী লিখেছেন—

> ''আমাদের সেকালেতে মেয়েছেলেদের লেখাপড়া শিক্ষা করা নিয়ম ছিল না। সেকালের লোকেরা বলিত 'এ আবার কি? মেয়েছেলে লেখাপড়া করিতেছে? মেয়েছেলে লেখাপড়া করা বড়ো দোষ। মেয়েছেলে লেখা শিখিলে সর্বনাশ হয়, মেয়েছেলের কাগজ কলম হাতে করিতে নাই।' এই প্রকার নিয়ম সর্বত্রই চলিত ছিল।''[১৬]

এভাবে নারীদের শিক্ষা নিয়ে রক্ষণশীল সমাজের অপপ্রচার নিয়ম হয়ে ওঠে। মিথ্যে বারবার প্রচারের মাধ্যমে যেমন সত্য হয়ে ওঠে, তেমনি রক্ষণশীল সমাজের অপপ্রচারও বারবার শুনতে শুনতে তখনকার মানুষ তা সত্য বলে মনে করেছিল।

উনিশ শতকের প্রথমদিকে এদেশের রক্ষণশীল সমাজ নারীরা যাতে লেখাপড়া শিখতে না পারে সেজন্য নারীদের সাংসারিক কাজকর্ম ও নানা দায়িত্বের বন্ধনে বন্দী করে রেখেছিল। আবার উনিশ শতকের প্রথম দিকে এদেশের সমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। ফলে অল্পবয়সেই এদেশের নারীদের বিয়ে হয়ে যেত— বাপের বাড়িতে তারা আর লেখাপড়ার সুযোগ পেতো না। আর অল্পবয়সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে শ্বশুরবাড়িতে নারীদের নানা রকম সাংসারিক কাজ করতে হতো এবং গুরুজনদের সেবা করা তাদের বাধ্যতামূলক ছিল। ফলে যেসময় মানুষের লেখাপড়া শেখার আদর্শ সময় সেই সময়ে এদেশের নারীরা সংসারের জাতাকলে পড়ে লেখাপড়া শেখার অবকাশ পেতো না। রাসসুন্দরী দাসীর ভাষায়—

> ''তখন মেয়েছেলেরা লেখাপড়া শিখিত না, সংসারে খাওয়াদাওয়ার কর্ম সারিয়া যে কিঞ্চিৎ অবকাশ থাকিত, তখন কর্তা ব্যক্তি যিনি থাকিতেন তাঁহার নিকট অতিশয় নম্রভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে হইত। যেন মেয়েছেলের গৃহকর্ম বই আর

কোনো কর্মই নাই। তখনকার লোকের মনের ভাব এইরূপ ছিল।”[১৭]

আর দীর্ঘদিন কোন বিষয়ে চর্চার অভ্যাস যদি আমাদের না থাকে তাহলে ধীরে ধীরে সে বিষয়ের প্রতি আগ্রহ আমরা হারিয়ে ফেলি। এভাবে উনিশ শতকের প্রথমদিকে অনেক নারী সামাজিক কাজকর্মের মধ্যে বন্দী থেকে লেখাপড়া শেখার আগ্রহই হারিয়ে ফেলেছিল। আবার অনেক সময় নারীদের উচ্চবিত্ত পরিবারে বিয়ে হলে সাংসারিক কাজকর্ম তেমন করতে হতো না— সাংসারিক কাজকর্মের জন্য বাড়িতে অনেক চাকরাণি ও বয়স্কা মহিলা থাকতো। তবে এমন পরিবারে নারীদের তেমন কাজ না থাকলেও রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের চাপে তাদেরও লেখাপড়া শেখানো হতো না। ফলে কোনরকম কাজ এবং লেখাপড়া না শেখার ফলে তাদের সময় কাটানোর মতো কিছু থাকতো না— তাদের জীবন একঘেয়ে হয়ে উঠতো। রাসসুন্দরী দাসী তাঁর শ্বশুরবাড়ির অন্তঃপুরের জীবন সম্পর্কে লিখেছেন—

> ‘‘আমাকে কেহ কোনো কাজ করিতে দিতেন না, আমি সকল দিবস নিরর্থক বসিয়া থাকিতাম, আর মনে মনে ভাবিতাম, আমি কী কাজ করিব। সংসারের সমুদয় কাজ তো চাকরানিতেই করে, ঘরের কাজে আমার শাশুড়ি ঠাকুরানি আছেন, তার উপরে চাকরানিও আছে। তখন মেয়েছেলেকে লেখাপড়া শিখাইত না। আমি কী কাজ করিব, কিছুই পাই না।”[১৮]

আবার উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এদেশের অনেক নারী শুধুমাত্র পুরুষতান্ত্রিক রক্ষণশীল সমাজের চাপে নয়, কখনো কখনো নারীদের চাপেও লেখাপড়া শিখতে পারেনি—এক্ষেত্রে নারীরাই নারীদের শত্রু হয়ে উঠেছিল। কেননা আমরা পূর্বেই বলেছি সেসময় বাল্যবিবাহের ফলে নারীদের অল্পবয়সেই বিয়ে হয়ে যেতো এবং তারা অল্পবয়সেই শ্বশুরবাড়ির অন্দরমহলের সাংসারিক কাজকর্মের মধ্যে বন্দী হয়ে যেতো— সেখানে পরিবারের বয়স্কা নারীদের অধীনেই তাদের থাকতে হতো, তাদের নানা ফায়-ফরমাস খেটে দিতে হতো। তখনকার দিনে বয়স্কা মহিলারা কমবয়সী মহিলাদের লেখাপড়া শেখার বাসনাকে খুবই খারাপ চোখে দেখত— এ এক অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব। কেননা রক্ষণশীল সমাজের চাপে পড়ে বয়স্কা নারীরা লেখাপড়া শিখতে পারেনি বলে তারা তাদের পরবর্তী প্রজন্মের নারীদেরও লেখাপড়া শিখতে দিতে চায় না। এই অদ্ভুত মনস্তত্ত্বের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে রাসসুন্দরী দাসীর লেখায়—

> ‘‘তখন ওই সংসারসমুদ্রে কাজে মগ্ন থাকাতে আমার দিবারাত্র কী প্রকার অবস্থায়

গত হইয়াছে, তাহা আমি কিছুমাত্র জানিতে পারি নাই। অনন্তর আমার মনের বাসনা প্রবল হইয়া উঠিল যে, আমি একান্ত লেখাপড়া শিখিয়া পুথি পড়িব। তখন আমি মনে মনে মনের উপর রাগ করিতে লাগিলাম। কী জ্বালা হইল, কোনো মেয়ে লেখাপড়া শিখে না, আমি কেমন করিয়া লেখাপড়া শিখিব, একি দায় উপস্থিত হইল। ... সকলেই ছেলেমেয়েকে বিদ্যায় বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তখনকার মেয়েছেলেগুলো নিতান্ত হতভাগা, প্রকৃত পশুর মধ্যে গণনা করিতে হইবেক। ... বাস্তবিক মেয়েছেলের হতে কাগজ দেখিলে সেটি ভারী বিরুদ্ধ কর্ম জ্ঞান করিয়া, বৃদ্ধা ঠাকুরানিরা অতিশয় অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন, অতএব আমি কেমন করিয়া লেখাপড়া শিখিব।"[১৯]

এভাবে নারীরা যাতে লেখাপড়া শিখতে না পারে— পুরুষতান্ত্রিক রক্ষণশীল সমাজের এই অভিপ্রায়কে পরোক্ষভাবে পরিপুষ্টি দান করেছিল বয়স্কা নারীরাই। আবার উনিশ শতকের প্রথমদিকে অধিকাংশ নারী অশিক্ষিতা থাকার আরেকটি কারণ হল তখন শিক্ষাকে অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হতো। আমরা জানি ইংরেজ আমলে ব্রিটিশ ভারতের উপনিবেশের কাজকর্ম পরিচালনা শুধুমাত্র স্বল্পসংখ্যক ইংরেজ কর্মচারী দিয়ে সম্ভব হচ্ছিল না— সেই অভাব পূরণের জন্য প্রয়োজন হয়েছিল প্রচুর সংখ্যক ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত দেশীয় কর্মচারী। তাই উনিশ শতকের প্রথমদিকে এদেশের অনেক পুরুষ ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ব্রিটিশ সরকারের অধীনে কাজ করেছিল। এভাবে অর্থনৈতিক কারণে উনিশ শতকের প্রথমদিকে এদেশের অনেক পুরুষ ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠেছিল। কেননা রক্ষণশীল সমাজের নিয়মানুসারে পুরুষদেরই অর্থ উপার্জনের কাজ করতে হতো, আর নারীদের সাংসারিক কাজ করতে হতো। তাই অর্থ উপার্জনের কারণে উনিশ শতকের প্রথম দিকে এদেশের অধিকাংশ পুরুষই শিক্ষিত হয়ে উঠেছিল। অপরদিকে নারীদের যেহেতু সাংসারিক কাজকর্ম করতে হতো সেহেতু তাদের অর্থ উপার্জনের প্রয়োজন ছিল না, আর নারীদের অর্থ উপার্জনের প্রয়োজন না থাকায় তাদের লেখাপড়া শেখার প্রয়োজন মনে করেনি রক্ষণশীল সমাজ। রাসসুন্দরী দাসী লিখেছেন—

"বাস্তবিক সেকালের লোক এখন পর্যন্ত যাঁহারা আছেন, তাঁহাদিগের নিকট মেয়েছেলের বিদ্যাশিক্ষা ভারী মন্দ কর্ম বলিয়া বোধ হয়। তাঁহারা বলিয়া থাকেন লেখাপড়া শিখিয়া কি টাকা রোজগার করিয়া আনিবে? এখনকার মেয়েগুলো

লেখাপড়া শিখিব বলিয়া পাগল হয়। মেয়েছেলে ঘরের মধ্যে কাজকর্ম করিবে, রান্নাবান্না করিবে, লজ্জা-শরম করিবে, আমরা ইহাই জানি। আমাদের কালে আর এত বালাই ছিল না।"[২০]

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে এদেশের কিছু শিক্ষিত প্রগতিশীল মানুষ নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। সেসময় খ্রিস্টান মিশনারিরা নারী শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। যেসকল প্রগতিশীল ব্যক্তি নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন তাঁরা কিন্তু খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়গুলিতে তাঁদের মেয়েদের, বউদের শিক্ষার জন্য পাঠাননি। কেননা সেসময় রক্ষণশীল সমাজে নারী শিক্ষা নিষিদ্ধ ছিল, আর এরকম পরিস্থিতিতে কোন ব্যক্তি যদি রক্ষণশীল সমাজের বিরুদ্ধে গিয়ে বিধর্মী খ্রিস্টান মিশনারিদের স্কুলে তাঁর বাড়ির মেয়েকে, বউকে শিক্ষার জন্যে পাঠান তাহলে তাঁকে রক্ষণশীল সমাজ এক ঘরে করে দিতো। এই ভয়ে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে অনেক প্রগতিশীল ব্যক্তি যাঁরা নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন তাঁরা তাঁদের মেয়েদের, বউদের গৃহেই প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। যেমন সারদাসুন্দরী দেবীর স্বামী বিয়ের পর বাড়িতেই সারদাসুন্দরীর লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। সারদাসুন্দরী দেবীর কথায়—

"পূর্বে বলিয়াছি, তখনকার মেয়েদের আজকালের মেয়েদের মতন লেখাপড়া শিখিবার এমন সুবিধা ছিল না, শিখিতে চাহিতও না। কিন্তু আমার স্বামীর মত এই বিষয়ে সকল অপেক্ষা উন্নত ছিল। তিনি একান্ত ইচ্ছা করিতেন যে, আমি লেখাপড়া করি। অন্যত্র শিখিবার কোনো সুবিধা ছিল না বলিয়া তিনি নিজেই আমায় রাত্রিতে পড়াইতেন। তাঁহার হাতের অক্ষর অত্যন্ত সুন্দর ছিল, তিনি নিজে লিখিয়া আমায় সেই রকম করিয়া লিখিতে বলিতেন। আমিও চেষ্টা করিতাম। ... অনেক দিন লিখি নাই বলিয়া আমি লিখিতে পারি না, কিন্তু পড়িতে পারি।"[২১]

আবার অনেক সময় কিছু প্রগতিশীল ভদ্রলোক নিজেরা তাঁদের মেয়ে-বউদের না পড়িয়ে গৃহশিক্ষক বা গৃহশিক্ষিকা রেখে মেয়ে-বউদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেসময় এদেশের অধিকাংশ নারী অশিক্ষিতা থাকায় গৃহশিক্ষিকার কাজ করতেন ইংরেজ নারীরাই। কৈলাসবাসিনী দেবী মিস টুগোড নামে এক ইংরেজ নারীর কাছে বাড়িতে লেখাপড়া শিখেছিলেন। আবার প্রসন্নময়ী দেবীও বাড়িতে এক ইংরেজ খ্রিস্টান মিশনারি নারীর কাছে লেখাপড়া শিখেছিলেন। তবে খ্রিস্টান মিশনারি

ইংরেজ নারীরা সেসময় যে শিক্ষা দিতো তার অধিকাংশই যে খ্রিস্টান ধর্মের মিহমা বিষয়ক এবং তার মূলে যে এদেশের মানুষকে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করার একটা সুপ্ত বাসনা ছিল— তা প্রসন্নময়ী দেবীর লেখা থেকে সহজেই অনুমেয়—

> ''আমাদিগের দুর্ভাগ্যবশত পিতৃদেবকে আবার মেহেরপুর সাবডিভিশানে বদলি করা হইল ও আমার পাঠের সাহায্যার্থে মিশনারি মেম নিযুক্ত করিয়া দিলেন। তাঁহাদিগের ইংরেজি পাঠ অধিকাংশই বাইবেল হইতে ও যিশু ভজনার নিগূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা।''[২২]

আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি যে, ১৮৪৯ সালের ৭ মে বেথুন সাহেবের প্রচেষ্টায় *ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল* (পরবর্তীকালে বেথুন স্কুল নামে পরিচিত) প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এদেশে প্রকৃত নারী শিক্ষার সূচনা হয়। তবে এই *ক্যালকাটা ফিমেল স্কুলের* যাত্রার শুভ সূচনা হয়নি। কেননা হিন্দু রক্ষণশীল সমাজ এই স্কুলে নারীদের লেখাপড়া শেখার বিষয়টিকে ভালো চোখে দেখেনি। তাই রক্ষণশীল সমাজ আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল নারী শিক্ষা বিরোধী নানা কুসংস্কারকে কাজে লাগিয়ে সামাজিক চাপ সৃষ্টি করে এদেশের নারীদের বেথুন স্কুলে যাওয়া বন্ধ করার জন্যে। এভাবে নানা সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পর উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যখন নারীদের প্রাথমিক শিক্ষা এদেশের সমাজে মোটামুটিভাবে স্বীকৃত হয় তখনও কিন্তু হিন্দু রক্ষণশীল সমাজ চেয়েছিল নারীরা যাতে লেখাপড়া শিখতে না পারে। তাই তখন রক্ষণশীল সমাজ এদেশের নারীরা যাতে লেখাপড়া শিখতে সাহস না পায় সেজন্য এদেশের কুসংস্কারের ঐতিহ্যকে কাজে লাগিয়ে প্রচার করতে থাকল লেখাপড়া শিখলে নারীরা বিধবা হবে। কিন্তু রক্ষণশীল সমাজের এসব ষড়যন্ত্রকে উপেক্ষা করে অনেকেই তাঁদের মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। সুদক্ষিণা সেন *জীবন স্মৃতি*-তে জানিয়েছেন, তাঁর মা নারী শিক্ষা বিরোধী এসব সামাজিক অপপ্রচারকে উপেক্ষা করে তাঁকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। এভাবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রক্ষণশীলদের নারী শিক্ষা বিরোধী অপপ্রচার যখন সেভাবে ফলপ্রসূ হল না তখন অনেকেই তাঁদের বাড়ির মেয়ে, বোন, বউদের বেথুন স্কুলে লেখাপড়া শেখানোর জন্য পাঠাতে শুরু করেছিলেন। শরৎকুমারী দেব এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> ''এখানে কবিরাজি চিকিৎসা চলিতে লাগিল, শ্বশুর মহাশয় এখানে আসিয়া নির্মলাকে Miss Niel-এর স্কুলে দিলেন, ইতিপূর্বে সে দুকড়ি বাবুর বাড়ি থাকিয়া জীবন বালার সহিত বেথুন স্কুলে পড়িত।''[২৩]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও রক্ষণশীল সমাজ নারী শিক্ষার বিরোধিতা করতে থাকলে এবং ব্রাহ্মসমাজ পৃথকভাবে নারী শিক্ষার ব্যবস্থা করলে বেথুন স্কুল কর্তৃপক্ষ ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য নানা রকম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। তারা এদেশের নারীদের শিক্ষাদানের জন্য একদিকে যেমন শিক্ষিকা নিয়োগ করেছিল, অন্যদিকে তেমনি সেই সকল শিক্ষিকাকে শিক্ষাদানের পাশাপাশি অবসর সময়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে অভিভাবকদের বুঝিয়ে তাদের বাড়ির মেয়ে-বউদের যাতে বেথুন স্কুলে ভর্তি করা হয়, সে বিষয়ে উৎসাহিত করার জন্য নিয়োগ করেছিল। বেথুন স্কুল কর্তৃপক্ষের এই পরিকল্পনার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে সুদক্ষিণা সেনের লেখায়—

> ''বেথুন স্কুলের মেমসাহেব আমাদের ব্রাহ্মসমাজে আগমনবার্তা পাইয়া আমাদের বাটীতে একদিন আসিয়া মাতৃদেবীকে ধরিলেন, মেয়েদের বেথুনে দিতে হইবে। তিনি মা'কে বলিলেন, ''কেশবের স্কুলে দিও না, আমার স্কুলে দাও।'' ... তিনি মাতৃদেবীকেই একটি বৃত্তি দিয়া বেথুনে টানিয়া লইয়া গেলেন। মাতৃদেবী দশটার সময় অল্প হবিষ্যান্ন আহার করিয়া বাস (bus)-এ চড়িতেন এবং অনেক মেয়েদের বাড়ি ঘুরিয়া বেথুনে যাইতেন।''[২৪]

এভাবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বেথুন স্কুল এদেশে নারী শিক্ষা বিস্তারের জন্য নানারকম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল এবং তার ফলে নারীদের প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সমাজের প্রায় সকল স্তরের মানুষ অনুভব করেছিল ও তাদের বাড়ির মেয়ে-বউদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিল।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও এদেশে অনেক বালবিধবা নারীর সন্ধান পাওয়া যায় এবং তখনও বিধবা নারীর বিবাহ সমাজে স্বীকৃত না হওয়ায় অনেক বালবিধবা নারী ঈশ্বর সেবার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করার পথ বেছে নেয়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আমরা দেখি অনেক বালবিধবা নারী বৈষ্ণবী হয়ে যায় এবং বৈষ্ণবদের আকরগ্রন্থগুলি পাঠের মাধ্যমে ভগবানের স্বরূপ জানার জন্য তারা গুরুদেবের কাছে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে। এভাবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এদেশে অনেক শিক্ষিতা বৈষ্ণবীর সন্ধান আমরা পেয়ে যাই। এইসকল বৈষ্ণবী ধর্মের প্রয়োজনে শিক্ষা গ্রহণ করায় রক্ষণশীল সমাজে সেজন্য কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। প্রসন্নময়ী দেবী *পূর্ব্বকথা* গ্রন্থে জানিয়েছেন, তাঁদের গ্রামে কাশীশ্বরী নামে একজন নারী অল্প বয়সেই বিধবা হয়েছিলেন এবং তিনি পিতৃমাতৃহীনা ছিলেন বলে বাকি জীবনটা ঈশ্বর সাধনার মধ্য দিয়ে কাটানোর জন্য বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। কাশীশ্বরী মন্ত্রদাতা ইষ্ট গুরুদেবের কাছে লেখাপড়া শিখে *রামায়ণ*, *মহাভারত*,

বৈষ্ণব পদাবলী, *চৈতন্যচরিতামৃত* প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করতেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এদেশে অনেক বৈষ্ণবী নারী যে শিক্ষিতা হয়েছিলেন সেই ইতিহাসের প্রমাণ আমরা প্রসন্নময়ী দেবীর লেখা থেকে পেয়ে যাই।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কিছু প্রগতিশীল শিক্ষিত ভদ্রলোক নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে বাড়িতেই নারী শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অনেক প্রগতিশীল শিক্ষিত ভদ্রলোক নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে বাড়িতে নারী শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় উনিশ শতকের প্রথমার্ধের তুলনায় দ্বিতীয়ার্ধে বাড়িতে নারী শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রগতিশীল ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কেননা উনিশ শতকের প্রথমার্ধের তুলনায় দ্বিতীয়ার্ধে নারী শিক্ষা বিষয়ে রক্ষণশীলদের প্রতিবন্ধকতা কিছুটা হলেও হ্রাস পেয়েছে, তবে পুরোপুরি হ্রাস পায়নি বলেই উনিশ শতকের প্রথমার্ধের মতো দ্বিতীয়ার্ধেও কিন্তু নারীদের শিক্ষিতা করার জন্য প্রগতিশীল শিক্ষিত ভদ্রলোকদের বাড়িতেই নারী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অনেক শিক্ষিত প্রগতিশীল ব্যক্তি তাঁদের স্ত্রীকে নিজেদের উপযোগী করে তুলতে চেয়েছিলেন এবং এক্ষেত্রে তাঁদের স্ত্রী যেন নিজের হাতে তাঁদের পত্র লিখতে পারে— সেজন্যও অনেকেই তাঁদের স্ত্রীকে প্রাথমিক শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। সুদক্ষিণা সেনের বাবা জগবন্ধু গঙ্গোপাধ্যায় চেয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী নিত্যকালী সেন লেখাপড়া শিখে তাঁকে পত্র লেখেন। সুদক্ষিণা সেনের কথায়—

> ‘‘মাতৃদেবী লেখাপড়া শিখিয়া তাঁহার নিকট চিঠিপত্র লিখেন, ইহা তাঁহার একান্ত বাসনা ছিল। ... আমার মাতুল মহাশয় অ, আ, ক, খ হইতে শিখাইতে আরম্ভ করিয়া এক মাসের মধ্যে আমার মাকে দিয়া বাবার নিটক পত্র লিখাইয়াছিলেন। তাহাতে বাবা কীরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।’’[২৫]

আবার উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অনেক প্রগতিশীল শিক্ষিত ব্যক্তি নিজেরাই গৃহে মেয়েদের শিক্ষা দিতেন। যেমন কামিনী রায় *শ্রাদ্ধিকী* গ্রন্থে জানিয়েছেন, তাঁর বাবা চণ্ডীচরণ সেন বাড়িতেই তাঁকে সাহিত্য, ব্যাকরণ, পাটিগণিত, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। আবার অনেক প্রগতিশীল ব্যক্তি অনেক সময় গৃহশিক্ষক রেখে তাঁদের মেয়েদের শিক্ষা দিতেন। তবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যাঁরা নারীদের গৃহেও শিক্ষা দিতে চাইতেন না এবং বালিকা বিদ্যালয়েও পাঠাতে চাইতেন না তাঁরা হয় গরিব, নয়তো রক্ষণশীল। নিস্তারিণী দেবীর ভাষায়—

''মেয়েকে ঘরে পড়াতে যে পারে না, সে হয় অকাট মূর্খ, নয় বড্ড গরিব।''[২৬]

কেননা গরিব মানুষের পক্ষে গৃহশিক্ষক রেখে মেয়েদের পড়ানো ব্যয়বহুল হওয়ায় তাঁরা মেয়েদের গৃহে পড়াতে পারতেন না, অপরদিকে যাঁরা উচ্চিবিত্ত হয়ে মেয়েদের গৃহেও লেখাপড়া শেখাতে চাইতেন না, তাঁরা রক্ষণশীল— নানা সামাজিক কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। আবার উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এদেশের বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকায় অনেক নারীর অল্পবয়সে বিয়ে হয়ে যেতো— স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা পিতৃগৃহে প্রায় লেখাপড়ার সুযোগ পেতেন না। সেজন্য এসময় অনেক প্রগতিশীল শিক্ষিত ভদ্রলোক বিয়ের পরও তাঁদের বাড়ির বউরা গৃহেই যাতে লেখাপড়া করতে পারে, সে ব্যবস্থা করেছিলেন। শরৎকুমারী দেব বিয়ের পর শ্বশুরের কাছে লেখাপড়া শিখেছিলেন। এ প্রসঙ্গে শরৎকুমারী দেব *আমার সংসার* গ্রন্থে লিখেছেন—

> ''ওই ওখানে বসিয়া শ্বশুর মহাশয় আমার পাঠ বলিয়া দিতেন, হস্তাক্ষর সংশোধন করিতেন, কি কোমলভাবে অধ্যাপনা করিতেন তাহা বুঝাইবার নহে। তিনি পড়াইতে গেলে Geometry পড়াইতে বসিতেন তাহা আমার ভালো লাগিত না, মুখস্থ হইত না। শ্বশুর মহাশয় ইংরেজি ধর্মপুস্তকের কিছু কিছু পড়াইতেন ও ব্যাখ্যা করাইয়া বুঝাইতেন, সেগুলি আজও কণ্ঠস্থ হইয়া রহিয়াছে।''[২৭]

আবার এসময় অনেক শিক্ষিত প্রগতিশীল ব্যক্তি তাঁদের ছেলে-মেয়েদের শৈশবে গৃহে একত্রে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। গৃহে এই প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় মেয়েরা ছেলেদের সমকক্ষ থাকলেও পরবর্তীকালে যখন তাদের স্কুলে ভর্তি করার বয়স হতো তখন প্রগতিশীল ব্যক্তিরা তাঁদের ছেলেদের স্কুলে ভর্তি করাতে পারলেও মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করাতে পারতেন না রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের চাপে। কেননা তখন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ মেয়েদের পর্দাপ্রথাকে কঠোরভাবে মেনে চলতো— তারা কোনভাবেই চাইতো না মেয়েরা অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে গিয়ে পড়াশোনা করুক। তাই প্রগতিশীল ব্যক্তিরা তাঁদের মেয়েদের মেধাশক্তির পরিচয় পেয়েও শুধুমাত্র রক্ষণশীল সমাজের চাপে মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে পারতেন না। এভাবে বাড়িতে নারীদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা হলেও তাদের লেখাপড়া শেখা বেশিদূর অগ্রসর হতে পারতো না। তাই আমরা দেখি প্রসন্নময়ী দেবী বাল্যকালে গৃহে ভাইয়ের সঙ্গে লেখাপড়া শিখেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর ভাই স্কুলে ভর্তি হলেও তিনি স্কুলে ভর্তি হতে পারেননি। প্রসন্নময়ী দেবী *পূর্ব্বকথা* গ্রন্থে লিখেছেন—

> ''বনগ্রামে আমাদিগের রীতিমতন লেখাপড়া আরম্ভ হইল। পিতৃদেব স্বয়ং গুরু ও আমরা সব শিষ্য। প্রাতে স্কুল বসিত, সায়াহ্নে পড়া দিতে হইত এবং তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিশীল আশু সর্ব্বোপরি থাকায় আমরা একটু ভীত থাকিতাম। ... গদ্য পদ্য ভূগোল ইতিহাস ও লোহারাম শিরোমণির ব্যাকরণ সকল বিষয়ে তাহার সমকক্ষ ছিলাম, কেবল অঙ্কে নীচে থাকিতাম ও পরে ত্রৈরাশিক পর্যন্ত উঠিয়া সেইখানেই বিদ্যা থামিয়া গেল। ইংরেজি তখনও পড়িতাম না। আশু স্কুলে ভরতি হইয়া নিয়মমতো অধ্যয়ন করিতে লাগিল। আমি গৃহের পাঠশালেই তেমনি রহিয়া গেলাম।''[২৮]

এভাবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অনেক প্রগতিশীল ব্যক্তি কখনো বাড়িতে নিজেরাই, কখনো গৃহশিক্ষকের দ্বারা, আবার কখনো বাড়িতেই বালিকা বিদ্যালয় তৈরি করে বাড়ির মেয়ে-বোন-বউদের শিক্ষা দিতেন। কিন্তু রক্ষণশীল সমাজ বালিকা বিদ্যালয় নির্মাণ করে প্রগতিশীল ব্যক্তিদের নারী শিক্ষার ব্যাপারটিকে মেনে নিতে পারেনি। তাই এ নিয়ে নানা সামাজিক প্রতিক্রিয়া দেখা গেল—রক্ষণশীলদের অনেকেই নানা কুসংস্কার এবং সেসময়ে নারীদের সামাজিক অবস্থানের দোহাই দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করল নারী শিক্ষার প্রয়োজন নেই। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও যে নারী শিক্ষাকে অনেকেই ভালোভাবে নেয়নি, এধরনের সামাজিক প্রতিক্রিয়া তারই সাক্ষ্য বহন করে। তবে রক্ষণশীলরা যে নারী শিক্ষার বিরোধিতায় এ সময় ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল তার প্রমাণ পাই আমরা সুদক্ষিণা সেনের লেখায়। তিনি বলেছেন, তাঁর মাতুলালয় সোহাগদল গ্রামে যখন নারী শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় তৈরি হয় তখন রক্ষণশীল সমাজ নানাভাবে তার বিরোধিতা করেছিল। তবে শেষপর্যন্ত রক্ষণশীল সমাজের সকল বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে সেই বিদ্যালয়ে ক্রমশ ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। সুদক্ষিণা সেনের কথায়—

> ''আমার মাতুল (সোনাদিদির পুত্র) কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়, তদ্‌বন্ধু হরিমোহন দত্ত মহাশয় এবং আরও দুই একজন গ্রামের ভদ্রলোক দু-চারিটি বালিকা সংগ্রহ করিয়া একটি পাঠশালা খুলিলেন। ... আমাদের বহির্বাটীতে একটি আটচালা গৃহ প্রস্তুত হইল। ... এই স্কুলে প্রভাতে মেয়েদের ক্লাস হইত, এবং দশটার পরে বালকদিগের স্কুল হইত। কিন্তু দেশের 'কুসংস্কার' ত' মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষার দ্বারা দেশকে 'উচ্ছন্নে যাইতে' দিতে পারে না। কাজেই মেয়েদের স্কুলে পড়া

লইয়া গ্রামে হুলস্থূল বাঁধিয়া গেল। কেহ বলিতে লাগিলেন, ''মেয়েরা লেখাপড়া শিখিলে বিধবা হইবে।" কেহ বা বলিলেন, ''মেয়েরা লেখাপড়া শিখিয়া কি চাকরি করিবে?" ... একদিকে বচনবাগীশদিগের বচনের প্রকটতা যেমন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, অপরদিকে দুই একটি করিয়া বালিকার সংখ্যা বর্দ্ধিতই হইতে লাগিল।"[২৯]

বস্তুত এসময় থেকেই এদেশের জনগণের একটা বড় অংশ নারীদের প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিয়েছিল।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যখন নারীদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাজে মোটামুটিভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে তখনও নারীদের প্রথমে বাড়িতে মা বা মাতৃস্থানীয়া ব্যক্তির কাছে গৃহকর্ম বা সাংসারিক কর্মের শিক্ষা লাভ করতে হতো। কেননা তখন অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যেতো এবং বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে সাংসারিক কাজ করতে হতো, আর শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে সাংসারিক কর্ম করতে মেয়েদের যাতে অসুবিধে না হয়, সেজন্য এরকম ব্যবস্থা ছিল। এভাবে মেয়েরা যখন গৃহকর্মের শিক্ষা লাভ করতো তারপরে তাদের লেখাপড়া শেখার সুযোগ মিলত, তাও আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেয়েদের অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করার সুযোগ দেওয়া হতো না— তাদের বাড়িতেই কখনো গৃহশিক্ষকের কাছে, আবার কখনো পিতা বা পিতৃস্থানীয় ব্যক্তির কাছে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হতো। ইন্দিরা দেবী বাল্যকালে মায়ের কাছে সাংসারিক কাজে শিক্ষা লাভ করার পর পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেছিলেন—

''তখন আমি ও দাদা আর আমাদের দুটি ভাই হইয়াছিল। সেই সময় হইতে মা আমায় গৃহকর্ম শিক্ষা দিতেন। ... ছয় মাসে সমস্ত গৃহকর্ম শিক্ষা দিয়া পড়িবার জন্য অবসর দিলেন। একদিন বৈকালে আমাদের সেই এঁড়ে দহস্থ বাগানের পণ্ডিতমহাশয় অনেক অনুসন্ধান করিয়া আমাদের বাড়ি আসিলেন। ... ওই সময় আমি বাংলা ব্যাকরণ, সীতার বনবাস, মেঘনাদবধ কাব্য প্রভৃতি পড়িতাম। ওই সময় হইতে আমি কাব্য পাঠ করিয়া কিছু কিছু রসবোধ করিবার শক্তি লাভ করিয়াছিলাম।"[৩০]

এভাবে নারীদের গৃহেই শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাদের গৃহের বাইরে পাঠশালায় পাঠানো হতো না লেখাপড়া করার জন্য। কেননা তখন বালকদের সঙ্গে এক সঙ্গে বসে বালিকাদের শিক্ষা

গ্রহণের বিষয়টি সমাজে স্বীকৃতি পায়নি। এসময় নারীরা গৃহে যেমন মায়ের কাছে সাংসারিক কাজের শিক্ষা লাভ করতো, তেমনি গৃহে তাদের যে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেখানেও তাদের প্রাথমিক লেখাপড়া শেখানোর পাশাপাশি গৃহকর্ম বা সাংসারিক কর্মের শিক্ষা দেওয়া হতো। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও নারীদের সাংসারিক কর্মের শিক্ষাকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রসন্নময়ী দেবী বলেছেন—

> ''আমরা কেবলমাত্র প্রাতে একবার তালপত্রে লেখা শিখিতাম ও দাতা কর্ণের উপাখ্যান প্রভৃতি পড়িতাম। তাহার পর সমস্ত সময় গৃহকার্য শিক্ষা দেওয়া হইত। সর্ব্বাগ্রে শিব গড়ানো ও দেবার্চ্চনার আয়োজন সব নির্ভুলভাবে শিখাইতেন। ক্রমে রন্ধন ও পরিবেশ এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকার্যও শিক্ষা হইত।''[৩১]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এভাবে প্রগতিশীল পরিবার নারীদের গৃহে যে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিল, তা থেকে আমরা দেখলাম সেখানে নারীদের সাংসারিক কর্মের শিক্ষাকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে— যা বৈবাহিক জীবনে নারীদের কাজে লাগবে। আবার এসময় প্রগতিশীল শিক্ষিত ব্যক্তিরা গৃহে যে নারী শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন তার আরও উদ্দেশ্য আছে— সেই উদ্দেশ্য আমরা বুঝতে পারব যদি এ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থায় নারীদের যে শিক্ষা দেওয়া হতো তার পাঠ্য বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিই। এক্ষেত্রে আমরা দেখব এ সময় নারীদের বর্ণপরিচয়, ব্যাকরণ ও গৃহকর্মের শিক্ষার পাশাপাশি এমন সব বই পড়ানো হতো, যাতে তাদের নৈতিক শিক্ষা হয় অর্থাৎ বিবাহিত জীবনে তারা যেন স্বামীর সঙ্গে সতী সাবিত্রী হয়ে সংসার করতে পারে। মানকুমারী বসু *আমার অতীত জীবন* গ্রন্থে তাঁর দাদার নৈতিক শিক্ষাদানের বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন—

> ''আমার দাদা স্ত্রী-শিক্ষার অনুরাগী ছিলেন। তখন তিনি আমাদের মাতুলালয়স্থ এনট্রান্স স্কুলের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন এবং মাতুল মহাশয়দিগের নিকট হইতে জমিদারী কার্যকলাপ শিক্ষা করিতেন। ... তিনি আমার ভ্রাতৃজায়াকে নারী-শিক্ষা, সুশীলার উপাখ্যান, গৃহকর্ম, কুমুদিনী চরিত, স্ত্রীর প্রতি উপদেশ প্রভৃতি পুস্তক পাঠাইয়া দিতেন। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া ও অন্যান্য সমবয়স্কাগণ সেইসকল পুস্তক পাঠ করিতেন।''[৩২]

আবার মানকুমারী বসু তাঁর পিতার কাছ থেকে *রামায়ণ, মহাভারত* প্রভৃতি গ্রন্থের শিক্ষা নিয়েছিলেন। ইন্দিরা দেবী *আমার খাতা* গ্রন্থে জানিয়েছেন, তিনিও *রামায়ণ, মহাভারত, সুশীলার উপাখ্যান*

প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করেছিলেন। এভাবে প্রগতিশীল ব্যক্তিরা বাড়িতে তাঁদের মেয়েদের নৈতিক বা চরিত্রগঠনের শিক্ষাও দিয়েছিলেন— তাঁদের মেয়েরা বিবাহিত জীবনে যেন আদর্শ স্ত্রী ও আদর্শ জননী হতে পারে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এদেশের নারী শিক্ষার বিকাশে কিছু সাময়িক পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। কেননা এসব পত্রিকায় একদিকে যেমন নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল তেমনি সেসময় শিক্ষিতা নারীর দৃষ্টান্ত তৈরির জন্য এসব পত্রিকা শুধু নারীদের লেখাই প্রকাশ করতো। স্বাভাবিকভাবেই উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যখন কিছু সংখ্যক নারী শিক্ষিতা হয়ে তাঁদের লেখা সাহিত্যকে এসব পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রেরণ করতো তখন সঙ্গে সঙ্গেই এই সব পত্রিকা নারীদের লেখা প্রকাশ করতো। এসব দেখে অনুপ্রেরণা লাভ করে আবার অনেক শিক্ষিতা নারীও চেষ্টা করতো সাহিত্য সৃষ্টির। যেমন— *বামাবোধিনী পত্রিকা* সম্পর্কে বলতে গিয়ে মানকুমারী বসু লিখেছেন—

> ''আমার সধবা ভ্রাতৃজায়া 'বামাবোধিনী'র গ্রাহিকা ছিলেন। উক্ত পত্রিকায় বামা রচনা দেখিয়া তাঁহারাও গদ্য-পদ্য রচনা করিতেন। এইসব দেখিয়া আমারও 'রচনা' করিতে মনে মনে বড়োই ইচ্ছা হইত।''[৩৩]

এসব পত্রিকায় যখন অনেক নারী তাঁদের সৃষ্টিকে প্রকাশ করতে থাকেন তখন তা প্রত্যক্ষ করে এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং নারীদেরও যে প্রতিভা আছে, তা উপলব্ধি করে তাঁরা নিজেদের ঘরের মেয়ে-বউকেও শিক্ষিত করে তোলার জন্য প্রেরণা লাভ করেন। এভাবে এসব সাময়িক পত্রিকায় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অনেক মহিলা গ্রন্থকারের আবির্ভাবে জনসাধারণের নারী শিক্ষা বিষয়ে কঠোর মনোভাব অনেকটা কোমল হয় এবং এদেশের অনেক নারী শিক্ষিতা হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে যান। এভাবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকাগুলিও নারী শিক্ষার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এদেশের শুধু নারীরা নয়, অনেক ধনবান পুরুষও ছিল অশিক্ষিত, আর এর কারণ অনুসন্ধান করতে হলে আমাদের কিছুটা ইতিহাসের শরণাপন্ন হতে হবে। আমরা জানি, নবাবি আমলে একমাত্র ধনী ও শিক্ষিত ব্যক্তিদেরই *বাবু* উপাধি প্রদান করা হতো। কিন্তু এদেশে ইংরেজ আমল শুরু হলে *বাবু*-এর সংজ্ঞাটাই পাল্টে যায়। অষ্টাদশ শতকের একেবারে শেষদিকে (২২মার্চ, ১৭৯৩খ্রি.) লর্ড কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন— এটি ছিল

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সরকার ও বাংলার ভূমি মালিকদের মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি স্থায়ী চুক্তি। এই চুক্তিতে জমিদারদের উপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় ভূ-সম্পত্তির একচ্ছত্র স্বত্বাধিকার প্রদান করা হয়। এই চুক্তির সুবিধা হল জমিদারদের সরকারের কাছে প্রদত্ত রাজস্বের পরিমাণ স্থায়ী করে দেওয়া হয়, তবে জমিদাররা প্রজাদের কাছ থেকে ইচ্ছে মতো খাজনা আদায় করতে পারতো এবং খাজনার পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করতে পারতো, আর জমির স্বত্বাধিকার উত্তরাধিকার সূত্রে তাদের বংশধররাই ভোগ করতে পারতো। ফলে ইংরেজ আমলে উনিশ শতকের প্রথমদিকে এদেশের একদল ধনী সম্প্রদায় সরকারের কাছ থেকে লাভজনক ব্যবসা জমিদারি ক্রয় করে এবং ব্যবসার মাধ্যমে প্রচুর অর্থের মালিক হয়ে উঠেছিল। এভাবে এদের হাতে প্রচুর অর্থ থাকায় এবং হাতে তেমন কোন কাজ না থাকায় এরা ভোগবিলাসকেই জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলে মনে করেছিল। বেশিরভাগ দিনই তারা বাঈজি বাড়িতে রাত কাটিয়ে মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান করতো। ফলে এদের সন্তানরা সুশাসন না পেয়ে এবং উত্তরাধিকার সূত্রে জমিদারি থাকার ফলে প্রচুর অর্থ থাকায় শিক্ষাকে তেমনভাবে গুরুত্ব দেয়নি— পিতার ভোগবিলাসকে দেখে স্বাভাবিকভাবে তারাও সেই লোভনীয় পথকেই বেছে নিয়েছিল। এভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার ফলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এক শ্রেণীর ধনবান মানুষ অশিক্ষিত হয়ে উঠেছিল। ইংরেজ আমলে এধরনের অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত, আদর্শহীন, ধনবান পুরুষদের বলা হতো *বাবু*। ফলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শুধু অধিকাংশ নারীই নয়, অনেক ধনবান পুরুষও অশিক্ষিত ছিল। ফলে এসময় যে কয়েকজন নারী নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও শিক্ষিতা হয়েছিলেন তাদের জন্য ধনবান ও শিক্ষিত উপযুক্ত পাত্রের অভাব দেখা দেয়। কেননা তখন অনেক উচ্চবিত্ত শিক্ষিত পরিবার তাদের মেয়েদের ধনবান ও শিক্ষিত পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিতে চাইতো। কিন্তু প্রায় অধিকাংশ ধনবান পুরুষ এ সময় অশিক্ষিত হওয়ায় নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে তাও একটা বড় সমস্যারূপে দেখা দেয়। ধনবান ও অশিক্ষিত পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চাইলে মেয়েকেও বেশি শিক্ষা দেওয়া যাবে না। কেননা তাহলে ধনবান পাত্র হাতছাড়া হয়ে যাবে, মেয়ের সমান শিক্ষিত না হওয়ার জন্যে। সেজন্য এসময় অনেকেই তাদের মেয়েদের বেশিদূর শিক্ষিত করতে সাহস পায়নি। এভাবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে একদিকে রক্ষণশীল সমাজের প্রতিবন্ধকতা এবং অন্যদিকে শিক্ষিত ধনবান পাত্রের অভাবে অনেক উচ্চবিত্ত পরিবারের মেয়েদের শিক্ষাগ্রহণ বন্ধ হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে সুদক্ষিণা সেন *জীবন স্মৃতি* গ্রন্থে বলেছেন—

''আমরা যখন মধ্যে মধ্যে মাতার সহিত মাইজপাড়া যাইতাম, আমার ঠাকুরদাদার মামা, বিখ্যাত জমিদার তারাপ্রসাদ রায় আমাদের বাড়িতে আসিয়া মাতৃদেবীকে ডাকিয়া বলিতেন, ''মেয়েদের তো লেখাপড়া শিখাইতেছ, কিন্তু আমি তো চক্ষু বুজিয়া কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।'' অর্থাৎ— ইহাদের উপযুক্ত পাত্র কোথায় পাইবে। মাতৃদেবী ইহা শ্রবণে ভীতা হইতেন, পাছে তিনি আদেশ করেন মেয়েদের লেখাপড়া শিখাইবার প্রয়োজন নাই, অথবা মেয়েদের এখনই বিবাহ দিতে হইবে। তিনি আদেশ করিলে তাহা অমান্য করা মাতৃদেবীর সাধ্যাতীত হইত।''[৩৪]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও এদেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকায় অধিকাংশ নারীরই অল্পবয়সে বিয়ে হয়ে যেতো। ফলে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে সাংসারিক কাজকর্মের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে এদেশের অধিকাংশ নারীদের লেখাপড়া শেখা প্রায় বন্ধ হয়ে যেতো। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, এসময় নারীদের শিক্ষার জন্যে অনেক বালিকা বিদ্যালয় তৈরি হলেও রক্ষণশীল সমাজ তখনও নারীদের অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শেখাকে ভালোভাবে নেয়নি। তাই এসব প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে নারীদের শিক্ষার সুযোগ এসময় একপ্রকার বন্ধ হয়ে যায়। ফলে এসময় কেশবচন্দ্র সেন ও ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য সদস্যরা এসমস্ত প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে নারী শিক্ষার জন্য *ব্রাহ্মবন্ধু সভা*-র উদ্যোগে *অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা* নামে এক নতুন শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। এ পদ্ধতিতে অল্পবয়সী বিবাহিতা নারীদের ও বয়স্কা নারীদের জন্যে গৃহেই প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এই শিক্ষা পদ্ধতিতে ব্রাহ্মসমাজের সভ্যরা নারীদের শিক্ষা দিতেন। সারদাসুন্দরী দেবীর ছোট ছেলে কৃষ্ণবিহারী সেন ব্রাহ্মসমাজ প্রবর্তিত *অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা* পদ্ধতিতে নারীদের শিক্ষাদানের যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সেই পদ্ধতিতে নারীদের শিক্ষাদানের কাজ করতেন। সারদাসুন্দরী দেবী *আত্মকথা*-য় কৃষ্ণবিহারীর এই শিক্ষাদানের কথা জানাতে গিয়ে লিখেছেন—

''কৃষ্ণবিহারীর পড়ার উপর চিরকাল ঝোঁক ছিল, সবসময় বই সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। তিনি ওই বারাণ্ডায় স্কুল করিয়াছিলেন। তাহাতে বাড়ির বউদের পড়াইতেন। বউরা এক এক সময় ঠাট্টা করিতেন যে, 'তোমাকে আমরা হাতে করে মানুষ করিলাম, আবার তোমার কাছে পড়িব!' আবার বউরা তাঁকে সব-সময় মাস্টার বলিয়া ডাকিতেন।''[৩৫]

কেশবচন্দ্র সেন ও ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য সভ্যরা মিলে *অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা* নামে নারীদের জন্য যে শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তন করেছিলেন, তা কেশবচন্দ্র সেনের জননী সারদাসুন্দরী দেবী স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকেই সারদাসুন্দরী দেবী *আত্মকথা* গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাহ্মসমাজ সমগ্র বাংলাদেশেই বিস্তৃতি লাভ করেছিল। বাংলাদেশের ব্রাহ্ম মেয়েদের শিক্ষার জন্য ১৮৭৩ সালে ওল্ড ঢাকায় ইডেন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বেথুন স্কুলের মতো ইডেন স্কুলেরও গাড়ি ছিল এবং সেই গাড়িতে করে ছাত্রীরা পড়তে যেতো। এই ইডেন স্কুলে পড়ার অভিজ্ঞতার কথা জানাতে গিয়ে মনোদা দেবী দাশগুপ্তা *জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী* গ্রন্থে বলেছেন—

> ''ক্রমে আমার বয়সের সঙ্গে ইডেন স্কুলে যাওয়ার দিন ঘনাইয়া আসিল। ইডেন স্কুলের গাড়িখানা যথাসময়ে বড়ো গেটের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া যায়, পূর্বাহ্নেই চট্‌পট্ করিয়া মুখে ভাত গুঁজিয়া উঠিতেই কাঙ্গাইলা ভাইর ধম্‌কানিতে আবার পাতে বসিয়া কিছু বেশি ভাত খাইতে বাধ্য হইতাম এবং খাওয়া সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই কাঙ্গাইলা ভাই আমাকে অতি যত্নে হাত মুখ ধোওয়াইয়া আমার গুছান বইগুলি হাতে লইয়া আমাকে গাড়িতে তুলিয়া দিয়া আসিত।''[৩৬]

এভাবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নারীদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। তবে এ সময় হিন্দু রক্ষণশীল সমাজ, এমনকি ব্রাহ্মসমাজের অনেক সভ্যরাও নারীদের উচ্চ শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। যেমন কামিনী রায় *শ্রাদ্ধিকী* গ্রন্থে জানিয়েছেন, তাঁর বাবা চণ্ডীচরণ সেন আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের মহত্ত্ব ও ধর্মভাবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলেও নারীদের উচ্চ শিক্ষা বিষয়ে কেশবচন্দ্র সেনের বিরোধিতাকে মেনে নিতে পারেননি।

কেশবচন্দ্র সেন ইংল্যাণ্ডে গিয়ে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে অনেক বক্তৃতা দিয়েছিলেন— সেসব বক্তৃতা শুনে অনুপ্রেরণা লাভ করে ১৮৭২ সালে কুমারী অ্যানেট অ্যাক্রয়েড নামে এক ইংরেজ নারী এদেশে নারী শিক্ষা বিস্তারের জন্যে এসেছিলেন। কিন্তু এদেশে এসে অ্যানেট অ্যাক্রয়েড বুঝতে পারলেন যে, কেশবচন্দ্র সেন নারী শিক্ষার সমর্থক হলেও প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে গিয়ে নারীদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণকে তিনি সমর্থন করেন না— কেশবচন্দ্র সেনের মতে নারী শিক্ষার উদ্দেশ্য হল নারীকে আদর্শ স্ত্রী ও মা হিসেবে গড়ে তোলা। স্বাভাবিকভাবেই উদারচেতা অ্যানেট অ্যাক্রয়েডের সঙ্গে নারী শিক্ষা নিয়ে কেশবচন্দ্র সেনের মতপার্থক্য হওয়ায় অ্যাক্রয়েড এদেশে

নারী শিক্ষা বিস্তারে কেশবের কাছে সাহায্য চাইলেন না। অ্যাক্রয়েড এসময় এদেশের নারীদের শিক্ষিতা করার বাসনায় কিছু ইংরেজ ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় ও কিছু প্রগতিশীল ব্রাহ্ম সভ্যদের সহায়তায় ১৮৭৩ সালে বেনেপুকুরে *হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়* তৈরি করেছিলেন। এটি ছিল বোর্ডিং স্কুল— এই স্কুলে ব্রাহ্মসমাজের অনেক নারী লেখাপড়া করতো। মিস অ্যানেট অ্যাক্রয়েডের নারী শিক্ষার জন্য এই স্কুল প্রতিষ্ঠার কথা বলতে গিয়ে সুদক্ষিণা সেন *জীবন স্মৃতি* গ্রন্থে বলেছেন—

> ''সেই সময়ে মিস্ একরয়েড নাম্নী একজন ইংরাজ মহিলা একটি বোর্ডিং স্কুল স্থাপিত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে আগতা অনেক মেয়েরাই সেই বোর্ডিং-এ থাকিয়া লেখাপড়া শিখিতেন।''[৩৭]

তবে অ্যাক্রয়েড প্রতিষ্ঠিত এই স্কুলের লেখাপড়া শেখার খরচ একটু বেশি হওয়ায় এবং ১৮৭৫ সালে অ্যাক্রয়েড এই স্কুলের প্রধানা শিক্ষিকার পদে ইস্তফা দিয়ে হেনরি বিভারিজকে বিয়ে করে চলে যাওয়ায় স্কুলটির অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে এবং ১৮৭৬ সালে স্কুলটি বন্ধ হয়ে যায়। অ্যাক্রয়েড প্রতিষ্ঠিত স্কুল বন্ধ হয়ে গেলে দুর্গামোহন দাস, আনন্দমোহন বসু, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ নারী শিক্ষার সমর্থক প্রগতিশীল ভদ্রলোকদের সহায়তায় ও অর্থানুকূল্যে ১৮৭৬ সালের ১ জুন প্রতিষ্ঠিত হল *বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়*। তখন *হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়*-র সকল ছাত্রী এই নতুন প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছিল—অনেক প্রগতিশীল ভদ্রলোক তাঁদের মেয়েদের এই বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। পূর্বেই বলেছি ব্রাহ্ম কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন নারীদের উচ্চ শিক্ষার বিরোধী। ফলে *হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়* বন্ধ হয়ে গেলে যখন *বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়* প্রতিষ্ঠিত হল তখন কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর অনুগামীরা অনেকেই এই নতুন প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করতে শুরু করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে কামিনী রায় *শ্রাদ্ধিকী* গ্রন্থে লিখেছেন—

> ''এই সময়ে ঢাকা হইতে কোন কোন ব্রাহ্ম পিতা মহাশয়ের নিকট গিয়াছিলেন। তাঁহারা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতানুবর্তিরূপে ইংরাজী ধরনের বোডিং স্কুল ও স্ত্রীজাতির উচ্চ শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। তাঁহারা বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ের কুশিক্ষার উদাহরণ স্বরূপ একদিন বলিয়াছিলেন যে তথাকার ছাত্রীরা ব্রাহ্ম ধর্ম ও ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারক দিগের প্রতি যথেষ্ট ভক্তি প্রকাশ করেন না, বরঞ্চ উপহাস করেন। কথাগুলির কোন মূল ছিল কি না জানি না।''[৩৮]

আসলে *বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়*-র অধিকাংশ ছাত্রী ব্রাহ্মসমাজের হওয়ায় কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর

অনুগামীরা চেয়েছিলেন এসব ছাত্রীদের অভিভাবকদের যদি বোঝানো যায় যে, তাঁদের মেয়েরা ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মধর্মের প্রচারকদের অশ্রদ্ধা করে অর্থাৎ ওই স্কুলে এধরনের শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে অনেক অভিভাবকই তাঁদের মেয়েদের ওই স্কুলে পাঠাবেন না। কিন্তু কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর অনুগামীদের এই নেতিবাচক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। কেননা এই *বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়* দারুণ সাফল্য লাভ করেছিল এবং ১৮৭৮ সালের ১ আগস্ট বেথুন স্কুলের সঙ্গে এই বিদ্যালয়টি এক হয়ে গিয়েছিল। এভাবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যখন নারীদের উচ্চ শিক্ষা নিয়ে সামাজিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তখন অনেক ইংরেজ মহিলা এদেশে নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করার জন্য এদেশের নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করতেন এবং নারীদের নানা রকম পুরস্কার প্রদান করতেন।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে একদিকে একদল ধনী সম্প্রদায় অশিক্ষিত থাকায় একদল লোক যেমন তাঁদের মেয়েদের বেশি লেখাপড়া শেখাতে চাননি শিক্ষিত ধনী পাত্রের অভাবে, অন্যদিকে আবার উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই শিক্ষিত সরকারি চাকুরিজীবী পাত্ররা বিবাহের জন্য শিক্ষিতা নারী চাইলে অনেক ভদ্রলোক সরকারি চাকুরিজীবী পাত্রের সঙ্গে তাঁদের মেয়েদের বিবাহ দেওয়ার জন্য মেয়েদের শিক্ষিত করে তুলতে বাধ্য হন। এভাবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নানা কারণে নারীরা প্রাথমিক শিক্ষা লাভের সুযোগ পেয়ে যায়। কিন্তু উনিশ শতকের প্রথমার্ধে নারীদের শিক্ষা গ্রহণ রক্ষণশীল সমাজে নিষিদ্ধ ছিল সেকথা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। রাসসুন্দরী দাসীর জন্ম উনিশ শতকের প্রথমার্ধে হওয়ায় তিনি লেখাপড়া শিখতে পারেননি সেসময়। তবে উনিশ শতকের সাতের দশকে তথা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যখন তিনি *আমার জীবন* নামে আত্মজীবনীটি লিখেছেন তখন এদেশের সমাজে নারীদের প্রাথমিক শিক্ষা স্বীকৃত হয়েছে এবং এসময় এদেশের অভিভাবকেরা দায়িত্ব নিয়ে মেয়েদের লেখাপড়া শেখাচ্ছিলেন। এ প্রসঙ্গে রাসসুন্দরী দাসী বলেছেন—

> ‘‘কিন্তু একটি ভারী আক্ষেপের বিষয় ছিল যে, মেয়েছেলে বলিয়া লিখিতে পড়িতে পাইতাম না। এখনকার মেয়েছেলেদিগের কী সুন্দর কপাল। এখন মেয়ে জন্মিলে অনেকেই বিদ্যাশিক্ষার চেষ্টা করেন। যাহা হউক, এ মত ভালোই বলিতে হইবেক।’’[৩৯]

এ সময় অনেকেই মনে করতেন সন্তানরা প্রথম শিক্ষা যেহেতু মায়ের কাছ থেকেই পায় সেহেতু নারীদের শিক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন আছে অর্থাৎ আদর্শ মা হিসেবে আদর্শ সন্তান তৈরি করার জন্যও

নারী শিক্ষার প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে নিস্তারিণী দেবী *সেকেলে কথা* গ্রন্থে বলেছেন, সন্তানদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য নারী শিক্ষার প্রয়োজন আছে এবং নারীদের লেখাপড়া সম্পূর্ণ করেই বিয়ে দিতে হবে। কেননা লেখাপড়া শেষ না করে মেয়েদের বিয়ে হলে বিবাহিত জীবনে সাংসারিক কাজকর্মের মধ্যে পড়ে মেয়েদের আর লেখাপড়া শেখা সম্ভব হবে না। তবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অনেক নারী এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করলেও এবং বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হলেও নারীদের উচ্চ শিক্ষার অধিকার দেওয়া হয়নি। তাই এসময় অনেক নারী উচ্চশিক্ষিতা হতে চাইলেও সে সাধ তাদের পূরণ হয়নি। এ প্রসঙ্গে সুদক্ষিণা সেন *জীবন স্মৃতি* গ্রন্থে লিখেছেন—

> ''এস্থানে একটি মর্মব্যথা না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। বিদ্যাশিক্ষা করিবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাল্যকাল হইতেই আমার প্রাণে অতিশয় বলবতী ছিল। কিন্তু অশেষ বাধাবিঘ্নবশত যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও আমার সেই সাধ মিটিল না। তজ্জন্য দুঃখ রহিয়া গেল।''[৪০]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে অনেক উচ্চবিত্ত শহুরে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানসিকতার পরিবর্তন হয় এবং তাঁরা সংস্কারমুক্ত উদারচেতা হয়ে তাঁদের স্ত্রীকেও আধুনিক করে তোলার জন্য শুধুমাত্র প্রথমিক শিক্ষাতেই নয়, ইংরেজি শিক্ষাতেও শিক্ষিতা করে তুলতে চেয়েছিলেন। আবার এসময় এদেশের অনেক প্রগতিশীল, নারী শিক্ষার অনুরাগী শিক্ষিত ব্যক্তি নারীদের দেশের ঐতিহ্য সম্পর্কে জানাবার জন্য সংস্কৃত শিখিয়েছিলেন, আবার আধুনিক করে তোলার জন্য নারীদের ইংরেজি শিক্ষায়ও শিক্ষিত করে তুলতে চেয়েছিলেন। সেকালের নারী হিসেবে মানকুমারী বসুও সংস্কৃতের পাশাপাশি ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিলেন। তিনি জানিয়েছেন—

> ''তৎকালে পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয়ও আমাকে যারপর নাই স্নেহ ও অনুগ্রহ করিতে থাকেন। তাঁহার এবং 'বামাবোধিনী' সম্পাদক মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে আমি অধিকতর মনোযোগপূর্বক ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষা শিখিতে চেষ্টা করি।''[৪১]

এভাবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে নারী শিক্ষার সূচনা হলে অনেক নারী শিক্ষিতা হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে আবার স্বল্পসংখ্যক নারী শিক্ষিতা হয়ে উনিশ শতকের শেষ দিকে স্কুলে শিক্ষিকা হিসেবে যোগদান করেছিলেন। কেননা তাঁরা তাঁদের

জীবন অভিজ্ঞতা দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন যে, নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা বড় প্রতিবন্ধকতা হল শিক্ষিকার অভাব, সেজন্য অধিকাংশ স্কুলে শিক্ষকরা শিক্ষকতা করায় অনেক অভিভাবকই তাঁদের মেয়েদের স্কুলে পড়াশোনা করাতে সাহস পেতেন না। কেননা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও সমাজ নারীদের পর্দাপ্রথা ভেঙে পুরুষদের সামনে যাওয়াকে ভালো চোখে দেখত না। শিক্ষিতা নারীরাই যদি শিক্ষকতার কাজ করেন তাহলে এ ধরনের সমস্যা হবে না। তাই উনিশ শতকের শেষদিকে শিক্ষিতা নারীরা যখন শিক্ষিকা হিসেবে স্কুলে যোগদান করলেন তখন অনেক নারীই শিক্ষার সুযোগ পেয়ে গেলেন। তাই আমরা দেখি উনিশ শতকে এদেশে যে নারী শিক্ষার সূচনা হয়েছিল, তা এই শতকের শেষদিকে বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে। এভাবে উনিশ শতকের শেষদিকে নারীদের এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনরকম বাধা ছিল না। কেননা সেসময় অনেক তর্ক-বিতর্কের পর শেষপর্যন্ত সরকার নারীদের উচ্চ শিক্ষায় অংশগ্রহণের দাবি সরকারিভাবে বিধিবদ্ধ করেছিল। যদিও এসময় এদেশের মুষ্টিমেয় কয়েকজন নারীই উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে পেরেছিলেন। কেননা সে সময় বেশি বয়স পর্যন্ত মেয়েদের অবিবাহিতা রাখার প্রথা ছিল না, আর বিবাহের পর স্বাভাবিকভাবেই শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে এদেশের নারীদের লেখাপড়া সেভাবে হতো না। ফলে এ সময় অনেক নারী উচ্চ শিক্ষিতা হতে পারেননি। মনোদা দেবী দাশগুপ্তা *জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী* গ্রন্থে লিখেছেন—

> ''আমি সে বার পঞ্চম শ্রেণি হইতে চতুর্থ শ্রেণিতে ১ম হইয়া প্রমোশন পাইয়াছি। তখন এন্ট্রান্স পরীক্ষার প্রচলন ছিল, অর্থাৎ আমরা তখন আর ৪ বৎসর পড়ার পরেই এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেওয়ার মতো যোগ্যতা লাভ করিতাম এবং এখনকার দিনের ছেলে-মেয়েদের মতই এন্ট্রান্স পাশ করিতে পারিতাম, ইহাতে কাহারও কোনো সন্দেহের কারণ ছিল না। অর্থাৎ ১৪ বৎসর বয়সেই আমি এন্ট্রান্স পাশ করিতে পারিতাম।''[৪২]

আমরা দেখলাম উনিশ শতকের প্রথমদিকে পাশ্চত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে এদেশে নারী শিক্ষার সূচনা, নারী শিক্ষা বিষয়ে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের কঠোর মনোভাব ও সামাজিক প্রতিকূলতা, নারী শিক্ষার বিস্তারে খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রচেষ্টা, প্রগতিশীল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টায় ও বেথুন স্কুলকে কেন্দ্র করে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নারীদের প্রাথমিক শিক্ষার স্বীকৃতি এবং নানা টানাপোড়েনের পর উনিশ শতকের শেষদিকে নারীদের উচ্চ শিক্ষার দ্বার উদ্‌ঘাটন।

গোটা উনিশ শতক জুড়ে নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যে দিয়ে এদেশের নারী শিক্ষার সূচনা ও বিস্তারের এই ইতিহাস আমাদের আলোচ্য নারী আত্মকথাগুলিতে নানাভাবে উঠে এসেছে। আবার আমাদের আলোচ্য আত্মকথাগুলিতে যেহেতু লেখিকারা নিজ জীবন অভিজ্ঞতার কথাই বলেছেন সেহেতু উনিশ শতকের নারী শিক্ষা সংক্রান্ত নানা সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা— বিশেষত সে সময়ের নারী শিক্ষার পদ্ধতি, নারীদের শিক্ষার জন্য নির্বাচিত বিষয়, নারী শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জনের কাছে বিভিন্ন রকম, নারী শিক্ষা বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদের কর্মকাণ্ড, নারী শিক্ষা বিষয়ে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের বিরোধিতা প্রভৃতি বাস্তব ঘটনার বর্ণনা বিস্তারিতভাবে পাওয়া যায় আমাদের আলোচ্য আত্মকথাগুলিতে। এদিক থেকে উনিশ শতকে এদেশের নারী শিক্ষার ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে এই আত্মকথাগুলির গুরুত্ব আছে— উনিশ শতকে এদেশের নারী শিক্ষার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এগুলি প্রামাণ্য দলিল হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। কেননা এই আত্মকথাগুলিতে লেখিকারা নিজ জীবন অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে সেসময়ের ইতিহাসকেই তুলে ধরেছেন। আর বিভিন্ন লেখিকার লেখায় একই ঘটনা উঠে এসেছে বলে তার সত্যতা আরও দৃঢ় হয়েছে। কেননা আমরা জানি ইতিহাসের সত্য যখন বহুকৌণিক দৃষ্টিভঙ্গিতে একইভাবে ধরা পড়ে তখন তার সত্যতা বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না। তবে গোটা উনিশ শতক জুড়ে এদেশের নারী শিক্ষার যে ইতিহাস আমরা আলোচনা করলাম, তা থেকে আমরা দেখি উনিশ শতকের মাঝামাঝি নারী শিক্ষার সূচনা ঘটেছিল এবং উনিশ শতকের একেবারে শেষদিকে নারীরা উচ্চ শিক্ষা লাভের অধিকার পেলেও উনিশ শতকে কিন্তু নারী শিক্ষার বিকাশ ঘটেনি, নারী শিক্ষার বিকাশ এদেশে শুরু হয় বিশ শতক থেকে। উনিশ শতকে এদেশে নারী শিক্ষার বিকাশ কেন হয়নি এবং বর্তমান সময়ে নারী শিক্ষার চিত্র কী, সেসব বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে আমরা বর্তমান অধ্যায়ের পর্যালোচনার সমাপ্তি টানব।

উনিশ শতকের শেষদিকে এদেশের মুষ্টিমেয় কয়েকজন নারী উচ্চ শিক্ষা লাভ করলেও সার্বিকভাবে উনিশ শতকে এদেশে নারী শিক্ষার বিকাশ হয়নি। কেননা সেসময় রক্ষণশীল সমাজ নারী শিক্ষার বিরোধী ছিল এবং খ্রিস্টান মিশনারি পরিচালিত বালিকা বিদ্যালয়গুলিতে সকল জাতির মেয়েদের একসঙ্গে শিক্ষা দেওয়া হতো। ফলে সেসময় সমাজে জাতিভেদপ্রথা থাকায় রক্ষণশীল সমাজ খ্রিস্টান মিশনারি পরিচালিত এসব স্কুলে নারী শিক্ষাকে মেনে নিতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে বিনয়ভূষণ রায় বলেছেন—

> ''মিশনারিদের স্কুলে জাতপাতের কোনও বিচার ছিল না এবং সেখানে প্রকাশ্যভাবে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হয়। এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে কোনও বিষয়টি তাঁরা সমর্থন করতে পারেননি তদুপরি স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট অনীহা ছিল।''[৪৩]

এছাড়া এসময়ে এদেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকায় অধিকাংশ নারীরই অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যেতো— স্বাভাবিকভাবেই শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে তাদের অধিকাংশেরই লেখাপড়া শেখা বন্ধ হয়ে যেতো। আবার অবিবাহিতা প্রাপ্তবয়স্কা নারীরা প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে গিয়ে লেখাপড়া শিখলে বাইরের পুরুষ মানুষের সঙ্গে মেলামেশার ফলে তাদের চরিত্রে দোষ ঘটতে পারে— এই আশঙ্কায় অনেক অভিভাবক তাঁদের মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে চাইতেন না। আবার নারীদের জন্য *অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা* নামে যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছিল সেক্ষেত্রেও অভাব দেখা গিয়েছিল শিক্ষিকার। কেননা সেসময় এদেশের অধিকাংশ নারীই ছিল অশিক্ষিতা, তাই শিক্ষিকার অভাবে এক্ষেত্রে পুরুষরাই নারীদের শিক্ষা দিত। ফলে শিক্ষিকার অভাবে অনেক অভিভাবক তাঁদের মেয়েদের শিক্ষকের কাছে লেখাপড়া শেখাতে পাঠাতেন না। উনিশ শতকের এদেশের মানুষের মানসিকতার দিকে যদি আমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তাহলে দেখব সেসময় এদেশের অভিভাবকেরা অর্থনৈতিক মূল্যবোধ অর্থাৎ শিক্ষা হল টাকা রোজগারের মাধ্যম— এই বোধ থেকেই তাঁদের ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতেন। কিন্তু মেয়েদের যেহেতু টাকা রোজগার করতে হতো না সেহেতু এসময়ের অভিভাবকেরা নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। এছাড়া নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করার জন্য প্রথম দিকে সরকার বৃত্তি বা আর্থিক সাহায্য দিলেও পরবর্তীকালে তা বন্ধ করে দেয়। আমরা আলোচনা করেছি যে, উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে এদেশের অনেক শিক্ষিত প্রগতিশীল পুরুষ যাঁরা নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন তাঁদের অনেকের কাছেই নারী শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল নারীদের ভালো মা ও পুরুষের উপযোগী স্ত্রী হিসেবে গড়ে তোলা— নারী শিক্ষার এ ধরনের উদ্দেশ্যের সম্যক্ প্রতিফলন ঘটেছে ৩ মার্চ ১৮৩৮ সালে *সমাচার দর্পণ* পত্রিকায় প্রকাশিত একজন ব্রাহ্মণের পত্রে—

> ''এইক্ষণকার লোক ও শিশুগণ বিদ্যাধ্যয়ন করিতেছেন তাঁহারা অবশ্যই উচ্চ ও উত্তম কার্য্যে রত হইবেন। বাণিজ্য বা বিদ্যার্থ তাঁহারা ভিন্ন দেশেও গমন করিবেন। ... অতএব পুরুষেরদের এইরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলে কি মূর্খ স্ত্রীরদের সঙ্গে

তাঁহারদের সংপ্রীতি হইবেক। দিবসীয় মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমের পর পুরুষের যে শান্তনা ও সাহায্যের আবশ্যকতা তাহা কি তিনি ঐ অজ্ঞান স্ত্রীর নিকটে পাইতে পারিবেন। ঐ স্ত্রীর নিকটে কি তিনি আপনার অন্তঃকরণীয় বার্ত্তা প্রকাশ করিতে পারিবেন। আপনারা অনেক সন্তানেরদের রক্ষণাবেক্ষণার্থ তাদৃশ স্ত্রীর নিকটে কি উপযুক্ত পরামর্শ পাইতে পারিবেন। ... অতএব আমি স্বদেশীয় মিত্রবর্গের প্রতি এই বিনীতি করি যে ইহার প্রতিকারক কোন উপায় স্থির করেন এই অকিঞ্চনের বোধে কলিকাতা বরাহনগর পানীয়হাটি চুঁচুড়া শান্তিপুর প্রভৃতি প্রধান প্রধান গণ্ডগ্রামে শিষ্ট বিশিষ্ট মান্য ব্যক্তিরদের উচিত যে তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া স্ত্রীরদের বিদ্যাভ্যাসার্থ এক ২ পাঠশালা স্থাপন করেন।"[৪৪]

তবে শুধু পুরুষরা নয়, সেসময়ের পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অধীনে থাকা নারীরাও এ ধরনের ধারণা পোষণ করতেন। মুষ্টিমেয় কয়েকজন নারী সরকারি চাকরি করে স্বাবলম্বী হলেও সেকালের অধিকাংশ নারীও মনে করতেন না যে, স্বাবলম্বী হওয়াও শিক্ষার একটি উদ্দেশ্য। আমরা জানি শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানো। কিন্তু উনিশ শতকে নারীরা শিক্ষাকে তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশের সহায়ক হিসেবে দেখেননি— উনিশ শতকের নবজাগরণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জাগরণ; কিন্তু এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বোধ তখনও এদেশের নারীদের মধ্যে জাগরিত হয়নি। ফলে শিক্ষার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিত্বের বিকাশের কথা তাঁরা ভাবতে পারেননি। এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অধীনে থেকে তাঁরা শিক্ষাকে আদর্শ মা ও উপযুক্ত স্ত্রী হওয়ার মাধ্যম হিসেবেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন। সেকালের নারীদের মানসিকতার কথা বলতে গিয়ে গোলাম মুরশিদ লিখেছেন—

''ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলারা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিলেও, বিংশ শতাব্দীর নারীমুক্তি আন্দোলনকারী আদর্শের সঙ্গে এই মহিলাদের আদর্শের তেমন সাদৃশ্য ছিলো না। তাঁরা তখনো পুরুষ সমাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যিক মূল্যবোধের প্রতি আস্থাবান ছিলেন। শিক্ষা লাভ করে তাঁরা সেই ধরনের মহিলা হতে চাচ্ছিলেন শিক্ষিত ভদ্রলোকরা যাঁদের আদর্শ বলে গণ্য করছিলেন। তাঁরা লক্ষ করেন, পুরুষপ্রধান সমাজে শিক্ষা লাভ করে ''আধুনিক'' স্ত্রী এবং মাতা হওয়া ছাড়া তাঁদের আর কোনো বিকল্প নেই।"[৪৫]

এমনকি সে সময়ের অনেক শিক্ষিতা নারীও (জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, কৃষ্ণভাবিনী দাসী, কামিনী দত্ত প্রমুখ) নারী শিক্ষার উদ্দেশ্য বিষয়ে এ ধরনের মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই উনিশ শতকে এদেশে নারী শিক্ষার সূচনা হলেও বিকাশ হয়নি। বিশ শতকে সরলা ঘোষাল, বেগম রোকেয়া এঁদের হাত ধরে ধীরে ধীরে এদেশের নারীরা উপলব্ধি করতে পারেন শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাই এদেশে বিশ শতকেই নারী শিক্ষার বিকাশ ঘটে।

১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হলে নতুন সংবিধান প্রণয়ন করা হয়— এই সংবিধানে শিক্ষা সংক্রান্ত বিধি ব্যবস্থায় স্পষ্টভাবে বলা আছে যে, নারীরাও পুরুষদের মতো সমান শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে এবং এ ব্যাপারে কোন বৈষম্য থাকা চলবে না। কিন্তু তখন এবং আজও আমাদের দেশের অভিভাবকদের কাছে কন্যাসন্তান সেভাবে গুরুত্ব পায়নি এবং পায় না বলেই এদেশের নারীরা আজও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে আছে। কেননা আজও আমাদের সমাজের ধারণা নারীর কাজ ঘরকন্নার কাজ এবং নারীর জীবন তথা ভাগ্য নির্ভর করে স্বামীর ওপর— তাই নারীর বেশি লেখাপড়া শেখার দরকার নেই। নারীদের প্রতি বর্তমান সমাজের এই মানসিকতার প্রসঙ্গে তপস্যা ঘোষ বলেছেন—

> ''একবিংশ শতাব্দী শুরু হয়ে গেছে। তবু নারী-ভ্রূণ হত্যা চলছে। নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে আজও প্রচার দরকার হয়। ... উচ্চশিক্ষিতা মেয়েও পাত্রস্থ না হওয়া অবধি বাবা-মার দায়। আজও অনূঢ়া মেয়েদের প্রতি বিয়ে করার উপদেশ সদাই বর্ষিত হয় অথবা চিন্তিত নিকটজন তার নিরাপত্তার কথা ভেবে বিমর্ষ হন।''[৪৬]

তবে নারী শিক্ষা বিষয়ে এধরনের নেতিবাচক মনোভাবের জন্য শুধু নয়, আরো একটি কারণে এই একবিংশ শতকেও এদেশের নারীরা উচ্চশিক্ষিতা হতে পারেনি, সেটি হল— আজও আমাদের সমাজে প্রাপ্তবয়স্কা হওয়ার আগেই অনেক মেয়ের বিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যদিও ভারতীয় সংবিধানে বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে তবুও যারা সবদিক থেকে পিছিয়ে আছে, যারা দরিদ্র, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, নিরক্ষর— তারা সচেতনতার অভাবে মেয়েদের প্রাপ্তবয়স্কা হওয়ার আগেই বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে হামেশাই। এভাবে অল্পবয়সে এদেশের অনেক নারীর বিয়ে হয়ে যাওয়ায় নারীদের উচ্চশিক্ষিতা হওয়ার সুযোগও নষ্ট হয়ে যায়। কেননা বিয়ের পর পুরুষরা স্ত্রী নামক সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রে সন্তান উৎপাদন করতে বেশি বিলম্ব করে না। ফলে অধিকাংশ নারীর সন্তান পালন এবং ঘরকন্নার

কাজ করতে করতেই উচ্চ শিক্ষার সুযোগও শেষ হয়ে যায়। রঞ্জিৎ দেববর্মনের ভাষায়—

> ''সাংবিধানিক ফতোয়ায় বাল্যবিবাহ ভারতীয় সমাজে নিষিদ্ধ কিন্তু সুবিশাল গ্রাম-ভারতের সামাজিক প্রেক্ষাপটে অনগ্রসর, আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল, কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং নিম্নবর্ণ, নিম্নজাতি ও বিভিন্ন অন্ত্যজ অচ্ছ্যুৎদের মধ্যে দুর্বারগতিতে এখনও বাল্যবিবাহ মহাপরাক্রমে হয়ে চলেছে। ফলে নারীদের শিক্ষা এই দেশে বরাবরই উপেক্ষিত হয়েছে এবং আজও হচ্ছে।''[৪৭]

এসব কারণেই এই একবিংশ শতকেও এদেশের নারীরা উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে আছে।

আজও এদেশে নারী শিক্ষার অবস্থা খুবই শোচনীয় এবং নারী শিক্ষার শতকরা হার পুরুষের তুলনায় অনেক কম— ২০১১ সালের আদমশুমারির ভিত্তিতে আমরা জানতে পারি ভারতে পুরুষদের ক্ষেত্রে সাক্ষরতার হার ৮২.১৫% এবং নারীদের ক্ষেত্রে সাক্ষরতার হার ৬৫.৪৬% এবং পশ্চিমবঙ্গও এর ব্যতিক্রম নয়, আর এ থেকে আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, আজও আমাদের দেশের অনেক নারীই শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। তাই নারী শিক্ষার এই শোচনীয় অবস্থা এবং তার কারণ অনুসন্ধান করে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার নারীর সুরক্ষা ও শিক্ষাকে সুনিশ্চিত করতে নানা রকম প্রকল্প চালু করেছে। যেমন পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্কুলছুট ছাত্রীদের ফেরানো, বাল্যবিবাহ বন্ধ করা, নারী শিক্ষার প্রসার ঘটানো এবং কন্যাকে পড়াশোনার সুযোগ দেওয়া ও পারিবারিক প্রতিহিংসা থেকে দূরে রাখার জন্য ২০১৩ সালের মার্চ মাসে শর্তসাপেক্ষ আর্থিক অনুদান *কন্যাশ্রী* প্রকল্প চালু করেছে। আবার কন্যাসন্তানের জন্মকে অবহেলা নয়, আনন্দের সাথে গ্রহণ করা; কন্যার সুরক্ষা ও শিক্ষা সুনিশ্চিত করা এবং লিঙ্গগত বৈষম্য দূর করতে ভারত সরকার *বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও* প্রকল্প চালু করেছে— ২০১৫ সালের ২২ জানুয়ারি হরিয়ানার পানিপথে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় শ্রী নরেন্দ্র মোদী মহাশয় এই প্রকল্পটির সূচনা করেছিলেন। আমরা দেখলাম নারী সন্তানের প্রতি অবহেলা, নারী শিক্ষার প্রতি উদাসীনতা এবং অল্পবয়সে অনেক নারীর বিয়ে হয়ে যাওয়া— এসব দিকে লক্ষ রেখেই বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে নারী শিক্ষাকে সুনিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে সরকার যেমন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তেমনি আমাদের সকলেরও এ বিষয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন— কেননা জনগণ সচেতন না হলে সরকারের পক্ষে কোন কিছু করাই সম্ভব নয়। আবার নারী শিক্ষাকে সুনিশ্চিত করতে হলে নারীদেরও সচেতন হতে হবে— যার প্রয়োজন তাকেই কিন্তু তার প্রাপ্যটা আদায় করে নিতে হয়। আর নারীদের স্বাবলম্বী হওয়ার

জন্য, ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য যেমন নারী শিক্ষার প্রয়োজন, তেমনি সমাজ তথা দেশের সার্বিক বিকাশের জন্যও নারী শিক্ষার প্রয়োজন আছে। কেননা একটি সমাজ তথা দেশের সার্বিক বিকাশে নারী ও পুরুষ— উভয়েরই সমান ভূমিকা থাকে। আমরা আমাদের ক্ষমতার একশো শতাংশ দিলেই যেমন কোন কাজে সাফল্য পাই তেমনি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানব সম্পদকে কাজে লাগাতে পারলেই আমাদের সমাজ তথা দেশের সার্বিক বিকাশ সম্ভব হবে, নচেৎ নয়। আমরা যদি উন্নত দেশগুলির দিকে তাকাই তাহলে দেখব তারা এই চিরন্তন সত্য অনেক আগেই উপলব্ধি করতে পেরেছিল বলেই আজ তাদের দেশের সার্বিক বিকাশ হয়েছে। তাই বৃহত্তর স্বার্থেও নারীদের বঞ্চিত করে না রেখে তাদের শিক্ষার যথাযথ অধিকার দিয়ে তাদের প্রতিভাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

তথ্যসূত্র:

১. মুরশিদ গোলাম : নারী প্রগতি: আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, প্রথম ভারতীয় সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১৯

২. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৮

৩. বসু স্বপন : বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ: আগস্ট ২০১৬, পৃ. ১৫৬

৪. বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ (সঙ্কলিত ও সম্পাদিত) : সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড (১৮৩০-১৮৪০), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ: পৌষ ১৪০১, পৃ. ১৫, ১৬

৫. শাস্ত্রী শিবনাথ : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, সম্পাদনা-বারিদবরণ ঘোষ, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা:লি:, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ: ২০০৯, পৃ. ১২৪

৬. প্রাগুক্ত : পৃ. ১২৫

৭. বসু স্বপন : বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ: আগস্ট ২০১৬, পৃ. ১৫৪, ১৫৫

৮. শাস্ত্রী শিবনাথ : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, সম্পাদনা-

বারিদবরণ ঘোষ, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা:লি:,
কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ: ২০০৯, পৃ. ১২৩

৯. প্রাগুক্ত : পৃ. ১২৫

১০. গুপ্ত ঈশ্বরচন্দ্র : শ্রেষ্ঠ কবিতা, সম্পাদনা-অলোক রায়, ভারবি, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ: সেপ্টেম্বর ২০১৫, পৃ. ৭৬

১১. রায় বিনয়ভূষণ : অন্তঃপুরের স্ত্রীশিক্ষা, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ: ২০১৫, পৃ. ২১

১২. মুরশিদ গোলাম : নারী প্রগতি: আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, প্রথম ভারতীয় সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৩৬

১৩. ঘোষাল ধনঞ্জয় (সম্পা.) : নবচেতনায় বঙ্গনারী: প্রাক্ স্বাধীনতা পর্ব, আশাদীপ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারী ২০১৫, পৃ. ৪৯

১৪. প্রাগুক্ত : পৃ. ৫২

১৫. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা) : প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৯১, ৯২

১৬. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৩৫

১৭. প্রাগুক্ত : পৃ. ৯০

১৮. প্রাগুক্ত : পৃ. ৮৯

১৯. প্রাগুক্ত : পৃ. ৯৬

২০. প্রাগুক্ত : পৃ. ১০৬

২১. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৫৪

২২. প্রাগুক্ত : পৃ. ২৫৮

২৩. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা) : প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, চতুর্থ খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ১৫৫

২৪. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭৮

২৫. প্রাগুক্ত : পৃ. ৪৬

২৬. ঘোষ বিজিত : প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, তৃতীয় খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা,
(সংকলন ও সম্পাদনা) প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৯২
২৭. ঘোষ বিজিত : প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, চতুর্থ খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা,
(সংকলন ও সম্পাদনা) প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ১৬২
২৮. ঘোষ বিজিত : প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা,
(সংকলন ও সম্পাদনা) প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ২৪১
২৯. ঘোষ বিজিত : প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, চতুর্থ খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা,
(সংকলন ও সম্পাদনা) প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৪৮, ৪৯
৩০. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৮৩
৩১. ঘোষ বিজিত : প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা,
(সংকলন ও সম্পাদনা) প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ২৩১
৩২. ঘোষ বিজিত : প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, চতুর্থ খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা,
(সংকলন ও সম্পাদনা) প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ২২৫
৩৩. প্রাগুক্ত : পৃ. ২২৫
৩৪. প্রাগুক্ত : পৃ. ৬১
৩৫. ঘোষ বিজিত : প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা,
(সংকলন ও সম্পাদনা) প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১৭৬
৩৬. ঘোষ বিজিত : প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, পঞ্চম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা,
(সংকলন ও সম্পাদনা) প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৮৯
৩৭. ঘোষ বিজিত : প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, চতুর্থ খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা,
(সংকলন ও সম্পাদনা) প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৮২
৩৮. ঘোষ বিজিত : প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, তৃতীয় খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা,
(সংকলন ও সম্পাদনা) প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ১৩৯
৩৯. ঘোষ বিজিত : প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা,
(সংকলন ও সম্পাদনা) প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৯৩
৪০. ঘোষ বিজিত : প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, চতুর্থ খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা,

(সংকলন ও সম্পাদনা) প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৮১

৪১. প্রাগুক্ত : পৃ. ২৩৪

৪২. ঘোষ বিজিত : প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, পঞ্চম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা,
(সংকলন ও সম্পাদনা) প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ১০৯

৪৩. রায় বিনয়ভূষণ : অন্তঃপুরের স্ত্রীশিক্ষা, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ: ২০১৫, পৃ. ১৭

৪৪. বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ : সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড (১৮৩০-১৮৪০),
(সঙ্কলিত ও সম্পাদিত) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ: পৌষ ১৪০১, পৃ. ৯৯, ১০০

৪৫. মুরশিদ গোলাম : নারী প্রগতি: আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, প্রথম ভারতীয় সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৪৯

৪৬. বসু স্বপন; চৌধুরী ইন্দ্রজিৎ : উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি, পুস্তক বিপণি,
(সম্পা.) কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ২৯ নভেম্বর ২০০৩, পৃ. ১৯৯

৪৭. দেববর্মন রঞ্জিৎ : নারী: একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা, রিডার্স সার্ভিস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ১৩ অক্টোবর ২০০৪, পৃ. ৯৮

চতুর্থ অধ্যায়

নারীর আত্মকথায় উনিশ শতক : সামাজিক নানা প্রসঙ্গ

সাহিত্য হল সমাজের দর্পণ— সাহিত্যিক যখন কোন কিছু রচনা করেন তখন তাঁর রচনায় অনিবার্যভাবে উঠে আসে সামাজিক নানা প্রসঙ্গের কথা। কেননা আমাদের মতো সাহিত্যিকরাও সমাজবদ্ধ জীব— সমাজের নানা ঘটনাকে সাহিত্য সৃষ্টির সময় তিনি উপেক্ষা করতে পারেন না। তবে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে আত্মকথাজাতীয় রচনাগুলিতে এই সামাজিক নানা প্রসঙ্গের বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। উনিশ শতকেও এদেশের জীবন ছিল নানা ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। উনিশ শতকের এদেশের সমাজের বাল্যবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা, বহুবিবাহ, পণপ্রথা, হিন্দু বিধবা নারীর কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন— নির্জলা একাদশী পালন প্রভৃতি বাংলার নারীদের করুণ পরিণতির জন্য দায়ী। এছাড়া পুরুষতান্ত্রিক সমাজে এদেশের নারীদের সামাজিক অবস্থান ছিল নিম্নমানের, তাদের যেন মানুষ হিসেবেই স্বীকৃতি দেয়নি পুরুষতান্ত্রিক সমাজ— তাদের অবস্থান ছিল পর্দার আড়ালে, অন্তঃপুরে। আর তাদের সামাজিক কর্তব্য হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে— সাংসারিক কাজ-কর্ম, গুরুজনদের সেবা, স্বামী সেবা, স্বামীকে যৌনসুখ দেওয়া, সন্তান তথা পুত্র সন্তান উৎপাদন-পালন ইত্যাদি। এর পাশাপাশি জাতিভেদপ্রথা, একঘরেপ্রথা, নব্যশিক্ষিত ও উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের বাবুবিলাস ইত্যাদি উনিশ শতকের হিন্দু রক্ষণশীল সমাজকে অক্টোপাসের মতো কুক্ষিগত করে রেখেছিল। সব মিলিয়ে বলা যায় উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক জীবন ছিল জরাজীর্ণ। এই জরাজীর্ণ হিন্দু সমাজ থেকে বেরিয়ে ব্রাহ্মরা প্রগতিশীল চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন। ফলে হিন্দু রক্ষণশীল সমাজের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের একটা স্বাভাবিক বিরোধ অনিবার্যভাবেই সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, উনিশ শতকে এদেশে রেনেসাঁস বা নবজাগরণের যে সূচনা হয়েছিল তার ফলে এদেশের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু প্রগতিশীল ব্যক্তি সে সময়ের এদেশের সামাজিক নানা প্রথা ও কুসংস্কার, যা এদেশের নারীদেরকে সর্বনাশের কাল সলিলে নিক্ষেপ করেছিল— তার বিরুদ্ধে সংস্কার-আন্দোলন শুরু করেছিলেন। তবে এসব সমাজ-সংস্কার আন্দোলন বিস্তৃতি লাভ করতে পারেনি। কেননা একদিকে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ যেমন সমাজ সংস্কারকদের বিরোধিতা করেছে, অন্যদিকে তেমনি সমাজ সংস্কারকদের এসব আন্দোলন শুধুমাত্র কিছু শহুরে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, দেশের সাধারণ মানুষদের মধ্যে তার কোনো প্রভাবই

পড়েনি। তার ফলে উনিশ শতকেও এদেশের সমাজে বাল্যবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা, বহুবিবাহ, জাতিভেদপ্রথা, পণপ্রথা ইত্যাদি কুপ্রথা জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছিল। বিনয় ঘোষ বলেছেন—

> ''তাই দেখা যায়, বাংলার নবজাগরণ মূলত নগরকেন্দ্রিক পাশ্চাত্ত্য বিদ্যাশিক্ষিত মুষ্টিমেয় এলিটের মস্তিষ্কের আন্দোলন, দেশের মানুষের আন্দোলন নয়। আমাদের দেশের মতো ঐতিহ্যানুগামী সমাজে (tradition-bound society) পুরাতন সামাজিক ইন্‌স্টিটিউশনের শক্তি যে কত সংহত ও সুদৃঢ়, তা ব্রিটিশ শাসনমুক্তির প্রায় পঁচিশ বছর পরেও, আধুনিক যন্ত্রোন্নত শিল্পায়নের সামাজিক প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও, আজও আমরা ধর্মবৈষম্য জাতিভেদ প্রভৃতির সদম্ভ আত্মপ্রকাশে বুঝতে পারছি।''[১]

আত্মকথাজাতীয় রচনায় রচয়িতার জীবন-অভিজ্ঞতার প্রতিফলন থাকে। আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলি হল— রাসসুন্দরী দাসীর *আমার জীবন*, সারদাসুন্দরী দেবীর *আত্মকথা*, কৈলাসবাসিনী দেবীর *ডায়েরী*, প্রসন্নময়ী দেবীর *পূর্ব্বকথা*, বিনোদিনী দাসীর *আমার কথা*, কৃষ্ণভাবিনী দাসীর *ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা*, নিস্তারিণী দেবীর *সেকেলে কথা*, কামিনী রায়ের *শ্রাদ্ধিকী*, সুদক্ষিণা সেনের *জীবন স্মৃতি*, শরৎকুমারী দেবের *আমার সংসার*, ইন্দিরা দেবীর *আমার খাতা*, মানকুমারী বসুর *আমার অতীত জীবন*, লীলাবতী মিত্রের *জীবনকথা*, আমোদিনী দাশগুপ্তের *আমার জীবন-কাহিনি*, মনোদা দেবী দাশগুপ্তার *জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী*। এগুলি নারীর লেখা হওয়ায় এগুলিতে উনিশ শতকের এদেশের হিন্দু রক্ষণশীল সমাজে নারীর অবস্থান, বন্দীজীবন, সাংসারিক জীবন ইত্যাদির যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি তৎকালীন সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন রীতি-নীতি, সামাজিক অনুশাসন, বিভিন্ন সামাজিক প্রথা, কুসংস্কার ইত্যাদিরও পরিচয় পাওয়া যায়। আত্মকথা যেহেতু রচয়িতার প্রত্যক্ষ জীবন অভিজ্ঞতা থেকে রচিত সেহেতু আত্মকথায় সামাজিক নানা প্রসঙ্গ বিশ্বস্তভাবে উঠে আসে। আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলিতে উনিশ শতকের এদেশের সামাজিক নানা প্রসঙ্গ বিভিন্ন জনের লেখনীতে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উঠে এসেছে। আর বহুকৌণিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সেকালের সামাজিক নানা প্রসঙ্গের এবং তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার একটা বাস্তব ও পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায় আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলিতে।

উনিশ শতকে বাংলাদেশের পুরুষতান্ত্রিক হিন্দু রক্ষণশীল সমাজে যেসব প্রথা প্রচলিত ছিল,

সেগুলির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ও বিতর্কিত প্রথা হল বাল্যবিবাহ। বাল্যবিবাহ নিয়ে আলোচনার পূর্বে প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র *মনুসংহিতায়* এ সম্পর্কে কী বিধান দিয়েছেন মনু—তার পর্যালোচনা প্রাসঙ্গিকভাবেই এসে যায়। *বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদকে* আশ্রয় করে রচিত বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল *মনুস্মৃতি বা মনুসংহিতা*। তাই এটিকে বলা হয় *বেদের* নির্যাস। এই *মনুসংহিতার* শাস্ত্রীয় বিধানের ওপর ভিত্তি করেই পুরুষতান্ত্রিক হিন্দু সমাজের যাবতীয় রীতি-নীতি, ধর্ম-কর্ম তথা সামগ্রিক জীবন-যাপন প্রণালী স্থির করা হয়েছে। মনু নারী ঋতুমতী অর্থাৎ প্রজনন ক্ষমতাসম্পন্ন হলেই তার বিয়ের বিধান দিয়েছেন, এমনকি উপযুক্ত পাত্র পাওয়া গেলে নারী ঋতুমতী না হলেও তার বিয়ে দেওয়া যাবে বলে মনু জানিয়েছেন। মনুর মতে, নারীকে সর্বাধিক বারো বছরের মধ্যে বিয়ে দিতে হবে, আর এক্ষেত্রে তিনি বলেছেন কোন নারী প্রজনন ক্ষমতাসম্পন্ন হলেও তার পিতা যদি তার বিয়ে দিতে বিলম্ব করে তাহলে তার পিতা লোকসমাজে নিন্দনীয় হবে এবং কন্যাপণ থেকেও বঞ্চিত হবে। তাই *মনুসংহিতার* ওপরে ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বাল্যবিবাহ ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল— যারা কমবয়সে তাদের মেয়েদের বিয়ে দিতে চাইতো না তারাও শাস্ত্রীয় বিধান তথা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের রক্তচক্ষুর ভয়ে তাদের মেয়েদের বাল্যকালেই বিয়ে দিয়ে দিতো— মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যে গৌরীদানের বিষয়টি আমাদের সকলেরই জানা। এই শাস্ত্রীয় বিধান কতটা নির্মম ছিল, তার পরিচয় দিতে গিয়ে বিদ্যাসাগর *বাল্যবিবাহের দোষ* প্রবন্ধে বলেছেন—

> ‘‘শাস্ত্রকারকেরা এই বাল্যবিবাহ সংস্থাপনা নিমিত্ত এবং তারুণ্যাবস্থায় বিবাহ নিষেধার্থ স্ব স্ব বুদ্ধি কৌশলে এমত কঠিনতর অধর্মভাগিতার বিভীষিকা দর্শাইয়াছেন, যদ্যপি কোন কন্যা কন্যাদশাতেই পিতৃগৃহে স্ত্রীধর্মিনী হয়, তবে সেই কন্যা পিতৃ মাতৃ উভয় কুলের কলঙ্কস্বরূপা হইয়া সপ্ত পুরুষ পর্যন্তকে নরকগামী করে, এবং তাহার পিতা মাতা যাবজ্জীবন অশৌচগ্রস্ত হইয়া সমস্ত লোকসমাজে অশ্রদ্ধেয় ও অপাঙ্‌ক্তেয় হয়।’’[২]

আর শাস্ত্রকারদের এই ধর্মীয় অনুশাসনের ভয়ে এবং রক্ষণশীল সমাজের চাপে অনেক পিতা-মাতা অনেক সময় দশ-বারো বছর বয়সের মধ্যে বিয়ে দিতে গিয়ে উপযুক্ত পাত্র না পেয়ে অপাত্রেই তাদের কন্যাদের দান করেন— স্বাভাবিকভাবেই অপাত্রস্থ হওয়ায় তাদের জীবন শুরু হওয়ার আগেই অন্ধকারে শেষ হয়ে যায়। এছাড়া বাল্যকালে বিয়ের ফলে পাত্র-পাত্রী উভয়ই বাল্যকাল থেকে

রঙ্গরসিকতা, কাম ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকায় তাদের বিদ্যাশিক্ষা প্রায় হয় না বললেই চলে। অনেক সময় বাল্যকালে বিবাহের ফলে স্বামীর কামনা-বাসনার শিকার হয়ে অনেক নারীকে আত্মাহুতিও দিতে হয়েছে, অকালে ঝরে পড়তে হয়েছে অনেক নারীকে। আমরা জানি এদেশের নারী ফুলমণি দাসীর কথা— ১৮৮৯ সালে দশ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়েছিল ত্রিশ বছরের যুবক হরিমোহন মাইতির সঙ্গে এবং দাম্পত্যের প্রথম রাতেই স্বামীর যৌনলালসার শিকার হয়ে ফুলমণির মৃত্যু হয়েছিল। স্বাধীনতা পূর্ব ভারতের আইনে এটি *দ্য ফুলমণি দাসী রেপ কেস* নামে পরিচিত। আবার বাল্যবিবাহের ফলে কমবয়সে সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে এদেশের অনেক বালিকার মৃত্যু হয় অথবা তাদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়, আবার তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দুর্বল শিশুর জন্ম দেয়। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক শুধুমাত্র কাম নয়, প্রেমের ওপরেও দাঁড়িয়ে থাকে— এই প্রেম না থাকলে কামের আগুন নিভে গেলে দাম্পত্য সম্পর্ক নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে। আর বাল্যবিবাহের ফলে বাল্যকালে পাত্র-পাত্রীরা যেহেতু ভালোবাসাকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারে না সেহেতু তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক কামের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকায় যেদিন কামের মোহ কেটে যায় সেদিন তাদের দাম্পত্য সম্পর্কে ফাটল ধরে এবং এর ফলে দাম্পত্য জীবন সুখের হয় না— ভালোবাসার অপ্রাপ্তির বেদনায় হাহুতাশ করেই কেটে যায় সারাজীবন। বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে *বাল্যবিবাহের দোষ* প্রবন্ধে বিদ্যাসাগর জানিয়েছেন—

> ‘‘বাল্যকালে বিবাহ হওয়াতে বিবাহের সুমধুর ফল যে পরস্পর প্রণয়, তাহা দম্পতিরা কখন আস্বাদ করিতে পায় না, সুতরাং পরস্পরের সপ্রণয়ে সংসার যাত্রার নির্বাহকরণ বিষয়েও পদে পদে বিড়ম্বনা ঘটে, আর পরস্পরের অত্যন্ত অপ্রীতিকর সম্পর্কে যে সন্তানের উৎপত্তি হয়, তাহাও তদনুরূপ অপ্রশস্ত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। আর নব-বিবাহিত বালক-বালিকারা পরস্পরের চিত্তরঞ্জনার্থে রসালাপ, বিদগ্ধতা, বাক্‌চাতুরী, কামকলাকৌশল প্রভৃতি অভ্যাসকরণে ও প্রকাশকরণে সর্বদা সযত্ন থাকে, এবং তদ্বিষয়ে প্রয়োজনীয় উপায় পরিপাটী পরিচিন্তনেও তৎপর থাকে, সুতরাং তাহাদিগের বিদ্যালোচনার বিষম ব্যাঘাত জন্মিবাতে সংসারের সারভূত বিদ্যাধনে বঞ্চিত হইয়া কেবল মনুষ্যের আকার-মাত্রধারী, বস্তুতঃ প্রকৃতরূপে মনুষ্যগণনায় পরিগণিত হয় না।’’[৩]

আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলির লেখিকাদের প্রায় সকলেরই বাল্যকালে বিবাহ হয়েছে।

তাই আত্মকথা লিখতে গিয়ে তাঁরা কখনো নিজেদের বাল্যবিবাহের কথা, বাল্যকালে বিয়ে সম্পর্কে তাঁদের ধারণার কথা; কখনো পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজনদের বাল্যবিবাহের কথা তাঁরা উল্লেখ করেছেন। বাল্যবিবাহের ফলে এদেশের নারীদের খেলাধূলার বয়সেই শ্বশুরবাড়ির অন্দরমহলে বন্দীজীবন কাটানো, অনেক সময় অধিক বয়স্ক পুরুষের সঙ্গে অল্পবয়সী মেয়ের বিয়ের ফলে মানসিক ব্যবধানে দাম্পত্য জীবনের টানাপোড়েন, অনেক সময় অপাত্রে পাত্রস্থ হওয়ার ফলে নারীর জীবনের করুণ পরিণতি, অনেক সময় অল্পবয়সে অনেকগুলি সন্তান জন্ম দেওয়ার ফলে নারীর শারীরিক অসুস্থতা, আবার অনেক সময় অল্প বয়সেই বিধবা হওয়া ইত্যাদি নারীকেন্দ্রিক সমস্যাগুলি আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলিতে উঠে এসেছে এবং লেখিকারা নিজস্ব জীবন অভিজ্ঞতা থেকে সেসব বিষয়ে আলোকপাত করায় তা আরও বাস্তব ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। এভাবে আমদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলিতে উনিশ শতকের এদেশের বাল্যবিবাহপ্রথা সম্পর্কে একটা সামগ্রিক ধারণা আমরা পাই।

রাসসুন্দরী দাসীর বারো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল ফরিদপুরের জমিদার সীতানাথ সরকারের সঙ্গে। সে বয়সে রাসসুন্দরীর বিয়ে সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না, ধারণা হবারও কথা নয়। তাই সেই বাল্যবয়সে যখন তিনি জানতে পেরেছিলেন তাঁর বিয়ের কথা তখন তাঁর মনে হয়েছিল পুতুলের বিয়ের মতো তাঁরও বিয়ে হবে এবং বিয়ের পর বর ও বরের বাড়ির লোকেরা তাঁকে না নিয়েই চলে যাবে। কিন্তু মা, দাদা, পিসিদের কান্না শুনে তিনি তখন বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁকেও শ্বশুর বাড়ি যেতে হবে এবং সে সময় তিনি অচেনা-অজানা শ্বশুরবাড়ির কথা ভেবে আতঙ্কে মার কোলে উঠে কান্না করতে থাকেন। আত্মীয়-স্বজনদের প্রবোধ বাক্যেও যখন তাঁর ভয় ও কান্না না কমে বরং বৃদ্ধি পেয়েছিল তখন বাড়ির লোকেরা তাঁকে জোর করেই শ্বশুরবাড়িতে পাঠানোর জন্য পালকিতে উঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেই অল্পবয়সে মায়ের ও আত্মীয়-স্বজনদের স্নেহাশ্রয় হারানোর বেদনায় এবং সম্পূর্ণ অপরিচিত শ্বশুরবাড়ির কথা ভেবে অজানা আতঙ্কে তাঁর মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল তার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি *আমার জীবন* গ্রন্থে বলেছেন—

> ‘‘তখন আমার মনের ভাব কী বিষম হইয়াছিল ! যখন দুর্গোৎসবে কী শ্যামাপূজায় পাঁঠা বলি দিতে লইয়া যায়, সে সময়ে সেই পাঁঠা যেমন প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া হতজ্ঞান হইয়া মা মা মা বলিয়া ডাকিতে থাকে, আমার মনের ভাবও তখন ঠিক সেই প্রকার হইয়াছিল। আমি আমার পরিবারগণকে না-দেখিয়া, অত্যন্ত

ব্যাকুল হইয়া মা মা বলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম, আর মনের মধ্যে একান্তমনে কেবল পরমেশ্বরকে ডাকিতে লাগিলাম।"[৪]

রাসসুন্দরী দাসীর এই মনোবেদনার মধ্য দিয়ে বাল্যবিবাহের ফলে সেকালে এদেশের নারীদের মনোবেদনার দিকটিও সহজেই অনুমান করা যায়। কেননা যে বয়সে তাঁদের পারিবারিক স্নেহাশ্রয়ে লালিত-পালিত হবার কথা সে বয়সেই তাঁদের শ্বশুরবাড়ির সাংসারিক জীবনে বন্দী করে ফেলা হয়। সারদাসুন্দরী দেবীরও বিয়ে হয়েছিল ন'বছর বয়সে বাল্যকালে এবং রাসসুন্দরীর মতো শ্বশুরবাড়ির অপরিচিত লোকদের কথা ভেবে তাঁরও বালিকাসুলভ কোমল মন অজানা আতঙ্কে ক্রন্দন করে উঠতো। যদিও শাস্ত্রীয় বিধান এবং রক্ষণশীল সমাজের চাপে সারদাসুন্দরী তাঁর মেয়েদেরও বাল্যকালে বিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন তবুও তিনি নিজের জীবন অভিজ্ঞতা দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন যে, মেয়েদের বাল্যকালে বিয়ে না দিয়ে পরিণত বয়সে বিয়ে দিলে এসব অজানা আতঙ্কে কোন নারীর কোমল হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হবে না। প্রসন্নময়ী দেবী এবং নিস্তারিণী দেবীর বিয়ে হয়েছিল যথাক্রমে দশ বছর এবং বারো বছর বয়সে। মনোদা দেবী দাশগুপ্তার দিদির বিয়ে হয়েছিল এগারো বছর বয়সে। তবে সে সময় এদেশে আট-নয় বৎসরে গৌরীদান প্রচলিত থাকায় বাড়ির মেয়েরা একটু বড়ো হলেই যেন বিয়ে দেওয়ার জন্য অভিভাবকদের কপালে চিন্তার ভাজ পড়তো, রাতের নিশ্চিন্ত ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতো। তাই মনোদা দেবীর দশ বছর, মনোদা দেবীর কাকাতো দিদি ও কাকাতো বোনের বয়স যথাক্রমে এগারো ও নয় হলে বাড়ির অভিভাবকরা তাঁদের বিয়ে নিয়ে এতটাই চিন্তিত ছিলেন যে, আর বিলম্ব না করে শীঘ্রই যাতে তাঁদের তিন বোনের একই দিনে একই সঙ্গে বিয়ে দেওয়া যায় তার জন্য সকলে মিলে পাত্র খোঁজার চেষ্টা করতে লাগলেন। এমনকি মনোদা দেবীর কাকাতো দিদি এগারো বছর বয়সেও অবিবাহিতা থাকায় তাঁকে লোকলজ্জার ভয়ে অভিভাবকরা অন্যকোন বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে নিয়ে যেতেন না। কেননা মনোদা দেবীর কাকাতো দিদি যেখানে এগারো বছর বয়সেও অবিবাহিতা ছিলেন সেখানে সেকালের নিয়ম অনুযায়ী দশ বছরের মধ্যেই এদেশের অধিকাংশ মেয়ের বিয়ে হয়ে যেতো। মনোদা দেবী দাশগুপ্তা *জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী* গ্রন্থে লিখেছেন—

''খুড়তুতো বড়ো বোনটির বয়স ১১।। এগারো বৎসর, আমার বয়স ১০ ও খুড়তুতো ছোটো বোনটির বয়স ৯ বৎসর মাত্র, ইহাতেই নাকি আমার দিদিমার চক্ষের নিদ্রা ঘুচিয়া গিয়াছিল মেয়েরা বড়ো হইয়াছে বলিয়া! কোন বাড়িতে

খাওয়ার নিমন্ত্রণ হইলে ছোটো দিদিকে নেওয়া হইত না, অত বড়ো অবিবাহিতা মেয়েকে ঘরের বাহির অর্থাৎ অন্যের বাড়িতে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব হইত না!"[৫]

উনিশ শতকে এদেশে অনেক সময় এত কম বয়সে নারী ও পুরুষের বিয়ে হতো যে সেই বিয়ের কথা বড় হয়ে তাদের ঠিক মতো মনেই থাকতো না। বিনোদিনী দাসীর মাতামহী আড়াই বছরের এক মাতৃহীন বালিকার সঙ্গে বিনোদিনীর পাঁচ বছরের ভাইয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। বিনোদিনী দাসীরও এত অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল যে বড় হয়ে সেই বিয়ের কথা তাঁর মনে ছিল না, পরবর্তীকালে যখন তিনি লোকের মুখে শুনেছিলেন তাঁর বিয়ে হয়েছিল তখন সেই বরের সঙ্গে শৈশবে একসঙ্গে খেলাধূলার স্মৃতি তাঁর আবছা মনে পড়ে। কেননা বিনোদিনীর স্বামী বিয়ের পর বিনোদিনীর বাড়িতেই থাকতেন, পরে তিনি তাঁর মাসিমার বাড়ি চলে গিয়েছিলেন এবং সেখানে গিয়ে আরেকটি বিয়ে করেছিলেন। বিনোদিনী দাসী *আমার কথা* গ্রন্থে তাঁর সেই বাল্যবিবাহের কথা বলতে গিয়ে জানিয়েছেন—

> ''শুনিয়াছি আমারও বিবাহ হইয়াছিল এবং এ কথায় যেন মনে পড়ে যে আমার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড়ো একটি সুন্দর বালক ও আমার ভ্রাতা, বালিকা ভ্রাতৃবধূ আর প্রতিবেশিনী বালিকা মিলিয়া আমরা একত্রে খেলা করিতাম। সকলে বলিত ওই সুন্দর বালকটি আমার বর।"[৬]

সুদক্ষিণা সেন আমাদের শুনিয়েছেন তাঁর এক প্রতিবেশিনী পার্বতী মাসির কথা। এই পার্বতীর বিয়ে হয়েছিল শৈশবে মাত্র আড়াই বছর বয়সে এক বালকের সঙ্গে, আর পাঁচ বছর বয়সেই তিনি বিধবা হয়েছিলেন— এ এক আশ্চর্য রূপকথার গল্প বলে মনে হয়, মনে হয় বাস্তবের সঙ্গে এরকম ঘটনার কোন সম্পর্ক নেই। কেননা পাঁচ বছর বয়সে মানুষ যখন নিতান্ত শিশু থাকে, যে বয়সের স্মৃতি বড় হওয়ার পর মানুষের মন থেকে অনেকটাই মুছে যায়, সেই বয়সে কীভাবে একজন বিধবা হতে পারেন? এযুগে দাঁড়িয়ে আমরা তা কল্পনা করতে পারি না। কিন্তু উনিশ শতকে এদেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকায় এধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটতো— যার ফলে অনেক নারীর জীবন শুরু হওয়ার আগেই শেষ হয়ে যেতো, অথচ বিয়ে- বিধবা হওয়া ইত্যাদির কোন স্মৃতিই তাঁর মনে পড়তো না। আবার উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যখন বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তখন অনেকেই বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতন হয়ে বাল্যবিবাহ করতে না চাইলেও অনেক সময় পরিবারের মানুষরা জোর করেই বাল্যকালেই তাঁদের বিয়ে দিয়ে দিতেন। সুদক্ষিণা সেন *জীবন স্মৃতি* গ্রন্থে

জানিয়েছেন, তাঁর দাদা বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে ছিলেন এবং বাল্যকালে বিয়ে করাকে পাপকর্ম বলেই মনে করতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর দাদাকে তাঁর কাকারা একপ্রকার জোর করেই বাল্যকালে বিয়ে দিয়েছিলেন। এমনই ছিল সেকালের রীতি— সেকালে এদেশের পিতা-মাতা ও অভিভাবকেরা এভাবেই নিজেদের ইচ্ছানুসারে জোর করে বাল্যকালেই তাঁদের সন্তানদের বিয়ে দিয়ে দিতেন। এর ফলে অনেক সময় বড় হয়ে পাত্র-পাত্রীর মনের মিল না হওয়ায় দাম্পত্য জীবন বিষময় হয়ে উঠতো। আবার অল্পবয়সে সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে অনেক নারীর শরীর অল্প বয়সেই ভেঙে যেতো। কৃষ্ণভাবিনী দাসী স্বামী দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডে গিয়ে সেখানকার মানুষদের সামগ্রিক জীবনচর্যা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং সে সময়কার ইংরেজ নারী-পুরুষের বিয়ের সঙ্গে এদেশের নারী-পুরুষের বিয়ের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে তিনি *ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা* গ্রন্থে বলেছেন—

> ''ইংলণ্ডে স্ত্রীলোক কিংবা পুরুষ কেহই নিজ ইচ্ছা ব্যতিরেকে কখনও বিবাহ করে না, এবং এদেশীয় পিতামাতারাও কখনও বলপূর্ব্বক বিবাহ দিয়া পুত্রকন্যার জীবনে কণ্টক রোপন করেন না। ... ইংরাজদিগের যে বয়সে বিবাহ হয়, আমাদের দেশে সে বয়সে লোকের পুত্র কন্যা, এবং কখনো কখনো দৌহিত্র পৌত্রও হইয়া থাকে। এই বাল্যবিবাহ ও জলবায়ুর দোষে ভারতবর্ষে অতি অল্প বয়সেই লোকে বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয় ...।''[৭]

মানকুমারী বসুর বিয়ে হয়েছিল দশ বছর বয়সে বিবুধশঙ্কর বসুর সঙ্গে। মানকুমারী বসু তাঁর বাল্যবিবাহের কথা বলতে গিয়ে জানিয়েছেন, বাল্যবিবাহের ফলে এদেশের অনেক নারীর জীবন দুঃখময়-যন্ত্রণাময় হয়ে ওঠে। কেননা বাল্যকালে বিয়ে দেওয়ার ফলে অল্পবয়সী পাত্রের চরিত্র গঠন সম্পূর্ণ হয় না। তাই পরবর্তীকালে যদি সেই পাত্র কোন কারণে চরিত্রহীন ও লম্পট হয় তাহলে তাঁর স্ত্রীর জীবনে নেমে আসে এক অদ্ভুত আঁধার, আর পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীকে এমনভাবে বন্দী করে রেখেছে যে স্বামী চরিত্রহীন হলেও তার স্ত্রী তাকে ত্যাগ করতে পারে না। স্বাভাবিকভাবেই সেই চরিত্রহীন স্বামীর সঙ্গে সংসার করতে গিয়ে তার স্ত্রীর জীবন দুঃখময় হয়ে ওঠে। আবার অল্পবয়সে বিয়ে হওয়া পাত্র-পাত্রী দু'জন দু'জনকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারে না এবং প্রেমের যথার্থ তাৎপর্য অনুধাবন করতে না পারার ফলে তাদের দাম্পত্য জীবন নিষ্প্রাণ হয়ে ওঠে। যদিও মানকুমারী বসু মাত্র উনিশ বছর বয়সে বিধবা হয়েছিলেন তবুও তিনি জানিয়েছেন, তাঁর বাল্যকালে বিয়ে হলেও স্বামী বিদ্বান, ধার্মিক ও চরিত্রবান হওয়ায় স্বল্পকালীন দাম্পত্য জীবনে তিনি দুঃখের হাত

থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন। এভাবে আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলিতে বিভিন্ন জনের লেখায় উনিশ শতকে এদেশের নারী-পুরুষের বাল্যবিবাহ এবং তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার একটা সামগ্রিক চিত্র আমরা পেয়ে যাই।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থান ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের। বাল্যবিবাহের ফলে উনিশ শতকে এদেশের নারীরা বাল্যকালেই শ্বশুরবাড়ির সাংসারিক জীবনে বন্দী হয়ে পড়তো। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মনু সাংসারিক কাজকর্ম করা, স্বামী ও গুরুজনদের সেবা করা, স্বামীকে যৌনসুখ দেওয়া, সন্তান বিশেষত পুত্র সন্তান উৎপাদন ও পালন ইত্যাদিকে নারীর সামাজিক কর্তব্য হিসেবে নির্দিষ্ট করেছেন। এ থেকে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীকে ব্যবহার করা হয়েছে দাসী হিসেবে, সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে— এর বাইরে নারীর কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়নি। বাল্যকালে বিয়ে হয়ে রাসসুন্দরী দাসী যখন শ্বশুরবাড়িতে যান তখন প্রথম কয়েক বছর তাঁকে কোনো সাংসারিক কাজকর্ম করতে হয়নি। কেননা তাঁর শাশুড়ি সংসারের যাবতীয় কাজ করতেন এবং তাঁকে কোন কাজ করতে দিতেন না। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন তাঁর শাশুড়ি অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন সংসারের যাবতীয় কাজের দায়িত্ব তাঁর কাঁধে এসে পড়ে। রাসসুন্দরীর শ্বশুরবাড়ি একান্নবর্তী পরিবার না হলেও দাস-দাসী প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশজন থাকায় তাদের জন্যও দু'বেলা রান্না করতে হতো রাসসুন্দরীকে। এছাড়া পরিবারের লোকজনদের জন্য রান্না করা, বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের সেবায় অন্নব্যঞ্জন ভোগ দেওয়া, মাঝে মাঝে বাড়িতে উপস্থিত পথিকদের খাওয়ানো ইত্যাদি কাজ রাসসুন্দরীকে একা হাতে করতে হতো, কেননা তাঁদের বাড়িতে কাজ করার জন্য অনেক দাস-দাসী থাকলেও ঘরের কাজের জন্য বা রান্নার কাজ করার জন্য তখন কোনো দাসী ছিল না। আবার সংসারে খাওয়া-দাওয়ার কর্ম শেষ করে অবসর সময়ে রাসসুন্দরীকে অসুস্থ শাশুড়ির সেবা করতে হতো। রাসসুন্দরী জানিয়েছেন, আঠারো থেকে একচল্লিশ বছরে সবমিলিয়ে তিনি বারোটি সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। এসময় থেকেই পুত্র-কন্যা, দাস-দাসী, স্বামী— এদের নিয়ে রাসসুন্দরীর সংসার আরও বড়ো হতে থাকে। কিন্তু এসময় রাসসুন্দরীর সংসার বড়ো হতে থাকলেও পূর্বের মতো ঘরের কাজের জন্য কোনো দাসী ছিল না। ফলে এতগুলি সন্তানের জন্মদান ও তাদের পালন করা এবং ঘরে রান্না-বান্নার কাজ একা হাতে করার জন্য রাসসুন্দরী খুব সকালে ঘুম থেকে উঠতেন এবং পুত্র-কন্যাদের ঘুম থেকে ওঠার আগেই সাংসারিক কাজ শুরু করে দিতেন। তবুও সন্তানদের খাওয়ানো এবং সাংসারিক কাজ শেষ হতে প্রতিদিনই প্রায় বেলা তিনটে-চারটে

বেজে যেতো। রাসসুন্দরীর ভাষায়—

> ''আমি ওই ছেলেগুলি নিদ্রিত থাকিতে থাকিতে প্রভাতে উঠিয়া ঘরের সকল কাজ করিতাম। ওই ছেলে কয়েকটি না উঠিতে অন্ন পাক করিতাম। উহাদের খাওয়ানো হইলে পরে অন্যান্য কাজ মিটাইয়া বিগ্রহ-সেবায় যাহা দিতে হয় তাহা সমুদয় দিয়া, আমাদের ঘরের রান্নার সকল আয়োজন করিয়া পাক করিতাম। সে পাকও নিতান্তও কম নহে। এক সন্ধ্যায় দশ বারো সের চাউল পাক করিতে হইত। এদিকে বাটীর কর্তাটির স্নান হইলেই ভাত চাই, অন্য কিছু আহার করিতে বড়ো ভালোবাসিতেন না। এজন্য অগ্রে তাঁহার জন্য এক প্রস্থ পাক হইত। পরে অন্যান্য সকল লোকজনের জন্যে পাক হইত। এই প্রকার পাক করিতেই প্রায় বেলা তিন চারিটা গত হইত।''[৮]

এভাবে একা হাতে সন্তান পালন এবং সংসারের যাবতীয় কাজ করতে গিয়ে কোন কোন দিন দু'বেলা আবার কোন কোন দিন একবেলাও খাবার অবসর মিলতো না রাসসুন্দরীর। রাসসুন্দরী জানিয়েছেন যে, এভাবে সন্তান পালন ও সংসারের কাজ করতে গিয়ে একবার পর পর দু'দিন তাঁর খাওয়াই হয়নি। তাঁর এই পর পর দু'দিন না খেয়ে থাকার কথা তিনি কাউকেই বলেননি এবং কেউ জানতেও চাননি। রাসসুন্দরীর স্বামী ছেলেরা কাঁদলেই তার কারণ জানতে চান অথচ রাসসুন্দরীর কোনো খবর নেওয়ার প্রয়োজন তিনি মনে করতেন না। আসলে উনিশ শতকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীকে দাসীর মতোই ব্যবহার করা হতো। কেননা বাড়ির দাসী সংসারের যাবতীয় কাজ করে সকলের সেবা করলেও আমরা যেমন তার ভালো-মন্দের খবর রাখার প্রয়োজন বোধ করি না, তেমনি উনিশ শতকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে এদেশের নারীরা সংসারের যাবতীয় কাজ করে সকলকে খেতে দিয়ে সকলের সেবা করলেও তাঁর ভালো-মন্দের কোনো খবরই কেউ রাখতেন না। সন্তান পালন ও সাংসারিক কাজকর্ম করতে গিয়ে কোন নারী যদি অসুস্থও হতেন তবুও তাঁর স্বামী তাঁর শারীরিক অসুস্থতার ব্যাপারে উদাসীন থাকতেন। আমোদিনী দাশগুপ্ত *আমার জীবন-কাহিনি* গ্রন্থে জানিয়েছেন, একবার তাঁর জ্বর হলে স্বামী নিজে চিকিৎসক হয়েও প্রথমদিকে তাঁর চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই করেননি। পরে যখন তাঁর অবস্থার অবনতি হয় তখন তাঁর স্বামী তাঁর চিকিৎসা শুরু করেছিলেন। এমনই ছিল সেকালে এদেশের নারীদের সামাজিক অবস্থান— পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী যেন দাসী ছাড়া আর কিছুই নয়।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীকে সাংসারিক কাজকর্মের মধ্যে বন্দী করে তাদের দাসীর মতো ব্যবহার করে, একাজে অনেক সময় তাদের সহায়ক হয় কিছু বয়স্কা মহিলা— যারা শাশুড়ি, পিসি শাশুড়ি প্রভৃতি নামে পরিচিত। বিয়ের পর যেহেতু নারীদের শ্বশুরবাড়ির বয়স্কা মহিলাদের অধীনে থেকেই সাংসারিক কাজকর্ম করতে হয় সেহেতু এই বয়স্কা মহিলারাও অনেক সময় কারণে-অকারণে নববধূদের নানাভাবে শোষণ করতো— এর পেছনেও রয়েছে জটিল নারী মনস্তত্ত্ব। সারদাসুন্দরী দেবী *আত্মকথা* গ্রন্থে জানিয়েছেন, যদিও তাঁর ন'বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল এবং সেকালের নিয়ম অনুযায়ী তিনি এক বছর পিতৃগৃহে থেকে দশ বছর বয়সে শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছিলেন তবুও তাঁর শাশুড়ি তাঁকে দশ বছরের অধিক বয়স্ক বলে মনে করতেন। তাই সারদাসুন্দরীর শাশুড়ি সারদাসুন্দরীকে সেকালের তুলনায় অধিক বয়স্ক মনে করে তাঁর প্রতি কিছুটা বিরূপ ছিলেন। সেজন্য বালিকা সারদাসুন্দরীর সাংসারিক কাজে সামান্য ভুল-ত্রুটিও তাঁর শাশুড়ি সহ্য করতে পারতেন না এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি সারদাসুন্দরীর সেই ভুল-ত্রুটির কথা স্বামীকে জানিয়ে দিয়ে বউমা সারদাসুন্দরীকে অপদস্থ করতেন। সারদাসুন্দরীর বড়ো জা এবং সারদাসুন্দরী— দুই জা মিলে শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে থাকতেন এবং সংসারের যাবতীয় কাজ করতেন সেই বালিকা বয়স থেকেই। যদিও তাঁদের সংসারে দাস-দাসীর কোনো অভাব ছিল না তবুও শাশুড়ি দাসীদের ঘরের কাজ করতে দিতেন না— কেননা সারদাসুন্দরীর শাশুড়ি তাঁদের দিয়েই সংসারের সকল কাজ করাতে চাইতেন। ফলে সংসারের অনেক কাজ করতে গিয়ে বালিকা বয়সে সারদাসুন্দরী এবং তাঁর বড়ো জা দু'জনেই ক্লান্ত হয়ে যেতেন— তার বর্ণনায় সারদাসুন্দরী দেবী লিখেছেন—

> ''আমার বড়ো জা (জয়পুরের যদুনাথ সেন ও নরেন্দ্রনাথ সেনের মা) ও আমি একত্রে ঘর করিয়াছি। আমার সঙ্গে তাঁর বেশ ভাব ছিল। সংসারের কাজ আমরা দুজনে ভাগ করিয়া করিতাম। ... আমাদের অনেক দাস দাসী ছিল, কিন্তু আমার শাশুড়ি দাসীকে ঘরে আসিতে দিতেন না। সেই বড়ো বড়ো ঘরগুলি আমাদের ধুইতে হইত। কোনো রকমে কষ্টে সৃষ্টে যদি ধুইতাম, কিন্তু ন্যাকড়া দিয়া মুছিতে পারিতাম না, অত বড়ো ঘর মুছিবার ন্যাকড়া হাতে ধরিতে পারিতাম না।''[৯]

সেকালে নারীদের সাংসারিক কাজকর্মের পরে আবার গুরুজনদের সেবা করতে হতো। তাই সারদাসুন্দরী সংসারের যাবতীয় কাজ করার পরেও সাধ্যমতো শাশুড়ির সেবা করেছিলেন।

প্রাচীনকালে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ছিল এবং এই নারীপ্রধান সমাজে সন্তানের পরিচয় হতো

মায়ের পরিচয়ে, সেখানে সন্তানের বাবার পরিচয় জানার প্রয়োজন হতো না। পরবর্তীকালে মানুষ যখন কৃষিকাজ শুরু করল তখন থেকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষের প্রাধান্য সূচিত হয় এবং এই পুরুষতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার জন্যে পুরুষের সন্তানের বিশেষত পুত্রের প্রয়োজন হয়। আর পুরুষের সন্তান তথা পুত্রকে নির্দিষ্ট করার জন্য মূলত এই সময় থেকেই বিবাহ প্রথার উদ্ভব হয় এবং নিয়ম করা হয় বিয়ের পর নারী স্বামীর বাড়িতেই থাকবে, যাতে নারী অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে গর্ভবতী না হয়ে পড়ে। কেননা তাহলে নারী তার গর্ভজাত শিশুর পিতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারলেও তার স্বামীর পক্ষে তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না। সেজন্য পুরুষতান্ত্রিক সমাজ পুরুষের ঔরসজাত সন্তানকে নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করার জন্য শুধুমাত্র বিয়ের পর নারীকে শ্বশুরবাড়িতে পাঠিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, নারীর জন্য একটিমাত্র বিয়েরই বিধান দিয়েছে এবং নারীকে পরপুরুষের কাছ থেকে আড়াল করে রাখার জন্য অন্দরমহল বা অন্তঃপুরেরও ব্যবস্থা করেছে কৌশলে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের এই মনোভাব প্রসঙ্গে তন্দ্রিতা ভাদুড়ী বলেছেন—

> ‘‘নারী থাকবে শুধুমাত্র পুরুষের বংশরক্ষার যন্ত্র হিসেবে। এবং এই সন্তান মানে পুরুষের উত্তরাধিকার একান্তই সেই পুরুষ স্বামীটির কিনা সেইজন্য নারীকে থাকতে হবে অন্য যৌনসংস্রব ছাড়া অন্ধকার কারাগার সমকক্ষ অন্দর মহলে। যাতে স্বামী পুরুষটি নিশ্চত হয় যে পুত্র সন্তানটি এসেছে তা তারই, অন্য কোন পুরুষের ঔরসজাত নয়।’’[১০]

অন্তঃপুর বা অন্দরমহলে নারীদের বন্দী করে রাখার জন্য পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না দিয়ে সাংসারিক কাজকর্মের মধ্যে বন্দী করে রেখেছিল। এই অন্তঃপুর বা অন্দরমহল ছিল বাইরের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। সেখানে কোনো প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ যেতে পারতো না, এমনকি বিবাহিত পুরুষরাও দিনের বেলায় তাদের স্ত্রীর কাছে যেতে পারতো না— কেননা সেখানে অনেক নারী থাকত। তাই বিবাহিত পুরুষ শুধু রাতে শোবার ঘরে স্ত্রীকে কাছে পেতো। নারীরাও কোন পুরুষের সামনে বেরোত না এবং কথা বলতো না। এমনকি দিনের বেলা স্বামীর সঙ্গে কোন কারণে স্ত্রীর দেখা হয়ে গেলেও কথা বলা নিষিদ্ধ ছিল। উনিশ শতকেও বাংলাদেশের নারীদের অন্তঃপুরে বা অন্দরমহলে বন্দী জীবন কাটাতে হতো। আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলির লেখিকারা প্রায় সকলেই অন্দরমহলের জীবন কাটিয়েছেন। উনিশ শতকের প্রথমদিকে এদেশের অন্তঃপুর বা

অন্দরমহল ব্যবস্থা যে কতটা কঠোর ছিল তার পরিচয় পাই আমরা রাসসুন্দরী দাসীর *আমার জীবন* গ্রন্থে। রাসসুন্দরী দাসী তাঁর সাংসারিক জীবনের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, শাশুড়ি অসুস্থ হলে শ্বশুরবাড়ির অন্তঃপুরে থেকে তাঁকে সংসারের যাবতীয় কাজ করতে হতো। সে সময়ের অন্তঃপুর ব্যবস্থা অনুযায়ী তিনি কোন পরপুরুষের সামনে যেতেন না, এমনকি দিনের বেলায় কোন কারণে হঠাৎ স্বামীর সঙ্গে দেখা হলেও কথা বলতে পারতেন না। এই অন্তঃপুর ব্যবস্থার কঠোর সামাজিক অনুশাসন মেনে চলতে চলতে তা রাসসুন্দরীর মনে এমন দৃঢ়ভাবে গেঁথে যায় যে, তিনি স্বামীর জয়হরি নামে ঘোড়ার সামনে যেতেও লজ্জাবোধ করতেন। আসলে অন্তঃপুর ব্যবস্থার কড়াকড়ির জন্যই উনিশ শতকের প্রথমদিকে এদেশের গৃহবধূরা আরও লজ্জাশীলা হয়ে উঠেছিলেন। তাই রাসসুন্দরীর মনে হয়েছিল দিনের বেলা যেমন স্বামীর সামনে যাওয়া যায় না, তেমনি স্বামীর ঘোড়ার সামনেও যাওয়া অনুচিত। বাড়ির উঠোনে জয়হরি ঘোড়া প্রতিদিন ধান খেতো আর রাসসুন্দরী কোন কারণে যদি উঠোনে যেতেন তাহলে স্বামীর জয়হরি ঘোড়াটি যাতে তাঁকে না দেখে সেজন্য তিনি সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃপুরে চলে যেতেন। উনিশ শতকের প্রথমদিকে এমনই কঠোর ছিল অন্তঃপুর বা অন্দরমহল ব্যবস্থার সামাজিক নিয়ম-কানুন।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজের এই অন্তঃপুর বা অন্দরমহল ব্যবস্থাকে সেকালের কিছু শিক্ষিত প্রগতিশীল মানুষ কিছুটা অতিক্রম করতে পারলেও পুরোপুরি অতিক্রম করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কৈলাসবাসিনী দেবী *ডায়েরী* গ্রন্থে জানিয়েছেন, স্বামী কিশোরীচাঁদ মিত্র ম্যাজিস্ট্রেট এবং প্রগতিশীল ছিলেন বলে তিনি স্বামীর কর্মসূত্রে স্বামীর সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং সেকালের অন্তঃপুর বাসিনী নারীদের তুলনায় অনেকটাই স্বাধীনতা ভোগ করেছেন। নাটরে তাঁর স্বামী যখন কর্মরত ছিলেন তখন স্বামীর সঙ্গে তিনিও সেখানে গিয়েছিলেন এবং তিনি এসময় স্বামীর সঙ্গে বাইরে ঘুরতে যেতেন এবং কখনো কখনো স্বামীর সঙ্গে দিনের বেলা একসঙ্গে তাসও খেলেছেন। তবে এসময় কৈলাসবাসিনী অন্য নারীদের সঙ্গে বাগানে ভ্রমণ করলেও যদি কোন নারীর সঙ্গে তাঁর স্বামী থাকতেন তাহলে তিনি সেই নারীর সঙ্গে বেরোতেন না, আবার কৈলাসবাসিনীর সঙ্গে তাঁর স্বামী থাকলে অন্য নারীরাও তাঁর সঙ্গে বেরোতেন না। অর্থাৎ সেকালে প্রগতিশীলরা অন্তঃপুরের খাঁচা থেকে বেরিয়ে এলেও অন্তঃপুরের সামাজিক অনুশাসন পুরোপুরি অতিক্রম করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই কৈলাসবাসিনী স্বামীর সঙ্গে একসঙ্গে ভ্রমণ করতে, এমনকি তাস খেলতে পারলেও পরপুরুষের সামনে বেরোতে পারেননি।

প্রগতিশীলরা সেকালে এই অন্তঃপুর ব্যবস্থাকে কিছুটা অতিক্রম করতে পারলেও একথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে তাঁরা তা পেরেছিলেন নিজেদের পরিচিত সমাজ তথা পরিবারের বাইরে গিয়ে। কিন্তু নিজেদের পরিচিত সমাজ-পরিবারের মধ্যে থেকে এই অন্তঃপুর ব্যবস্থাকে অতিক্রম করা যে কতটা কঠিন ছিল তার পরিচয় আমরা পাই প্রসন্নময়ী দেবীর *পূর্ব্বকথা*-য়। প্রসন্নময়ী দেবী বাপের বাড়িতে লেখাপড়া শিখেছিলেন এবং শিক্ষিতা মে হিসেবে'কাটা কাপড়' তথা আধুনিক জামা-কাপড় পরিধান করতেন। শ্বশুর বাড়িতে যখন তিনি যান তখন যেহেতু এদেশের অধিকাংশ নারী অশিক্ষিতা ছিলেন সেহেতু তাঁর এই লেখাপড়া শেখার কথা জানতে পেরে প্রতিবেশিনীরা তাঁর কাছে পড়া শুনতে চাইলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতেন। আর তাঁর এই লেখাপড়া জানা এবং আধুনিক কাপড় পরিধানের জন্য তিনি প্রতিবেশিনীদের কাছে 'মেম বউ' বলে সমালোচিত হয়েছিলেন। কেননা তখন বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে ধীরে ধীরে নারী শিক্ষার সূচনা হলেও হিন্দু রক্ষণশীল সমাজ তখনও নারী শিক্ষার বিরোধী ছিল। ফলে তখনও এদেশের অধিকাংশ নারীই ছিল অশিক্ষিতা এবং তাঁরা সেকালের নিয়ম মেনে মোটা কাপড় পরিধান করতেন। তাই প্রসন্নময়ী দেবী সেখানে লেখাপড়া শিখে আধুনিক কাপড় পরিধান করে শ্বশুরবাড়ি এলে প্রতিবেশিনীদের চোখে তা বেমানান বলে মনে হয়েছিল— তাই তাঁরা তাঁকে ব্যঙ্গ করতেন। আর প্রসন্নময়ীর শাশুড়ি তা বুঝতে পেরে প্রসন্নময়ীকে সাবধান করে দিলে তিনি বেশিরভাগ সময় অন্দরমহলেই কাটাতেন, প্রতিবেশিনীদের দেখলে তখন সমালোচিত হবার ভয়ে আরো বেশি করে অন্দরমহলে নিজেকে গোপন করে রাখতেন। সেখানকার নিয়ম অনুযায়ী ভাশুর ও মামাশ্বশুর মান্য ব্যক্তি হওয়ায় তাঁদের ছায়া দর্শনও নিষিদ্ধ ছিল বলে প্রসন্নময়ী দেবী ভাশুর ও মামাশ্বশুরকে খুব শ্রদ্ধা করে চলতেন। তাঁর ভাষায়—

> ''... লোকজন সমাগত দেখিলেই গৃহের ভিতর লুকাইয়া রহিতাম, ঠাকুরানি হাত ধরিয়া বাহিরে না আনিলে কখনও কাহারও সম্মুখে আসিতাম না, কথা তো একেবারেই বন্ধ। পল্লিগ্রামের পূর্ব্ব নিয়মানুসারে ভাশুর ও মামা শ্বশুরই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর মান্যব্যক্তি, শ্বশুর পিতৃতুল্য, এই দুইজনকেই অত্যন্ত মানিয়া চলিতে হয়, তাঁহাদের ছায়া দর্শনও পাপজনক।''[১১]

সেকালের লেখাপড়া জানা মেয়ে প্রসন্নময়ী দেবীকেও সামাজিক চাপে মেনে নিতে হয়েছিল এই অন্দরমহল ব্যবস্থাকে এরং তিনি পরবর্তীকালে খুব নিষ্ঠার সঙ্গেই সেকালের রীতি-নীতিকে মেনে

চলতেন— যাতে শ্বশুরবাড়িতে ও প্রতিবেশিনীদের কাছে এর জন্য তাঁকে সমালোচিত হতে না হয়।

ইংল্যাণ্ডে গিয়ে কৃষ্ণভাবিনী দাসী সেখানকার স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্ককে দেখেছেন এবং তা সুন্দর ও যথার্থ বলে তাঁর মনে হয়েছিল। তিনি দেখেছিলেন একজন ইংরেজ পুরুষ ভ্রমণে গেলে কিংবা গির্জায় প্রার্থনা করতে গেলে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যান, আবার কোন কাজ করতে হলে ইংরেজ নারী-পুরুষ দুজনেই পরামর্শ করেই করেন। আর এর সঙ্গে আমাদের দেশের সেকালের স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে কৃষ্ণভাবিনী দাসী বলেছেন, আমাদের দেশের নারী-পুরুষের দাম্পত্য সংকটের মূলে রয়েছে নারীদের অন্দরমহলে বন্দী করে রাখার ব্যবস্থা। কেননা এই ব্যবস্থার ফলে যেহেতু নারীকে সারাদিন অন্দরমহলেই নানা সাংসারিক কাজ করতে হয় এবং স্বামীও চাইলে দিনের বেলা তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে পারেন না সেহেতু স্বামী কী করে সমস্ত দিন কাটান তা যেমন তাঁর স্ত্রী জানেন না, তেমনি স্ত্রীও সারাদিন কি করছেন তা জানাও স্বামীর পক্ষে সম্ভব হয় না। আবার সেকালের রীতি অনুযায়ী স্ত্রী অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে স্বামীর সঙ্গে কোথাও ঘুরতে যেতে পারতেন না— শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রীর দেখা হতো রাতে শোবার ঘরে। ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন সম্পর্কই তৈরি হতো না। এভাবে কৃষ্ণভাবিনী দাসী সেকালের অন্দরমহল ব্যবস্থার সমালোচনা করেছেন। আবার এই অন্তঃপুর বা অন্দরমহল ব্যবস্থা যে কখনো কখনো নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই কষ্টকর হয়ে উঠতো তার পরিচয় আমরা পাই নিস্তারিণী দেবীর *সেকেলে কথা*-য়। নিস্তারিণী দেবী জানিয়েছেন অন্যান্য কুলীন নারীর মতোই তিনিও বিয়ের পর বাপের বাড়িতেই থাকতেন এবং তাঁর কুলীন স্বামী বিবাহ ব্যবসায়ী হওয়ায় সবসময় বিয়ে করেই ঘুরে বেড়ান। একসময় তাঁর কুলীন স্বামী ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিজের বাড়িতে বসে পিলে রোগে কষ্ট পেতে থাকলে তাঁর মা জামাইয়ের এই কষ্ট দেখে চিকিৎসা করানোর জন্য জামাইকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। দীর্ঘদিন চিকিৎসার পর অনেক কষ্ট ভোগ করে নিস্তারিণীর স্বামীর পিলে রোগ কমে গেলেও দীর্ঘদিনের রোগভোগের ফলে আহারে তাঁর অরুচি দেখা দেয়, শরীর ভেঙে যায় এবং হাঁটতেও তাঁর কষ্ট হতো। ফলে দিনের বেলা নিস্তারিণীদের তেমহলা বিরাট বাড়ি ঘুরে হেঁটে খেতে আসতে নিস্তারিণীর স্বামীর প্রচণ্ড কষ্ট হতো। এদিকে নিস্তারিণীর বাড়ির পুরুষ মানুষরা নিস্তারিণীর স্বামীর প্রতি বিরক্ত থাকায় কেউ তাঁকে হেঁটে আসতে সাহায্য করতো না। আর স্বামীর এই কষ্ট দেখে নিস্তারিণী দেবী কষ্ট পেলেও স্বামীকে হেঁটে আসতে

তিনি সাহায্য করতে পারতেন না। কেননা সেকালের অন্দরমহল ব্যবস্থা অনুযায়ী যেখানে নারীদের সারাদিন অন্দরমহলেই থাকতে হতো এবং দিনের বেলা স্ত্রী তাঁর স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে বা কথা বলতে পারতো না সেখানে তিনি কেমন করে দিনের বেলা স্বামীকে হেঁটে আসতে সাহায্য করবেন? কাজেই উপায় না থাকায় স্বামীর দুঃখে নিজে দুঃখিত হয়েও মুখ বুজে তাঁকে তা সহ্য করতে হতো। স্বামীর কষ্টের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

> ''তখন দিনমানে স্বামীকে কারও দেখার যো ছিল না। তখনকার লজ্জায়, আর এখনকার লজ্জায়— আকাশপাতাল প্রভেদ। এখনকার লজ্জা বাহিরে, তখনকার লজ্জা মনের ভিতরকার। ... দিনের বেলা, তে মহল বাড়ি ঘুরে, খেতে আস্‌তে তাঁর বড়ো কষ্ট হ'ত। আমিও তাঁকে দিনমানে ধ'রে আনতে পারতাম না। অন্য সকলে তাঁকে তাচ্ছিল্য করত। তাঁর কষ্টের আর সীমা ছিল না।''[১২]

এভাবে অন্দরমহল বা অন্তঃপুর ব্যবস্থার বিধি-নিষেধের জন্য একদিকে যেমন স্বামীর সাহায্য করতে না পেরে নিস্তারিণী দেবী কষ্ট পেয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি নিস্তারিণী দেবীর সাহায্য না পেয়ে তাঁর স্বামীও কষ্টভোগ করেছেন।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তার উত্তরাধিকারী তথা সন্তানকে চিহ্নিত করার জন্য শুধু অন্তঃপুর বা অন্দরমহলে নারীদের কাজকর্মের মধ্যে বন্দী করেই ক্ষান্ত হয়নি, নারীদের জন্য ঘোমটা দেওয়া তথা আব্রুপ্রথারও প্রবর্তন করেছিল। এই আব্রুপ্রথা অনুযায়ী অন্তঃপুরেও বাড়ির বউদের ঘোমটা দিয়ে সাংসারিক কাজকর্ম করতে হতো এবং হঠাৎ কোন কারণে পরপুরুষ এমনকি নিজের স্বামীর সামনে পড়ে গেলেও বাড়ির বউদের আরো বড়ো করে ঘোমটা টানতে হতো। আসলে পুরুষের দৃষ্টি থেকে বাড়ির বউদের আড়াল করার জন্যই এই আব্রুপ্রথার প্রবর্তন করা হয়েছে— যাতে কোন পুরুষ বাড়ির বউদের প্রতি আকৃষ্ট না হয়। উনিশ শতকেও এদেশের সমাজে আব্রুপ্রথা বা বাড়ির বউদের ঘোমটা দেওয়ার ব্যাপারে খুবই কঠোর নিয়ম ছিল। সেসময় নিয়ম ছিল যেসকল বউ অন্তঃপুরে বড়ো করে ঘোমটা দিয়ে কারো সাথে কথা না বলে সংসারের সমস্ত কাজ করে তারাই আদর্শ বউ, আর যেসকল বউ এসব সামাজিক নিয়ম-কানুন মানতো না তারা সকলের দ্বারা তিরস্কৃত হতো। তাই সেকালের আব্রুপ্রথার নিয়ম অনুযায়ী রাসসুন্দরী দাসী শ্বশুরবাড়ির অন্তঃপুরে মোটা কাপড় পরিধান করে বুক পর্যন্ত ঘোমটা টেনে সংসারের যাবতীয় কাজ করতেন। তাঁর ভাষায়—

> ''বিশেষত তখন মেয়েছেলের এই প্রকার নিয়ম ছিল, যে বউ হইবে, সে

হাতখানেক ঘোমটা দিয়া ঘরের মধ্যে কাজ করিবে, আর কাহারও সঙ্গে কথা কহিবে না, তাহা হইলেই বড়ো ভালো বউ হইল। সেকালে এখনকার মতো চিকন কাপড় ছিল না, মোটা মোটা কাপড় ছিল। আমি সেই কাপড় পরিয়া বুক পর্যন্ত ঘোমটা দিয়া ওই সকল কাজ করিতাম। আর যে সকল লোক ছিল, কাহারও সঙ্গেই কথা কহিতাম না। সে-কাপড়ের মধ্য হইতে বাহিরে দৃষ্টি হইত না। যেন কলুর বলদের মতো দুইটি চক্ষু ঢাকা থাকিত। আপনার পায়ের পাতা ভিন্ন অন্য কোনো দিকে দৃষ্টি চলিত না। এই প্রকার সকল বিষয়ে বউদিগের কর্মের রীতি ছিল। আমি ওই রীতিমতেই চলিতাম।”[১৩]

অন্যদিকে প্রসন্নময়ী দেবী লেখাপড়া শিখেছিলেন এবং দীর্ঘদিন গ্রামবাংলার বাইরে থাকার ফলে এদেশের রীতি-নীতি সম্পর্কে তিনি পরিচিত ছিলেন না। তাই বিয়ের পর তিনি যখন শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে প্রতিবেশিনীদের সামনে এদেশের বউদের মতো লম্বা করে ঘোমটা টানতে অসমর্থ হয়েছিলেন তখন তিনি প্রতিবেশিনীদের কাছে তিরস্কৃত হয়েছিলেন। কেননা সেকালের এদেশের আব্রুপ্রথার নিয়ম অনুযায়ী লম্বা করে ঘোমটা দিতে না পারলে ভালো বউ হওয়া যায় না। তাই প্রসন্নময়ী দেবীর শাশুড়ি তাঁকে এসব ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছিলেন এবং পরর্তীকালে তিনি এদেশের নারীদের জন্য নির্দিষ্ট রীতি-নীতিকে মেনে চলতেন। আবার মনোদা দেবী দাশগুপ্তা জানিয়েছেন, সেকালের আব্রুপ্রথার নিয়ম অনুযায়ী তাঁর বাপের বাড়িতে অন্তঃপুরে মেয়ে-বউদের সাধারণত ঘোমটা টেনেই সাংসারিক কাজ করতে হতো। তবে তাঁর বাপের বাড়িতে চাল রাখার একটি ঘর ছিল এবং সেই ঘরটি একটু আড়ালে হওয়ায় সাধারণত বাড়ির কেউ সে ঘরে যেতো না বলে সাংসারিক কাজকর্মের পরে বা সাংসারিক কাজকর্মের মাঝে বাড়ির মেয়ে-বউরা সেই চাল রাখার ঘরটিতে গিয়ে ঘোমটা খুলে মনের আনন্দে গল্পগুজব করার অবকাশ পেতেন। মনোদা দেবী দাশগুপ্তা তাঁর বাবার বিরাট বাড়ির ছত্রিশটি ঘরের মধ্যে চাল রাখার ঘরটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন, কেননা ঐ ঘরটিতেই বাড়ির মেয়ে-বউরা ঘোমটার আবরণ খুলে বেরিয়ে আসার স্বাধীনতা পেতেন। আর এ থেকে আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, উনিশ শতকে এদেশে আব্রুপ্রথার কড়াকড়ি থাকলেও নারীরা কিন্তু এই আব্রুর অন্ধকারে বন্দী থাকতে চাইতেন না। তবে পুরুষতান্ত্রিক রক্ষণশীল সমাজের চাপে নারীরা আব্রুপ্রথাকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

উনিশ শতকেও যে প্রথাটির জন্য বাংলাদেশের কুলীন নারীরা দুঃখের-অবহেলার-বঞ্চনার

জীবন কাটাতেন সেটি হল কৌলীন্যপ্রথা। রাজা আদিসুর পুত্রেষ্টি যজ্ঞের জন্য কান্যকুব্জ থেকে বিদ্বান ও আচারনিষ্ঠ পাঁচজন ব্রাহ্মণ নিয়ে এসেছিলেন এবং তাঁদের বসবাসের জন্য পাঁচটি গ্রাম প্রদান করেছিলেন। কালক্রমে সেই পাঁচজন ব্রাহ্মণের ছাপান্ন জন সন্তান হলে আদিসুর আবার তাঁদের প্রত্যেকের বসবাসের জন্য একটি করে গ্রাম প্রদান করেছিলেন। এসব গ্রামের নামানুসারে তাঁদের বংশধররা অমুক গাঁই (গ্রাম) বলে পরিচিত হয়েছিলেন— এভাবে ছাপান্নটি গাঁইয়ের উদ্ভব হয়েছিল। পরবর্তীকালে আদিসুরের বংশ ধ্বংস হলে সেন রাজারা গৌড়ের অধিপতি হন। এই সেন বংশের উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন বল্লাল সেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে বল্লাল সেন গৌড়ের অধিপতি হয়ে লক্ষ করলেন কান্যকুব্জ থেকে যে পাঁচজন বিদ্বান ও আচার-নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ এদেশে এসেছিলেন তাঁদের বংশধরদের মধ্যে আচার-নিষ্ঠা ও বিদ্যার অভাব দেখা দিয়েছে— মূলত তা দূর করার জন্যই বল্লাল সেন কৌলীন্যপ্রথার প্রবর্তন করেছিলেন। বল্লাল সেন বিবেচনা করেছিলেন যদি আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপস্যা, দান— এই নয়টি গুণের দিক থেকে বিচার করে তিনি ছাপান্নটি গাঁইয়ের ব্রাহ্মণদের কৌলীন্য মর্যাদা বা বংশ মর্যাদা স্থির করেন তাহলে অনেকেই কৌলীন্য মর্যাদা রক্ষার জন্য বা বৃদ্ধির জন্য আচার, বিনয়, বিদ্যা ইত্যাদি নয়টি গুণ বজায় রাখার চেষ্টা করবেন। তাই বল্লাল সেন ছাপান্নটি গাঁইয়ের মধ্যে বন্দ্য, চট্ট, মুখুট্টী, ঘোষাল ইত্যাদি আট গাঁই উক্ত নয়টি গুণ বিশিষ্ট ছিলেন বলে তাঁদের কুলীনের মর্যাদা দিয়েছিলেন। পালধি, ভট্টাচার্য, বটব্যাল, কুশারি ইত্যাদি চৌত্রিশ গাঁই আটগুণ বিশিষ্ট ছিলেন বলে বল্লাল সেন এঁদের শ্রোত্রিয় হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন— এঁদের আবৃত্তি গুণ অর্থাৎ কন্যা আদান-প্রদান বিষয়ে এঁরা সতর্ক ছিলেন না। আর কেশরী, পিপলাই, গড়গড়ী ইত্যাদি চোদ্দ গাঁই সদাচারগুণ ভ্রষ্ট ছিলেন বলে বল্লাল সেন এঁদের গৌণ কুলীন হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। তবে এই তিন শ্রেণির ব্রাহ্মণ ছাড়াও বংশজ নামে আরেক শ্রেণির ব্রাহ্মণ রয়েছেন। বল্লাস সেন নয়টি গুণের ভিত্তিতে কৌলীন্য মর্যাদা দিতে গিয়ে ব্রাহ্মণদের বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করার সময় বংশজ শব্দটি শুধু উচ্চারণ করেছিলেন, কিন্তু তিনি বংশজ বলে ব্রাহ্মণদের কোন পৃথক শ্রেণিবিভাগ করেননি। পরবর্তীকালে বংশজ ব্যবস্থা হয়েছে— কুলীনের কন্যার ঘটনাচক্রে শ্রোত্রিয় পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হলে সেই কুলীন কুলভ্রষ্ট হন এবং এই কুলভ্রষ্ট কুলীনকে বলা হয় বংশজ ব্রাহ্মণ। এই বংশজ ব্রাহ্মণকে আবার তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। যথা—ক. শ্রোত্রিয় পাত্রে কন্যা দানকারী কুলীন বংশজ, খ. গৌণ কুলীনের কন্যা কোন কুলীন বিয়ে করলে কুলীন বংশজ এবং গ. বংশজ কন্যাকে কোন কুলীন পাত্র বিয়ে করলে তাকে বলা হয় কুলীন বংশজ।

এককথায় কোন ক্রমে কুলীনের কুলভ্রষ্ট হলেই তাঁকে কুলীন বংশজ বলা হয়। বল্লাল সেন কৌলীন্য মর্যাদা প্রদানের সময় আবৃত্তি অর্থাৎ বিয়ের ক্ষেত্রে কন্যা আদান-প্রদানের ব্যাপারে কিছু নিয়ম-নীতি নির্ধারণ করেছিলেন— কুলীনদের সঙ্গে কুলীনদের বিয়ে হবে। কুলীনরা শ্রোত্রিয়ের কন্যা বিয়ে করতে পারবে, তবে শ্রোত্রিয়ের সাথে কন্যার বিয়ে দিতে পারবে না— শ্রোত্রিয়ের সঙ্গে কন্যা বিয়ে দিলে কুলীনরা কুলভ্রষ্ট হবে। আর কুলীনরা গৌণ কুলীনের কন্যা বিয়ে করলে এককালে কুলভ্রষ্ট হবে।

বল্লাল সেনের কৌলীন্য মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দশ পুরুষ অতিক্রান্ত হলে কুলীনদের মধ্যে নয়টি গুণই লোপ পায় এবং কুলীনরা কুলক্ষয় দোষে দূষিত হয়ে ওঠে। তখন দেবীবর ঘটক বিশারদ কুলীনদের দোষ দেখে মেলবদ্ধ করেন। যেসকল কুলীন একরকম দোষে দুষ্ট দেবীবর তাঁদের এক সম্প্রদায়ে নির্দিষ্ট করে দেন— এই সম্প্রদায়ের নাম মেল। এই মেল শব্দের অর্থ দোষ মেলন অর্থাৎ দোষ অনুসারে সম্প্রদায় বন্ধন। পৃথক পৃথক দোষ অনুসারে দেবীবর তৎকালীন রাঢ়ী শ্রেণির কুলীনদের ছত্রিশটি মেলে বদ্ধ করেন। তবে দেবীবরের মেলবন্ধন অনুযায়ী এই ছত্রিশটি মেলের পরস্পরের মধ্যে বিয়ের বিধান ছিল না। গাঁই গোত্র মিলিয়ে প্রত্যেকটি মেলের একটি করে পালটি ঘর ছিল এবং সেই দুটি ঘরের মধ্যে কেবলমাত্র কন্যা আদান-প্রদান করা যাবে বলে দেবীবরের মেলবন্ধনে স্থির করা হয়। তাই কুলীন নারীর বিয়ের ক্ষেত্রে গাঁই গোত্র মিলিয়ে পালটি ঘরের উপযুক্ত কুলীন পাত্র সবসময় পাওয়া যেতো না। তাই মেলবন্ধন অনুযায়ী কুলীন পাত্রের অভাবে অনেক কুলীনই বহুবিবাহ করে বিবাহ ব্যবসায়ী হয়ে উঠল। বল্লাল সেন প্রবর্তিত কৌলীন্যপ্রথায় কুলীনরা পরস্পরের মধ্যে বিয়ে করতে পারতো— একে বলা হয় সর্বদ্বারী বিবাহ। ফলে বল্লাল সেন প্রবর্তিত কৌলীন্যপ্রথায় কুলীন নারীর বিয়ের ক্ষেত্রে পাত্রের অভাব হতো না। পরবর্তীকালে দেবীবরের মেলবন্ধন অনুযায়ী প্রত্যেক মেলের পালটি ঘরের কুলীন পাত্রের অভাবে অনেক সময় কুলীন কন্যাকে আজীবন অবিবাহিতা থাকতে হতো, আবার অনেক সময় কুলমর্যাদা রক্ষার জন্য অধিকাংশ অভিভাবকই উপযুক্ত কুলীন পাত্র না পেয়ে বহুবিবাহকারী বৃদ্ধ কুলীন পাত্রের সঙ্গে তাঁদের বালিকা কন্যার বিয়ে দিতে বাধ্য হতো। আর এই সুযোগে বহু কুলীন ব্রাহ্মণ কুলীন কন্যা বিয়ে করে কুল উদ্ধারের নাম করে প্রচুর বরপণ গ্রহণ করে বহু বিবাহ করতে থাকল। এভাবে কুলীন ব্রাহ্মণেরা বিবাহ ব্যবসায়ী হয়ে উঠেছিল এবং কুলীন নারীরা বিয়ের পরও বাপের বাড়িতে থেকে স্বামী সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হতো ও অনাদর-অবহেলায় তাদের জীবন বিষময় হয়ে উঠেছিল। আসলে দেবীবর

যখন কুলীনদের দোষ অনুযায়ী মেলবদ্ধ করলেন মূলত তখন থেকেই কৌলীন্যপ্রথা কুলীন নারীর জীবনে অভিশাপ হয়ে দাঁড়াল। আর কৌলীন্যপ্রথার এই অভিশাপ থেকে উনিশ শতকেও এদেশের নারীরা বিশেষত কুলীন নারীরা মুক্ত হতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী লিখেছেন—

> ''বাল্যবিবাহের চেয়েও গুরুতর সামাজিক সমস্যা ছিল কৌলীন্য প্রথা ও বহুবিবাহ। দ্বাদশ শতাব্দীতে বল্লাল সেন প্রবর্তিত কৌলীন্য প্রধা ধীরে ধীরে তার সামাজিক লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে এক ধরনের বিবাহ ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় এই প্রথা ভয়াবহ সামাজিক আকার ধারণ করেছিল।''[১৪]

আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলির কয়েকটিতে উনিশ শতকে বাংলাদেশের এই কৌলীন্যপ্রথাজনিত সামাজিক সমস্যাগুলির বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। কৌলীন্যপ্রথার ফলে সেকালে অনেক কুলীন ব্রাহ্মণের বরপণের লোভে বহুবিবাহ করে বিবাহ ব্যবসায়ী হয়ে ওঠা এবং কন্যাদায়গ্রস্ত কুলীন পিতার কুলরক্ষার জন্য কুলীন পাত্রের অভাবে কখনো কখনো মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধ কুলীন পাত্রে কন্যাদান প্রসঙ্গে প্রসন্নময়ী দেবী *পূর্ব্বকথা* গ্রন্থে বলেছেন—

> ''কুলীনগণ পূর্ব্বে শতাধিক বিবাহ করিতেন, তাহা একপ্রকার ব্যবসাই ছিল। সেই নজিরানুসারে অতি বৃদ্ধ গঙ্গাযাত্রী কুলীন ব্রাহ্মণগণের সন্ধান পাইবামাত্র বয়স্থা কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা, পিতামহগণ সেই ব্যক্তির সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না, বৈতরণীর ঘাটে কন্যা দিয়া অন্তর্জ্জলী করিয়া যাইতেন।''[১৫]

কৌলীন্যপ্রথার নিয়ম অনুযায়ী বংশজ কন্যা বিয়ে করলে কুলীনদের কুলক্ষয় হয়— কুলীন পাত্রের এই কুলক্ষয় বা কুলভঙ্গ করাকে বলা হতো করণ। সেজন্য কুলীনরা সাধারণত বংশজ কন্যা বিয়ে করতে চাইতো না কুলভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কায়। আবার বংশজরা কুলীন পাত্রে কন্যা দান করে বংশ মর্যাদা বৃদ্ধি করতে চাইতো— এক্ষেত্রে শুধু ধনবান বংশজরাই কুলীন পাত্রে কন্যা দান করে বংশ মর্যাদা বৃদ্ধি করতে পারতো। কেননা প্রচুর অর্থ অর্থাৎ বরপণ ছাড়া কোন কুলীনই কুলভ্রষ্ট হয়ে বংশজ কন্যা বিয়ে করে বংশজদের কুল মর্যাদা বৃদ্ধি করতে সম্মত হতো না। আর যেসকল ধনবান বংশজ তাদের কন্যাদের কুলীনপাত্রে দান করে বংশমর্যাদা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হতো তাদের বংশে সেটা চিরাচরিত নিয়মে পরিণত হতো। এভাবে বংশ পরম্পরায় কুলীন পাত্রে কন্যা দান করতে গিয়ে অনেক বংশজকেই সর্বস্বান্ত হতে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রসন্নময়ী দেবী লিখেছেন—

> ''কত কুলীনের কুলভঙ্গ করিয়া কন্যাগণের বিবাহ দিয়া অনেকেই নিঃস্ব হইয়া গিয়াছেন তথাপি 'কুলকার্য' ছাড়েন নাই। এইক্ষণেও সামাজিক লৌকিকতায় ও ভোজন দক্ষিণায় নিরাবিল কুলীনের সমান মর্যাদা পাইয়া থাকেন।''[১৬]

সুদক্ষিণা সেনের প্রপিতামহ রামনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কুলীন হয়েও অকুলীন ধনবান জমিদার বৈদ্যনাথ রায়ের কন্যা শচীদেবীকে বিয়ে করেছিলেন। এভাবে কুলীন পাত্রে কন্যাদান জমিদার রায় পরিবারের চিরাচরিত নিয়ম হয়ে দাঁড়ায় এবং তাঁরা অকুলীন হয়েও কন্যাকে বহু অর্থের বিনিময়ে কুলীন পাত্রে সম্প্রদান করে বংশ মর্যাদা বৃদ্ধি করতেন। একইভাবে প্রসন্নময়ী দেবীর পিতৃবংশ কুলীন না হলেও কুলীন পাত্রে কন্যাদান তাঁর পিতৃবংশের চিরাচরিত নিয়ম হয়ে দাঁড়ায়। আর এই নিয়ম অনুসারে প্রসন্নময়ীর বিয়ে হয়েছিল দশ বছর বয়সে এক দরিদ্র অযোগ্য কুলীন পাত্র কৃষ্ণকুমার বাগচীর সঙ্গে। প্রসন্নময়ীর ছোটো পিসি মৃণ্ময়ী দেবীর বিয়ের জন্য উপযুক্ত কুলীন পাত্র পাওয়া না গেলে তাঁর বিয়ে দেওয়া হয়েছিল এক বৃদ্ধ বিপত্নীক কুলীন পাত্র লাহিড়ী মহাশয়ের সঙ্গে। আর এভাবে যেসকল কুলীন ব্রাহ্মণ বহু অর্থের বিনিময়ে নিজেদের কুল ভেঙে বংশজ কন্যাকে বিয়ে করে বংশজদের কুলমর্যাদা বৃদ্ধি করতেন তাঁদের বলা হতো স্বকৃত ভঙ্গ বা ভঙ্গ কুলীন। স্বকৃত ভঙ্গ কুলীনদের সম্পর্কে নিস্তারিণী দেবী *সেকেলে কথা* গ্রন্থে বলেছেন—

> ''নিজের কুল ভাঙিয়া পরের মেয়ের বাপের কুলের উদ্ধার করিবার জন্য দৃঢ়ব্রত। আমাদের দেশের মধ্যে যাহারা নিজের ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং চৌমাথায় দাঁড়াইয়া অন্য সকলকে সেরূপ করিতে ডাকে, তাদের দেখিলেই আমার মনে হয়, তারা বুঝি স্বকৃত-ভঙ্গ! ... তখনকার ভালো কুলীন আপনার কুল ভঙ্গ করিয়া বিবাহ ক'রে নিজেদের তেজস্বী স্বকৃত-ভঙ্গ বলিয়া গৌরব করিতে পারিত; এখনকার ঢোঁড়া সাপের এই মেলের চক্রে প'ড়ে ভাতে হাত দিতে ছাইয়ে হাত দেয়।''[১৭]

নিস্তারিণীর পিতামহী জগদম্বা সংসারের অভাব দূর করার জন্য ভাই রামধনের সঙ্গে পরামর্শ করে পইতার সময় নেড়া মাথায় পুত্র হরচরণের বিয়ে দিয়েছিলেন বংশজ কন্যা ক্ষেত্রমণির সঙ্গে। এভাবে হরচরণ স্বকৃত ভঙ্গ কুলীন হলেন। আর এক্ষেত্রে হরচরণ যেহেতু কুলীন হয়ে কুলভঙ্গ করে বংশজ কন্যা বিয়ে করে বংশজদের কুলমর্যাদা বৃদ্ধি করেছিলেন সেহেতু ক্ষেত্রমণির পরিবার হরচরণকে অনেক টাকা বরপণ হিসেবে দিয়েছিলেন। নিস্তারিণীর পিতা হরচরণ দ্বিতীয়বারও নপাড়ার জমিদারের

বংশজ মেয়েকে তথা নিস্তারিণীর মাতা চন্দ্রমণিকে বিয়ে করেছিলেন। নিস্তারিণী দেবীরও বিয়ে হয়েছিল স্বকৃত ভঙ্গ বিবাহ ব্যবসায়ী কুলীন ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। উনিশ শতকে এদেশে বংশজদের কুলীনপাত্রে কন্যাদান করে বংশমর্যাদা বৃদ্ধি এবং কুলীনদের অর্থের প্রত্যাশায় কুলভ্রষ্ট হয়ে অকুলীন বংশজ কন্যা বিয়ে প্রসঙ্গে ১৮৩০ সালের ৪ ডিসেম্বর *সমাচার দর্পণ* পত্রিকায় লেখা হয়েছিল—

> ''কুলীনেরা যে কেবল কুলীনেরদের মধ্যেই আদানপ্রদান করিবেন এতদ্বিষয়ে বল্লালসেন আজ্ঞা করিলেন কি না তাহা আমরা অবগত নহি কিন্তু বহুকালাবধি ঐ কুলীনেরা নিষ্কুলের কন্যা বিবাহ করিতেছেন এবং অপরের মধ্যেও যাঁহার কুলীন জামাতা তিনি বংশের মধ্যে অত্যন্ত সম্ভ্রমবিশিষ্ট হন বাস্তবিক সকলেরি তদ্বিষয়ক অত্যন্ত চেষ্টা ও তাহাতে মর্য্যাদার বৃদ্ধি হয়। অতএব কুলীন পাত্রেরদের প্রতি এমত অনুরাগপ্রযুক্ত ঐ কুলীনেরা নিষ্কুলহইতে কন্যা গ্রহণ করাতে স্বীয় ২ মর্য্যাদা প্রদানের অনেক মূল্য লইতে লাগিলেন।''[১৮]

দেবীবরের মেলবন্ধনের ফলে এমনিতেই কুলীন নারীর বিয়ের জন্য স্বঘরের কুলীন পাত্র পাওয়া যেতো না— এরপর যদি কোন কুলীন নারী বাংলাদেশের বাইরে থাকতো তাহলে তো সেই কুলীন নারীর বিয়ের জন্য কুলীন পাত্র পাওয়াই আকাশকুসুম হয়ে যেতো। নিস্তারিণী দেবীর অবস্থা হয়েছিল সেরকম— পিতার কর্মসূত্রে পিতার সঙ্গে তিনিও প্রবাসজীবন কাটিয়েছিলেন। ফলে কুলীন কন্যা নিস্তারিণী দেবীর বারো বছর বয়স হলেও যখন বিয়ের জন্য স্বঘরের কুলীন পাত্র পাওয়া গেলো না তখন তিনি পরিবারের সকলের চোখের বালি হয়ে উঠলেন। কেননা তাঁর বিয়ে না হলে তাঁর পিতৃকুলের কৌলীন্য মর্যাদা নষ্ট হবে, আর এই কৌলীন্য মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে কুলীন পাত্র খোঁজার জন্যে প্রবাস থেকে দেশে বা স্বগ্রামে যেতে অনেক টাকা খরচ হবে এবং কুলীন নারী হিসেবে তাঁর বয়স একটু বেশি হওয়ায় অনেক টাকা ছাড়া কোনমতেই কুলীন পাত্র পাওয়া যাবে না। সেজন্য তাঁর বিয়ে দেওয়ার জন্য অনেক টাকা খরচের দুশ্চিন্তা প্রায়ই তাঁর বাবা ও দাদার মুখে শোনা যেতো। প্রবাসে স্বঘরের কুলীন পাত্র পাওয়া না যাওয়ায় নিস্তারিণীর বাবা নিস্তারিণীকে দুই মা ও বোনদের সঙ্গে দেশে অর্থাৎ খন্যান গ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং নিস্তারিণীর বাবা তাঁর মামাতো ভাই বিশুকে চিঠি লিখে নিস্তারিণীর বিয়ের জন্য কুলীন পাত্র খোঁজার নির্দেশ দিয়েছিলেন। নিস্তারিণীর সেই বিশু কাকা স্বঘরের কুলীন পাত্র না পেয়ে খানাকুল কৃষ্ণনগরের ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নামে পঁচিশ বছর বয়সী এক দরিদ্র স্বকৃত ভঙ্গ বিবাহ ব্যবসায়ী কুলীনের সঙ্গে নিস্তারিণীর বিয়ে ঠিক করেছিলেন। তবে নিস্তারিণীর স্বামী দরিদ্র হওয়ায় অনেক কম বরপণে নিস্তারিণীর বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু নিস্তারিণীর বিয়ে হয়েছিল শুধুমাত্র তাঁর পিতৃকুলের কৌলীন্য মর্যাদা রক্ষার জন্য। কেননা সেকালের নিয়ম অনুযায়ী নিস্তারিণীর স্বামী নিস্তারিণীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেননি এবং নিস্তারিণীর স্বামী একজন বিবাহ ব্যবসায়ী হওয়ার বিয়ের পর তিনি আবার অর্থ রোজগারের আশায় অন্য কোন কুলীন নারীকে বিয়ে করার জন্য বেরিয়ে পড়েছিলেন। ফলে নিস্তারিণী আগের মতোই বাবার বাড়িতেই থেকে গেলেন। নিস্তারিণী দেবী *সেকেলে কথা* গ্রন্থে তাঁর সেই নামমাত্র বিয়ের প্রসঙ্গে বলেছেন—

> ''অনেক দর কসাকসির পর বিবাহ হইল। বিবাহে খুব সামান্য খরচ। ১০/১২ টাকায় বিবাহ হইল। জামাইকে সাদা পাড়ওয়ালা ধুতি চাদর দেওয়া হইল। আমাকে রঙিন কাপড় ছোপাইয়া দিয়াছিল। একগাছি রূপার নোয়া গড়িয়ে, একটি নথ দিয়ে বিশু কাকা আমায় উৎসর্গ করে দিলেন। ... বিবাহ হ'ল, বর চলে গেলেন, স্বপ্নের মতো আমার আইবুড়ো নাম খণ্ডে গেল।''[১৯]

সেকালে এদেশে অধিকাংশ কুলীন নারীর এরকম নামমাত্র বিয়েই হতো শুধু পিতৃকুলের মর্যাদা রক্ষার জন্য। আর এই বিবাহ কুলীন নারীদের কাছে স্বপ্নের মতোই মনে হতো— স্বপ্ন যেমন সত্য হয় না, তেমনি তাদের বিবাহিত জীবনের স্বামীসঙ্গের স্বপ্নও বাস্তবায়িত হতো না।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজের লিখিত সংবিধান হিসেবে বিবেচিত *মনুসংহিতা-য়* মনু বলেছেন, কোন পুরুষের স্ত্রীর যদি শুধু কন্যা সন্তানই হয় তাহলে বিয়ের এগারো বছর পর সেই পুরুষটি পুত্র সন্তান কামনায় পুনরায় বিয়ে করতে পারবে, আবার কোনো পুরুষের স্ত্রী যদি বন্ধ্যা হয় বা কোন পুরুষের যদি স্ত্রীর প্রতি কোন কারণে প্রীতি না জন্মে তবে পুরুষটি পুনরায় বিয়ে করতে পারবে। অর্থাৎ মনু পুরুষের একাধিক বিয়ের বিধান দিলেও সেটি ছিল শর্তসাপেক্ষ। কিন্তু বল্লাল সেন প্রবর্তিত কৌলীন্যপ্রথায় দেবীবরের মেলবন্ধনে কুলীন পাত্রদের বহুবিবাহ ব্যাপক মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। কেননা দেবীবরের মেলবন্ধনে দোষ অনুযায়ী অল্প কয়েকটি পরিবারে মেলবন্ধন হওয়ায় কুলীন কন্যার বিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বঘরের কুলীন পাত্রের অভাব দেখা দেয়। আর কুলীন পাত্রের সঙ্গে যেহেতু কন্যার বিয়ে দিতে না পারলে কুলীনরা কুলভ্রষ্ট হবে সেহেতু কুলীন কন্যার পিতা-মাতা তথা অভিভাবকেরা কন্যার বিয়ের জন্য স্বঘরের উপযুক্ত কুলীন পাত্র পাওয়া না গেলে কখনো কখনো

বৃদ্ধ কুলীন পাত্রের সঙ্গেও তাঁদের কন্যার বিয়ে দিতেন। ক্ষেত্রবিশেষে এক বৃদ্ধ কুলীন পাত্রের সঙ্গে একাধিক বিবাহযোগ্যা কুলীন নারীদেরও বিয়ে দেওয়া হতো। রামনারায়ণ তর্করত্নের *কুলীনকুলসর্বস্ব* (১৮৫৪ খ্রি.) নাটকে আমরা দেখি, কুলীন কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বঘরের কুলীন পাত্রের অভাবে শেষপর্যন্ত বাধ্য হয়ে নিজের চার কন্যা—জাহ্নবী, শান্তবী, কামিনী ও কিশোরীকে এক বৃদ্ধ কুৎসিত কুলীন পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন নিজের কৌলীন্য মর্যাদা রক্ষার জন্য। এভাবে স্বঘরের কুলীন পাত্রের অভাবে কন্যাদায়গ্রস্ত কুলীন পিতার কুলভ্রষ্ট হওয়ার ভীতির সুযোগে কন্যাদায়গ্রস্ত কুলীন পিতার কুল উদ্ধারের নামে অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ প্রচুর বরপণের লোভে অসংখ্য কুলীন নারীকে বিয়ে করে বিবাহ ব্যবসায়ী হয়ে উঠেছিল। কেননা এক্ষেত্রে কুলীন পাত্ররা অসংখ্য কুলীন নারীকে বিয়ে করলেও সেসকল কুলীন নারীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তাদের নিতে হতো না, বরং কুলীন নারীকে বিয়ের বিনিময়ে প্রচুর টাকা পাওয়া যেতো। এভাবে সেকালে অনেক কুলীন পাত্র বিয়েকে পেশা হিসেবে নির্বাচন করে এক কুলীন নারীকে বিয়ে করে বরপণের টাকা সংগ্রহ করে আবার বেরিয়ে পড়তো অন্য কোন কুলীন নারীকে কুল উদ্ধারের নামে বিয়ে করে বরপণের টাকা রোজগারের প্রত্যাশায়। এভাবে কুলীনদের মধ্যে বহুবিবাহ করার সংখ্যাটা ব্যাপক মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং কোনো কোনো কুলীন ব্রাহ্মণ একশোরও বেশি বিয়ে করতো। ১৮৩৬ সালে ২৩ এপ্রিল *জ্ঞানান্বেষণ* পত্রিকায় তৎকালীন সময়ে এদেশের বিবাহ ব্যবসায়ী কুলীন ব্রাহ্মণদের নাম এবং তাঁরা কটি বিয়ে করেছিল তার একটি তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল। সেই তালিকায় পঞ্চাশের ওপর বিয়ে করেছে এরকম ছ'জন কুলীন ব্রাহ্মণের নাম আমরা পাই— তাদের মধ্যে সর্বাধিক (বাষট্টিটি) বিয়ে করেছিল রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আবার ১৮৩৯ সালে ৭ ডিসেম্বর *সমাচার দর্পণ* পত্রিকায় বালি গ্রাম নিবাসী গোবিন্দচন্দ্র নামে এক কুলীন ব্রাহ্মণের মৃত্যুর খবর ছাপা হয়েছিল এবং সেখানে রসিকতা করে বলা হয়েছিল তিনি একশো পত্নীকে বিধবা করে মারা গিয়েছেন। নিস্তারিণী দেবী *সেকেলে কথা* গ্রন্থে জানিয়েছেন, তাঁর পিতৃবংশ কুলীন হওয়ায় তাঁর প্রপিতামহ একশো আটটি বিয়ে করেছিলেন এবং পিতামহ মদনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বিয়ে করেছিলেন চুয়ান্নটি। আর কুলীনদের এই বিয়ের সংখ্যা এত বেশী হওয়ায় তাঁদের পক্ষে স্ত্রীদের ঠিকানা, সন্তান ইত্যাদি মনে রাখা সম্ভব হতো না বলে তাঁরা সেসব খাতায় লিখে রাখতেন। নিস্তারিণীর পিতামহ মদনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের এরকম একটি খাতা ছিল। এ প্রসঙ্গে নিস্তারিণী দেবী লিখেছেন—

> ''কুলীনেরা যেখানে যেখানে বিবাহ করিত, সেখানকার খাতা রাখিত। আমার

বৃদ্ধ পিতামহ মদনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এইরূপ একখানি খাতা ছিল। তাহাতে তাঁহার ৫৬টি বিবাহের ঠিকানা লেখা ছিল এবং যে একটু স্থান খাতার পার্শ্বে ফাঁক থাকিত, সে স্থলে তিনি টাকার কথা, পুত্রাদির কথা এবং যেগুলি তাঁহার লোক-লৌকিকতা আদায়ের পক্ষে সুবিধাজনক, তাহাই লিখিয়া রাখিতেন। এ খাতাটি আমাদের দেশের যারা উটনো খায় তাদের হাতচিটা খাতার মতো।"[২০]

আবার সুদক্ষিণা সেন বলেছেন, সেকালে কুলীনদের মধ্যে নিয়ম ছিল প্রথমে একটি বংশজ অর্থাৎ অকুলীন কন্যা বিয়ে করে পরে যত খুশি কুলীন কন্যা বিয়ে করা যেতো। তাই সুদক্ষিণা সেনের বাবা জগবন্ধু মুখোপাধ্যায় কুলীন ব্রাহ্মণ হয়ে যখন প্রথম বিয়ে অকুলীন কন্যাকে করেন তখন ঘটকরা কুলীনদের নিয়ম অনুসারে জগবন্ধুকে ধরেছিল আরেকটি কুলীন কন্যাকে বিয়ে করার জন্য। কিন্তু সুদক্ষিণা সেনের বাবা প্রগতিশীল ছিলেন এবং বহুবিবাহকে পাপকর্ম মনে করতেন বলে তিনি আর বিয়ে করেননি।

কুলীন পাত্ররা বহুবিবাহ করায় এবং তাঁরা স্ত্রীদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব না নেওয়ায় কুলীন নারীদের বিয়ের পরেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাবার বাড়িতে কিংবা মামা বাড়িতেই জীবন কাটাতে হতো। ফলে বিবাহিতা হলেও কুলীন নারীরা স্বামী সঙ্গ পেতেন না বললেই চলে। তবে সেকালে অর্থের প্রত্যাশায় কখনো কখনো কুলীন পাত্রদের কিছুদিনের জন্য শ্বশুরবাড়িতে আগমন ঘটতো এবং এর ফলে অনেক সময় কুলীনদের স্ত্রীরা সন্তান জন্ম দিলেও কুলীনরা তাঁদের সন্তানদেরও দায়িত্ব নিতো না। ফলে বাধ্য হয়ে সন্তানদের নিয়ে কুলীন নারীদের থাকতে হতো হয় ভাইদের সংসারে, নয়তো মামাবাড়িতে দাসী হিসেবে। এভাবে জীবনযাপন করতে গিয়ে কুলীন নারীদের অবস্থা কখনো কখনো অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠতো। কেননা স্বামী সঙ্গ না পাওয়ায় বেশিরভাগ সময় তাঁদের কোনো সন্তানই হতো না— বাধ্য হয়ে তাঁদের আত্মীয়দের দ্বারে দ্বারে বৃদ্ধ বয়সে দু'মুঠো অন্নের জন্য ঘুরে বেড়াতে হতো। এভাবে অনেক সময় কেউ দয়া করে খেতে দিলেও দু'দিন পরেই আবার অন্যত্র চলে যেতে বলতেন, আবার অনেক কুলীন নারী শেষ বয়সে আত্মীয়দের কাছে প্রার্থনা করেও দু'মুঠো অন্ন জোগাড় করতে পারতেন না। ১৮৩১ সালে ২৬ ফেব্রুয়ারি *সম্বাদ কৌমুদী* পত্রিকায় শ্রীমতী অমুকী দেবী ছদ্মনামে একজন কুলীন নারী বিয়ের পরেও পরের ঘরে আশ্রিত জীবনের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন—

''আমার পিতা স্বকৃতভঙ্গ ছিলেন এবং বাল্যকালাবধি প্রায় চল্লিশ সংসার করিয়া

থাকিবেন। ... আমার মাতামহ তাঁহাকে দেশ হইতে আনিয়া আমার মাতার সহিত এবং আমার আর চারি মাতৃসহোদরাসহ বিবাহ দিয়াছিলেন, শুনি যে তাহার পর এদেশে একবার আগমন করিবাতে মাতার ও দুই মাতৃস্বসার এক ২ কন্যা হইয়াছিল। আমরা যখন দশ বার বৎসর বয়স্ক হইলাম সে কালপর্য্যন্ত পিতা অথবা বিমাতা পুত্র কোন তত্ত্ব করিতেন না কিন্তু যখন তাঁহারদের মনে এমত শঙ্কা হইল যে আমারদের মাতারা কি জানি স্বাধীনতাতে বিবাহ দেন তখন পাঁচ ছয় জন ষণ্ডামর্ক বিমাতা পুত্র অন্য পক্ষের দুই মাতুল এবং পিতা জ্যেষ্ঠতাতের তুল্যবয়স্ক এক পাত্রসহিত গ্রামে আসিয়া গোপনে রহিলেন এবং পর দিবস প্রায় সন্ধ্যাকালে আমারদিগের মাতার গোপনে ও আমারদের অসম্মতিতে লইয়া গিয়া সেই পাত্রসহিত একেবারে একরাত্রে বিবাহ দিলেন সেই অবধি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম হইল পতির সহিত দর্শন নাই বর্ত্তমান আছেন কি না তাহাও জ্ঞাত নহি কেবল মাতুলের ভবনে কখন পাচিকা কখন বা দাসীরূপে কালযাপন করিতেছি।”[২১]

কৌলীন্যপ্রথার ফলে উনিশ শতকে এদেশের অধিকাংশ কুলীন নারীর এরকমই বঞ্চনার জীবন ছিল।

কুলীন নারী নিস্তারিণী দেবীর জীবনও পরের গৃহে দাসীবৃত্তি করে অনাদরে-অবহেলায়-অপমানে কেটেছে। নিস্তারিণী দেবীর বিয়ে হয়েছিল বারো বছর বয়সে এবং চোদ্দ বছর বয়সেই তিনি বিধবা হয়েছিলেন। সেকালে অনেক কুলীন নারী ছিলেন যাঁরা বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে একবারও যাননি— নিস্তারিণী দেবীও সেরকমই ছিলেন। আবার অনেক কুলীন নারীর বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে একবারও দেখা হতো না— নিস্তারিণী দেবী জানিয়েছেন বৃদ্ধবয়সে কালীঘাটে এক বৃদ্ধার সঙ্গে পরিচিত হয়ে তিনি জানতে পেরেছিলেন সেই বৃদ্ধা তাঁর সতীন। অথচ সেই বৃদ্ধা তাঁর স্বামীর মৃত্যুর খবর জানতেন না— কেননা বিয়ের পর আর কোনোদিন তিনি স্বামীকে দেখেননি, এমনকি স্বামীর সঙ্গে কোনোরকম যোগাযোগও তাঁর ছিল না। তাই নিস্তারিণী দেবী বলেছেন, এদিক থেকে তিনি ভাগ্যবতী। কেননা স্বামীর সঙ্গে তাঁর দু'বার দেখা হয়েছিল বাবার বাড়িতে— একবার বিয়ের কিছুদিন পর এবং আরেকবার স্বামী যখন পিলে রোগে আক্রান্ত হয়ে শ্বশুরবাড়ি এসেছিলেন তখন কিছুদিনের জন্য তিনি স্বামী সঙ্গ পেয়েছিলেন এবং স্বামীর মৃত্যুর খবরও তিনি সঠিক সময়ে পেয়েছিলেন। তবে নিস্তারিণী দেবীর নিজের সন্তান না থাকায় আজীবন তাঁকে ভাই-ভাইপো এবং মামা বাড়িতে দাসীবৃত্তি করে তাঁদের সন্তানদের মানুষ করে নিতান্ত

অনাদর-অবহেলায় জীবন কাটাতে হয়েছে। নিস্তারিণীর দাদা দেবীচরণ থানার দারোগা হলেও বোনকে তাঁর সংসারে নিতান্ত অনাদর-অবহেলা পেতে হয়েছে, এমনকি বাড়ির দাস-দাসীরাও নিস্তারিণীকে অবহেলা করতে দ্বিধাবোধ করেনি। নিস্তারিণী দেবী বলেছেন—

> ''চুঁচ্ড়া, বড়োবাজারে গঙ্গার ধারে দাদা যখন বাড়ি কিন্‌লেন, তখন আমার অবস্থা, আগেও যেমন তখনও তেমনই। চাকর-বাকর পর্যন্ত বউয়ের দেখাদেখি আমাকে তাচ্ছিল্য করত। আমার রাত্রে খাবার কোন বরাদ্দ ছিল না। চাকরকে কাঠ চেলিয়ে দিতে বললে, বল্‌ত, 'আপ্‌সে ফাড় লেও'।''[২২]

এভাবে নিস্তারিণী দেবী কখনো দাদার সংসারে, কখনো ভাইয়ের সংসারে, কখনো ভাইপোর সংসারে, আবার কখনো মামার বাড়িতে উদ্বাস্তু জীবন কাটিয়েছেন— এক জায়গায় কিছুদিন থাকার পরেই তাঁকে আবার অন্যত্র চলে যেতে বলা হয়েছে নিতান্ত তাচ্ছিল্য সহকারে। এ প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পথের পাঁচালী* (১৯২৯খ্রি.) উপন্যাসের ইন্দির ঠাক্‌রুণের কথা মনে পড়ে— এক বৃদ্ধ কুলীন পাত্রের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল এবং অল্পবয়সেই তিনি বিধবা হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি দূর সম্পর্কের ভাই হরিহরের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং সংসারের কাজ করে দিয়ে দু'মুঠো খাবার পেতেন। কিন্তু হরিহরের স্ত্রী সর্বজয়া অভাবের সংসারে তাঁকে অবাঞ্ছিত অর্থাৎ বালাই মনে করে অন্যত্র চলে যেতে বলতো এবং ইন্দির ঠাক্‌রুণ কিছুদিনের জন্য অন্যত্র চলে গেলেও সেখান থেকেও তাঁকে চলে যেতে বলা হতো। এভাবে সারাজীবন সকলের দ্বারে দ্বারে আশ্রয় প্রার্থনা করে নিতান্ত অনাদর-অবহেলায় একসময় ইন্দির ঠাক্‌রুণের মৃত্যু হয়। তবে তাঁর মৃত্যুতে কেউ দুঃখ পায়নি, বরং স্বস্তি পেয়েছে— কেননা সেকালে ইন্দির ঠাক্‌রুণের মতো কুলীন নারীরা ছিল অবাঞ্ছিত, তাঁরা সকলের কাছে বোঝা স্বরূপ ছিল। নিস্তারিণী দেবীর জীবনও অনেকটা এরকমই ছিল। নিস্তারিণী দেবী যখন যার আশ্রয়ে ছিলেন সেখানেই তিনি জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সকল কাজ করেছেন — বিনিময়ে কখনো কারো ভালোবাসা, সহানুভূতি পাননি, বরং তাচ্ছিল্য পেয়েছেন। সকলেই তাঁকে অন্যত্র চলে যেতে বলেছেন— যখন বড় ভাইপোর আশ্রয়ে ছিলেন তখন বড় ভাইপো মাঝে মধ্যেই তাঁকে অন্যত্র চলে যেতে বলতেন, আবার ছোট মামার সংসারে যখন তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন তখন ছোটমামিও তাঁকে বলতেন অন্য মামাদের আশ্রয়ে যাবার জন্য। নিস্তারিণী মামাদের সংসারে সারাদিন সমস্ত কাজ করার বিনিময়ে সামান্য নুন ভাতেও সন্তুষ্ট ছিলেন, কিন্তু তাতেও তাঁদের বিরক্তির কারণ হয়েছিলেন। এভাবে সারাজীবন একটু

আশ্রয়ের জন্য, একটু অন্নের জন্য আত্মীয়দের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন নিস্তারিণী অপমান-অবহেলা সহ্য করেও— যদিও তিনি ছিলেন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। আসলে কৌলীন্যপ্রথার ফলে এই বিধবা নারীরা ছিল সমাজের চোখে অবাঞ্ছিত— সকলেই তাঁদের দূর করে দিতে পারলে স্বস্তি পেতো। এই অবহেলা-অনাদরের মাঝে কেবলমাত্র ভাই কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিস্তারিণীকে টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। আর শেষ জীবনে নিস্তারিণী ভাইপো প্রাণধনের কাছে আশ্রয় পেয়েছিলেন— এই প্রাণধনকে তিনি নিজের হাতে বড়ো করেছিলেন। নিস্তারিণী শেষ জীবনে কুলীন বিধবাদের শেষ আশ্রয় কাশী যেতে চাইলে প্রাণধন তাঁকে কাশীতে নিয়ে গিয়েছিলেন। কাশীতে বাড়ি ভাড়া করে থাকার সময় তাঁর দু'চোখ অন্ধ হয়ে গেলে প্রাণধন তাঁকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি আর প্রাণধনের সংসারে ফিরে যেতে চাননি। কেননা সারাজীবন তিনি অন্যের আশ্রয়ে থেকে যে ত্যিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন সেই অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি শেষ জীবনে প্রাণধনের সংসারে গিয়ে আর প্রাণধনের স্ত্রীর চোখের বালি হতে চাননি। সারাজীবন সকলের কাছে অনাদর-অবহেলা পাওয়ায় মনোবেদনা প্রকাশ পেয়েছে নিস্তারিণী দেবীর কথায়—

> ''যে কাশীতে আসে দেখে যায়— আমি মনের দুঃখে থাকি, কেন বলিতে পারি না। দুই চক্ষু অন্ধ হয়ে গেছে বলে কেউ দুর্বাক্য বল্‌তে না পারলেও, সবাই নিজের-নিজের— কে কার খোঁজ নেয়। প্রাণধনের ইচ্ছা, আমায় নিজের কাছে রাখে। আমার মনে হয়— আর কেন? এখন মরে গিয়ে তাঁর কাছে যেতে পারলেই হয়।''[২৩]

তবে প্রাণধনের কাছে শেষজীবনে যেটুকু ভালোবাসা তিনি পেয়েছিলেন তা থেকেও তিনি বঞ্চিত হয়েছিলেন। কেননা নিস্তারিণীর আগেই তাঁর প্রাণাধিক ভাইপো প্রাণধনের মৃত্যু হয়েছিল। এভাবে গভীর মনোবেদনা ও শোকেই তাঁর সারাজীবন কেটে গেল— শান্তির নীড় আর তিনি খুঁজে পেলেন না। নিস্তারিণী দেবীর এই অনাদরের-অবহেলার-বঞ্চনার জীবনের কথা প্রসঙ্গে চিত্রা দেব লিখেছেন—

> ''এই করেই কেটে গেল নিস্তারিণীর সারাটা জীবন। অশ্রদ্ধায়, অবহেলায়। তাঁর সোনার বর্ণে কালি পড়ল, থান কাপড়ে পড়ল অজস্র গ্রন্থি। মাকড়সা জাল বুনে গেল সারা মুখে, চোখের সামনে দিনের আলো হয়ে গেল ঝাপসা। যেখানে কটা দিনের জন্যে মাঝে মধ্যে একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই পেতেন সেখানেও কি শান্তি

ছিল? একটুও না।"[২৪]

নিস্তারিণী দেবীর এই অনাদর-অবহেলা-অপমানের জীবন কাহিনি শুধু তাঁর একার নয়, সেকালের প্রায় সকল কুলীন নারীরই জীবন কাহিনি হয়ে উঠেছে।

বিবাহ ব্যবসায়ী কুলীনরা বিয়ের পর তাঁদের স্ত্রীদের বাবার বাড়িতে রেখেই আবার অন্যত্র চলে যেতো বিয়ে করতে। এমনিতে কুলীন পাত্ররা তাদের স্ত্রীদের কাছে যেতো না, তবে যখন টাকার অভাব হতো তখন কুলীন পাত্ররা পর্যায়ক্রমে একাধিক শ্বশুরবাড়িতে যেতো অর্থের প্রত্যাশায়। এভাবে বিবাহ ব্যবসায়ী কুলীনদের এক শ্বশুরবাড়ি থেকে অন্য শ্বশুরবাড়ি যেতে অনেক সময় লেগে যেতো। কেননা তারা অনেকগুলি বিয়ে করায় প্রত্যেক শ্বশুরবাড়ি থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে তাদের অনেকটা সময় চলে যেতো এবং অর্থের অভাব না হলে তারা সাধারণত শ্বশুরবাড়ি যেতো না। নিস্তারিণী দেবী কুলীন পাত্রের এরকম অর্থের প্রত্যাশায় শ্বশুরবাড়ি আগমনের ব্যাপারটিকে নিজ অভিজ্ঞতা থেকে বর্ণনা করেছেন—

> ''বিবাহ হবার দিনের কথা অনেক মেয়ে ভুলে যায়, কিন্তু গ্রামে কারও ঘরে জামাই এলেই সেটি মনে পড়ে। তখন জামাই আনিতে বিশেষ কোন নিমন্ত্রণ করিতে হইত না। জামাই নিজের গরজে আসিত। জামাইয়ের খরচ কম হইয়া আসিলেই সে এক শ্বশুরবাড়ি হইতে অন্য শ্বশুরবাড়ি আসিত। তখনকার জামাইয়েরা মাথায় পুঁটুলি, হাতে লাঠি, কাঁধে গামছা, পায়ে এক পা ধূলা লইয়া মড় মড় করিয়া বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া পড়িত। প্রথম তাড়না, পরে যত্ন, ইহাই জামাই-আদর।"[২৫]

নিস্তারিণীর পিতামহ কুলীন মদনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সংসারে অভাব হলে রোজগারের আশায় এভাবে একাধিক শ্বশুরবাড়িতে ঘুরে ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করতেন। সেকালে কুলীন পাত্ররা সাধারণত অর্থ না পেলে শ্বশুরবাড়ি যেতেন না। তাই বিয়ের পর নিস্তারিণীর স্বামীকে প্রথমবার নিস্তারিণীর দাদা তাঁদের বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন পাঁচ টাকা মাসোহারার বন্দোবস্ত করে।

কুলীন নারীরা সাধারণত বিয়ের পরেও বাপের বাড়িতে থাকতেন— কুলীন ব্রাহ্মণেরা তাঁদের স্ত্রীদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিতেন না। তাই কুলীন কন্যার পিতৃকুল যাঁরা সম্ভ্রান্ত পরিবার তাঁরা অর্থের বিনিময়ে কুলীন পাত্রকে ঘরজামাই করে রাখতেন। নিস্তারিণী দেবীর ঠাকুরমার বাবা চাটুয্যে মহাশয় এরকম সম্ভ্রান্ত কুলীন পরিবারে বিয়ে করে ঘরজামাই ছিলেন। আবার সেকালে

অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ সম্ভ্রান্ত পরিবারের বংশজ মেয়ে বিয়ে করে প্রচুর টাকা বরপণের বিনিময়ে ঘরজামাই থাকতেন। নিস্তারিণীর পিতা হরচরণের প্রথম বিবাহ হয়েছিল পিতা মদনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতিতে— পুত্রের এই বিয়ের বরপণের টাকা মদনমোহন পাননি। তাই হরচরণ পিতার বরপণ প্রাপ্তির প্রত্যাশাকে পূর্ণ করার জন্য আরেকটি বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। তখন হরচরণের ইচ্ছায় মদনমোহন হরচরণের দ্বিতীয়বার বিয়ে দিয়েছিলেন সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারে বংশজ মেয়ের সঙ্গে। এক্ষেত্রে মদনমোহন প্রচুর টাকা বরপণ নিয়ে পুত্র হরচরণকে উক্ত জমিদার পরিবারে ঘরজামাই রাখার শর্তে রাজি হয়েছিলেন। আবার আমোদিনী দাশগুপ্তের পিতাও কুলীন হয়ে অকুলীন সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশে বিয়ে করে ঘরজামাই ছিলেন।

সেকালে কুলীন ব্রাহ্মণেরা কুলীন কন্যার পাশাপাশি বংশজ কন্যা বিয়ে করার ফলে অকুলীন ব্রাহ্মণদের বিয়ের জন্য পাত্রীর অভাব দেখা দিয়েছিল। কেননা তখন সকল ব্রাহ্মণই তাঁদের কন্যাকে কুলীন পাত্রে সম্প্রদান করে বংশ মর্যাদা বৃদ্ধি করতে চাইতেন, আর সেজন্য অকুলীন ব্রাহ্মণদের স্বঘরের পাত্রীর অভাবে অনেক সময় চিরকুমার থাকতে হতো, আবার অনেক সময় অধিক বয়স পর্যন্ত অবিবাহিতই থাকতে হতো। সেজন্য অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ সে সময় পাত্রীর অভিভাবকদের অনেক টাকা অর্থাৎ কন্যাপণ দিয়ে বিয়ে করতে বাধ্য হতেন। এ প্রসঙ্গে ১৮৩০ সালের ৪ ডিসেম্বর *সমাচার দর্পণ* পত্রিকায় লেখা হয়েছিল—

> ‘‘... কুলীনেরদের নিষ্কুলের কন্যা বিবাহ করণেতে অধিক লাভ হইতেছে কিন্তু কুলীন ভিন্ন অন্য ব্রাহ্মণেরদের বিবাহ করিতে অনেক টাকা দিতে হয় এবং ঐ বিবাহ করণেতে তাঁহারদের তিন চারি পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত কর্জ করিবার আবশ্যক হওয়াতে তাঁহারা বহুকালপর্য্যন্ত ঐ কর্জের সুদ সাগরে মগ্ন হইয়া থাকেন ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।’’[২৬]

নিস্তারিণী দেবী এই কন্যাপণ প্রসঙ্গে বলেছেন, বিশেষ করে বংশজ ব্রাহ্মণেরা অনেক টাকা কন্যাপণ নিয়ে তাঁদের মেয়েদের বিয়ে দিতেন অকুলীন ব্রাহ্মণের সঙ্গে। তিনি এই কন্যাপণ নিয়ে মেয়ের বিয়ে দেওয়া বংশজ ব্রাহ্মণদের বলেছেন ‘মেয়ে-বেচা বামুন’। স্বপন বসু সেকালের কন্যাপণ বা কন্যাবিক্রয় প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন—

> ‘‘... কৌলীন্যপ্রথার ফলে একদিকে অসংখ্য মেয়ে কুলীনদের বহুপত্নীর অন্যতম হয়ে মনের বেদনা মনেই লুকিয়ে রাখত। অন্যদিকে পাত্রীর অভাবে অকুলীন

> অনেক ব্রাহ্মণের বিয়ের ফুলই ফুটত না। অর্থ ব্যয় করে তাদের স্ত্রী জোগাড় করতে হত। ফলে, এই সময় বাংলাদেশে কন্যাবিক্রয় লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়।"[২৭]

আমোদিনী দাশগুপ্ত জানিয়েছেন, তাঁর মা এক হাজার টাকা কন্যাপণ নিয়ে তাঁকে এগারো বছর বয়সে চতুর্থ পক্ষের তেতাল্লিশ বছরের এক বয়স্ক পাত্রের কাছে বিক্রি করেছিলেন। সুতরাং সেকালে এই কন্যাপণও ছিল কৌলীন্যপ্রথার আরেকটি বিষময় ফল।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় এদেশের নারীদের জীবিকার্জনের স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি— মনু বিধান দিয়েছিলেন নারী বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর এবং বার্ধক্যে পুত্রের অধীনে থাকবে। আমরা জানি অধীনতা মানেই পরাধীনতা, তবে স্বামীর মৃত্যুতে নারীদের এই পরাধীনতার সঙ্গে যুক্ত হয় নানারকম সামাজিক অপবাদ। উনিশ শতকে, এমনকি আজও বিধবা নারীদের সমাজে অবাঞ্ছিত বলে মনে করা হয়— বিধবা নারীদের অশুভ বলে মনে করে সামাজিক নানা মঙ্গলানুষ্ঠানে তাঁদের যোগদান নিষিদ্ধ করা হয়। একদিকে নারী হিসেবে পরাধীনতা এবং অন্যদিকে সামাজিক নানা অপবাদে বিধবা নারীরা ক্ষত-বিক্ষত হন। উনিশ শতকে এদেশের সমাজে বিধবা হওয়াকে নারীরা যে তাঁদের জীবনের চরম দুর্ভাগ্য বলে মনে করতেন, তার পরিচয় আমরা পাই কৈলাসবাসিনী দেবীর আত্মকথাধর্মী রচনা— *ডায়েরী*-তে। কৈলাসবাসিনী দেবী যখন বিধবা হন তখন তিনি সেই সমাজ আরোপিত অমঙ্গলসূচক 'বিধবা' নামটি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য মৃত্যু কামনা করেছেন এবং এই পৃথিবীতে তাঁর জীবনের আর কোনো মূল্য নেই ভেবে আত্মকথাধর্মী রচনা *ডায়েরী* লেখারও সমাপ্তি টেনেছেন। তাঁর ভাষাতেই সেকথা শোনা যাক—

> ''আমি শামবাজারে গিয়েছিলাম— সুখের ব্রতো উয্যাপন করিতে। আমি কি পাযান , আবার আমি কেমন করে বাগানে আশিলাম, তাহা আমি জান্তে পারি নাই। আমি শেখান থেকে বিধবা নাম নে আশিলাম। এই নামটি আমার কানে এলে বুকে জেন বজরাঘাত বোধ হয়। হায় জগৎপিতা, এ কি নাম দিলে, এ নাম নে ভারতে কতো দিন থাকিব? এ যাতনা আমি সহ্য করিতে পারিব না। আমার নাম জ্যেন শিঘ্র মাটিতে মিশায়। হায় হায় একি ভয়ানক নাম— শব্দ শুনিলে জ্যেন হৃৎকম্প হয়।"[২৮]

এই ভাবনা শুধু কৈলাসবাসিনীর একার নয়, সেকালের এদেশের সকল বিধবা নারীর। আসলে

উনিশ শতকেও যেহেতু এদেশের নারীদের জীবিকার্জনের সুযোগ দেওয়া হয়নি সেহেতু তাঁরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী ছিলেন না। কাজেই বিধবা নারীদের সবসময় পরের আশ্রয়েই থাকতে হতো নিতান্ত দাসীর মতো নানারকম অপমান-অবহেলা-তাচ্ছিল্য সহ্য করে। যে বিধবা নারীর সন্তান আছে তাঁর দুর্ভোগ সামান্য কম হলেও যে বিধবা নারীর সন্তান নেই তাঁকে প্রতি পদক্ষেপে অন্যের আশ্রয়ে থেকে অপমান-তাচ্ছিল্য সহ্য করতে হতো, আর বালবিধবা নারীর তো কোনো কথাই নেই— তাঁরাই সবচেয়ে বেশি লাঞ্ছিতা হতেন শারীরিক ও মানসিক দু'দিক থেকেই।

উনিশ শতকে এদেশের সমাজে নারীদের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল বিধবা সমস্যা। সেকালে এদেশে বালবিধবা নারীর সংখ্যা অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছিল। কেননা এসময় মূলত কৌলীন্যপ্রথার ফলে অনেক কুলীন পিতা কন্যার বিয়ের জন্য স্বঘরের উপযুক্ত কুলীন পাত্র না পেয়ে অনেক সময় বৃদ্ধ পাত্রের সঙ্গেও তাঁর অল্পবয়সী কন্যার বিয়ে দিতে বাধ্য হতেন কৌলীন্য মর্যাদা রক্ষার জন্য। ফলে স্বাভাবিকভাবেই কিছুকাল পরেই সেই মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধ কুলীর পাত্রের ভবলীলা সাঙ্গ হতো এবং অল্পবয়সী কুলীন কন্যাটি বিধবা হতেন। আর পুরুষতান্ত্রিক সমাজ বিধবা নারীদের জন্য কঠোর সামাজিক অনুশাসন এবং ব্রত-অনুষ্ঠান নির্ধারণ করেছে। সেকালে বালবিধবা থেকে বৃদ্ধা বিধবা সকলেরই মস্তক মুণ্ডন করানো হতো এবং তাঁদের নিরালঙ্কারা হয়ে সাদা শাড়ি পরতে হতো— যাতে কোন পুরুষ বিধবা নারীর প্রতি আকৃষ্ট না হয় এবং বিধবাদের চরিত্র স্খলন না হয়। রাসসুন্দরী দাসী ষাট বছর বয়সে যখন বিধবা হয়েছিলেন তখন তিনি সেকালের রীতি মেনে মস্তক মুণ্ডন করিয়েছিলেন। আবার পুরুষতান্ত্রিক সমাজ বিধবা নারীদের জন্য কঠোর ব্রত-অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা করেছিল— যাতে এসব কঠোর ব্রত-অনুষ্ঠান পালনের মধ্য দিয়ে বিধবা নারীর জৈবিক কামনা-বাসনা সংযত থাকে এবং বিধবা নারীর আয়ুক্ষয় হয়। কেননা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীর চরিত্র স্খলন সহ্য করতে পারে না এবং তারা মনে করে স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা নারীদেরও বেঁচে থাকার অধিকার নেই। আর এই কঠোর ব্রত-অনুষ্ঠান পালনের বিধান থেকে বালবিধবা নারীদেরও মুক্তি দেওয়া হয়নি। যদিও বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় ব্রিটিশ সরকার ভারতে হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ আইন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে (১৮৫৬খ্রি.) প্রণয়ন করেছিল তবুও হিন্দু রক্ষণশীল সমাজে বিধবার পুনর্বার বিবাহ নিষিদ্ধ থাকায় সেকালে বালবিধবা নারীদেরও এসব কঠোর ব্রত-অনুষ্ঠান পালন করতে হতো। ফলে সেকালে অনেক বালবিধবা নারীকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নির্ধারিত এসব কঠোর ব্রত-অনুষ্ঠান পালন করতে হতো বাধ্য হয়ে। প্রসন্নময়ী দেবী জানিয়েছেন, তাঁর এক মাসিশাশুড়ি ও

পিসিরা অল্প বয়সেই বিধবা হয়ে পূজা-আহ্নিক, ব্রত-অনুষ্ঠান এবং কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করতেন। আবার অনেক বালবিধবা নারীর পক্ষে এসব ব্রত-অনুষ্ঠান পালন করা সম্ভব হতো না— বিশেষত যৌবনকাল উপস্থিত হলে অনেকের পক্ষে যৌনক্ষুধাকে অস্বীকার করা সম্ভব হতো না। ফলে স্বাভাবিকভাবে জৈবিক প্রবৃত্তির তাড়নায় অনেক বিধবা নারী পরপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হতেন এবং অনেক সময় এর ফলে অনেক বিধবা নারী সন্তান সম্ভবা হয়ে পড়লে তখন তাঁকে হয় ভ্রূণ হত্যা করতে হতো, নয়তো আত্মহত্যা করতে হতো, আর নয়তো তাঁর স্থান হতো পতিতালয়ে। কেননা রক্ষণশীল সমাজে বিধবা নারীর পুনর্বার বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। এভাবে উনিশ শতকে এদেশের সমাজে একটা বড়ো সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল বিধবা সমস্যা। বস্তুত পুরুষতান্ত্রিক সমাজ বিধবা নারীদের যেসব ব্রত-অনুষ্ঠান পালনের বিধান দিয়েছিলেন সেগুলির মধ্যে সব থেকে কঠোর এবং নির্মম ব্রত ছিল বিধবা নারীর নির্জলা একাদশী পালন অর্থাৎ একাদশীর দিন বিধবারা এক বিন্দু জলও পান করতে পারবেন না। প্রসন্নময়ী দেবী *পূর্ব্বকথা* গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> ''আমাদিগের রাজশাহি জেলায় মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেও তৃষ্ণাকাতর বিধবা নারীগণ একাদশী দিনে গঙ্গা জলও পান করেন না। এমন কঠোর নিয়ম রক্ষা করিতে কুত্রাপি দেখি নাই। কালের পরিবর্ত্তনে তাঁহাদিগের বৈধব্য প্রথার কোনরূপ শিথিলতা দেখিতে পাওয়া যায় না।''[২৯]

এই নির্জলা একাদশী পালন সবথেকে মারাত্মক হতো বালবিধবা নারীদের এবং মুমূর্ষু বিধবা নারীদের। কেননা নির্জলা একাদশী পালন করতে গিয়ে জলতৃষ্ণায় কোন বালবিধবা কিংবা মুমূর্ষু বিধবার প্রাণ ওষ্ঠাগত হলেও তাঁকে একবিন্দুও জল দেওয়া হতো না। এভাবে অনেক বিধবা শুধুমাত্র এই নির্জলা একাদশী পালন করতে গিয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে সুদক্ষিণা সেন বলেছেন—

> ''সে'কালে বিধবাদের নির্জলা একাদশী করিবার নিয়ম ছিল। এই কুসংস্কারটি লোকের মনে এত দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছিল যে, একাদশীর দিন কোনো বিধবার মৃত্যু হইলেও একবিন্দু জল দ্বারা তাঁহার কণ্ঠ ভিজাইতে পারিতেন না। এমনকি একাদশীর দিন মৃতা হতভাগিনী বিধবার চিতাভস্মও ধুইবার নিয়ম ছিল না। এই নিদারুণ মূঢ়তার ফলে কত বিধবাকে যে শুষ্ককণ্ঠে মরিতে হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।''[৩০]

উনিশ শতকে এদেশে ইংরেজি শিক্ষার সূচনা হলে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এদেশের কিছু উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায় ইংরেজদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসেছিলেন।

আর ইংরেজদের মদ পান করাকে সভ্যতার লক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করে এই নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায় নিজেরাও প্রচুর পরিমাণে মদ পান করে নিজেদের সভ্য হিসেবে দেখাতে চাইতেন। কামিনী রায় *শ্রাদ্ধিকী* গ্রন্থে জানিয়েছেন, তাঁর পিতা চণ্ডীচরণ সেন ১৮৫৭-১৮৬৩ সাল পর্যন্ত বিদ্যাশিক্ষার জন্য যখন বরিশালে ছিলেন তখন তাঁর সহপাঠীরা সকলেই মদ পান করে নিজেদের সভ্য মনে করতেন। তাই সেকালে এই মদপান করাকে কেউ খারাপ কাজ বলে মনে করতেন না। তখন সমগ্র বাংলাদেশেই মদ পান করাটা সভ্যতার একটা রীতি হয়ে দাঁড়ায়। প্যারীচাঁদ মিত্র *মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়* গ্রন্থে সেকালে কলকাতার সকল শ্রেণির মানুষদের মদাসক্তির বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন—

> ''কলিকাতায় যেখানে যাওয়া যায়, সেইখানেই মদ খাবার ঘটা। কি দুঃখী, কি বড়মানুষ, কি যুবা, কি বৃদ্ধ সকলেই মদ্য পাইলে অন্ন ত্যাগ করে।''[৩১]

কৃষ্ণভাবিনী দাসী স্বামীর সঙ্গে ইংল্যাণ্ডে গিয়ে ইংরেজদের সামগ্রিক জীবনচর্যা লক্ষ করেছিলেন। তিনি বলেছেন, ইংল্যাণ্ডে কেউ কারো বাড়িতে গেলে তাঁকে মদ ও চুরুট খেতে দেন ইংরেজরা— তাঁদের দেশে এগুলি অতিথি আপ্যায়নের সামগ্রী, বাংলাদেশে যেমন অতিথি আপ্যায়নের জন্য দেওয়া হয় পান-তামাক ইত্যাদি। আসলে যেকোনো দেশের খাদ্যাভ্যাস গড়ে ওঠে সেই দেশের ভৌগোলিক অবস্থান তথা জলবায়ুর ওপর ভিত্তি করে। ইংল্যাণ্ড শীতপ্রধান দেশ হওয়ায় সেখানকার মানুষরা স্বাভাবিকভাবেই শরীর উষ্ণ রাখার জন্য মদ পান করে থাকেন। কিন্তু এই মদ পান কখনো ইংরেজদের সভ্যতার নিদর্শন হতে পারে না— জলবায়ুর কারণেই মদ পান ইংরেজদের খাদ্য তালিকায় আবশ্যক উপাদান হয়ে উঠেছে। যদিও ইংরেজদের মধ্যে উনিশ শতকে মদ্যপান প্রথা অনেকটা হ্রাস পেয়েছিল তবুও সেকালে আমাদের দেশের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায় ইংরেজদের এই বাহ্যিক মদ পানকে সভ্যতার লক্ষণ হিসেবে ভুল করে প্রচুর পরিমাণে মদ পান করে নৈতিকভাবে অধঃপতিত হয়েছেন। কৃষ্ণভাবিনী দাসীর ভাষায়—

> ''... আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকেরা যদি ইংরাজদের এই কুরীতি অবলম্বন করেন তাহা হইলে ইহা যৎপরোনাস্তি দুঃখের বিষয় হইবে।''[৩২]

কৈলাসবাসিনী দেবীর স্বামী কিশোরীচাঁদ মিত্র কর্মসূত্রে কলকাতায় এসে এসকল নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশে সভ্যতার খাতিরে মদ পান করতেন। কৈলাসবাসিনী দেবীর কথায়—

> ''কলিকাতা এসে আমার স্বামি এতদিন ভাল ছেলেন। এখন কলিকাতার বাতাশ

গায়ে নাগিতেছে, এখন আরেক রকম চালে জাচ্চেন। কতোগুলি ভদ্ররে অভদ্ররে জুটিলেন, তাঁদের নাম করিবো না, এঁরা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার সভ্য। সভ্য ভব্য বাবুরা এঁরা আসিতে নাগিলেন, আর সব্বোদা শেখাতে নাগিলেন, তাহাতে আমি ক্রেমে জানিতে পারিলাম।"[৩৩]

তবে কৈলাসবাসিনী দেবীর স্বামী বিদ্বান ও বিবেচক ছিলেন বলেই কিছুকালের জন্য মদ পান করলেও শেষপর্যন্ত তাঁর নৈতিক অধঃপতন হয়নি। কিন্তু সেকালে অধিকাংশ নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায় সভ্যতার লক্ষণ হিসেবে মদ পান করতে গিয়ে পরবর্তীকালে মদাসক্তিতে তাঁদের সর্বনাশ হয়েছে— দীনবন্ধু মিত্রের *সধবার একাদশী* (১৮৬৬খ্রি.) প্রহসনের নিমচাঁদ চরিত্রটির মতো।

উনিশ শতকে 'বাবু' নামে আরেকটি সম্প্রদায় পাওয়া যায়— এরা ধনবান পিতার কুপুত্র, অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত এবং সর্বদা ভোগবিলাসে মত্ত। ইংরেজ আমল শুরু হলে বিশেষত উনিশ শতকে এদেশের কিছু মানুষ ব্যবসা করে বা জমিদারি কিনে প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিক হয়ে উঠেছিল। এভাবে এদের হাতে হঠাৎ করে প্রচুর অর্থ চলে আসায় এরা ভোগবিলাসকেই জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলে মনে করেছিল। এরা ভোগবিলাসে এতটাই মত্ত থাকতো যে সন্তানদের সুশিক্ষা দেওয়ার কোনো প্রয়োজনই তারা বোধ করতো না। ফলে তাদের সন্তানরা অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত হয়ে সঠিক জীবন-যাপনের আদর্শ খুঁজে না পেয়ে এবং হাতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রচুর অর্থ থাকায় মদ পান ও বারঙ্গনা বিলাস করেই জীবন অতিবাহিত করতো। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *নববাবুবিলাস* (১৮২৫খ্রি.), প্যারীচাঁদ মিত্রের *আলালের ঘরের দুলাল* (১৮৬১খ্রি.) ইত্যাদি গ্রন্থে এই বাবু সম্প্রদায়ের ভোগবিলাসের পরিচয় আছে। এই বাবু সম্প্রদায় নৈতিকভাবে অধঃপতিত হয়ে পিতার যাবতীয় ধনসম্পত্তি নষ্ট করতো। প্রসন্নময়ী দেবীর পিতৃবংশ কুলীন না হলেও তাঁদের বংশে কুলীন পাত্রের সঙ্গে কন্যার বিয়ে দেওয়ার নিয়ম ছিল। এই নিয়ম মেনে প্রসন্নময়ী দেবীর ছোট পিসি মৃণ্ময়ী দেবীর উপযুক্ত কুলীন পাত্র না পেয়ে শেষে বাধ্য হয়ে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল বৃদ্ধ বিপত্নীক কুলীন লাহিড়ী মহাশয়ের সঙ্গে। মৃণ্ময়ী দেবীকে বিয়ের পূর্বে লাহিড়ী মহাশয়ের অবস্থা তেমন ভালো ছিল না। তবে লাহিড়ী মহাশয় মৃণ্ময়ী দেবীকে বিয়ের পর মোক্তারি করে ক্রমে ধনবান হয়ে উঠেছিলেন এবং শ্বশুরবাড়ির অর্ধেক সম্পত্তি পেয়ে রাজশাহি জেলায় একজন অন্যতম ধনবান ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন। লাহিড়ী মহাশয় প্রচুর ধন সম্পত্তির মালিক হলেও নিঃসন্তান ছিলেন। তাই তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে পোষ্যপুত্র তথা দত্তক নিয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই সেই অশিক্ষিত

পোষ্যপুত্র লাহিড়ী মহাশয়ের প্রচুর ধনসম্পত্তি থাকায় ভোগবিলাসে এবং কুসঙ্গে পড়ে ধনসম্পত্তির অপচয় করতে থাকল— হঠাৎ করে প্রচুর ধনসম্পত্তি পেয়ে সে বাবু হয়ে উঠেছিল। প্রসন্নময়ী দেবী লাহিড়ী মহাশয়ের এই পোষ্যপুত্র গ্রহণ এবং সেই পোষ্যপুত্রের বাবুবিলাস প্রসঙ্গে বলেছেন—

> ''... নিঃসন্তান প্রযুক্ত নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রকেই পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন। চিরন্তন প্রথানুসারে পোষ্য যেরূপ হইয়া থাকে এক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল। অলস বিলাসী ভোগসুখরত ও মোসাহেব দলে বেষ্টিত মূর্খ পোষ্যপুত্র পিসিমাতার অবাধ্য হইয়া উঠিয়া তাঁহাকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। বিশেষত আমাদিগের পরিবারের প্রতি অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত থাকায় আরও অনর্থ ঘটাইবার চেষ্টায় নানাপ্রকার অন্যায় কার্যে অগ্রসর হইতে লাগিল।''[৩৪]

সেকালে এই উচ্চবিত্ত 'বাবু' সম্প্রদায় এতটাই নিম্নরুচির ছিল যে নক্সাজাতীয় রচনায় এদের নিয়ে রঙ্গ-ব্যঙ্গ করা হয়েছে— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় *লোকরহস্য* গ্রন্থের *বাবু* নামক রচনায় রঙ্গ-রসিকতার মধ্য দিয়ে এদেরকে ব্যঙ্গের কশাঘাতে জর্জরিত করেছেন।

রামমোহন রায় উপলব্ধি করেছিলেন ধর্ম এক, কিন্তু ধর্মের অনুষ্ঠান বিচিত্র হওয়ায় মানুষের সঙ্গে মানুষের, ধর্মের সঙ্গে ধর্মের বিভেদ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এদেশে ইংরেজ শাসন শুরু হলে উনিশ শতকে এদেশে একে একে খ্রিস্টান মিশনারিরা আসতে থাকেন এবং তাঁরা এদেশের মানুষকে নানাভাবে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করতে থাকেন। এর ফলে উনিশ শতকে হিন্দু রক্ষণশীল সমাজ আচার-অনুষ্ঠান-পৌত্তলিকতার কঠিন বাঁধনে হিন্দুধর্মকে আরও সংকীর্ণ করে তোলে। আবার সে সময় অনেকেই হিন্দুধর্মের সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি প্রত্যাশায় অপেক্ষাকৃত উদার খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে থাকেন। এরকম অবস্থায় রামমোহন রায় হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধারের জন্য হিন্দু ধর্মের বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান এবং পৌত্তলিকতার অবসান ঘটিয়ে উপনিষদকে আশ্রয় করে নিরাকার একেশ্বর ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন এবং সে উদ্দেশ্যে তিনি ১৮১৫ সালে *আত্মীয় সভা* প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর এই *আত্মীয় সভা*-কে কেন্দ্র করেই ১৮২৮ সালে জোড়াসাঁকোর রামকমল বসুর বাড়ির কিছুটা অংশ ভাড়া নিয়ে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নিরাকার একেশ্বরবাদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। স্বাভাবিকভাবেই রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের বিরোধিতা করতে শুরু করেছিল। তবে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের বাঁধাকে অতিক্রম করে রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ তার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। ১৮৩০ সালে রামমোহন ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন এবং

১৮৩৩ সালে ইংল্যাণ্ডের ব্রিস্টেল শহরে তাঁর মৃত্যু হলে ব্রাহ্মসমাজের সদস্যরা নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েছিলেন। ফলে এসময় একদিকে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের বিরোধিতা এবং অন্যদিকে রামমোহনের আকস্মিক মৃত্যুতে ব্রাহ্মদের ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। এসময় ব্রাহ্মসমাজের আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ১৮৩০-১৮৩৯ সাল পর্যন্ত রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজকে কোনরকমে টিকিয়ে রেখেছিলেন। রামমোহনের নিরাকার একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠার উপনিষদীয় ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উপনিষদ-বেদ-ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের জন্য ১৮৩৯ সালে *তত্ত্ববোধিনী সভা* প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সেবছরই তিনি *তত্ত্ববোধিনী সভা*-র সঙ্গে রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজকে জুড়ে দিয়ে মৃতপ্রায় ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। ১৮৪২ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেছিলেন। আর ১৮৪৩ সালে তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন এবং এবছরই তিনি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য হন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য হয়ে শূদ্রদের সামনেও ব্রাহ্মণদের বেদপাঠের ব্যবস্থা করেছিলেন— যা হিন্দু রক্ষণশীল সমাজে নিষিদ্ধ ছিল। এভাবে দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ব্রাহ্মদের ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন একটা গতি লাভ করেছিল এবং ১৮৫৭ সালে কেশবচন্দ্র সেন কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করে সেই গতিকে আরো বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই কেশবচন্দ্রের মা ছিলেন সারদাসুন্দরী দেবী। তিনি *আত্মকথা*-য় কেশবচন্দ্রের কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে যোগদান প্রসঙ্গে বলেছিলেন, তাঁদের পরিবার বৈষ্ণব হওয়ায় যখন ভাশুরের ছেলেদের সঙ্গে কেশবচন্দ্রকেও বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করার দিন স্থির করা হয় তখন দীক্ষার দিন সকালবেলা কেশবচন্দ্র সেন বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হওয়ার ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে। এসময় থেকেই কেশবচন্দ্র হিন্দুধর্মের বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান-পৌত্তলিকতার প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করেছিলেন। বিয়ের পরে কেশবচন্দ্র সেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেছিলেন। আর কেশবচন্দ্র যখন ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন তখন তাঁর মা সারদাসুন্দরী দেবী তাঁকে নিষেধ না করায় সারদাসুন্দরী দেবী ভাশুরের কাছে অনেক লাঞ্ছনা, অপমান, অত্যাচার সহ্য করেছিলেন। কেশবচন্দ্রের কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের ফলে নিজের লাঞ্ছনার কথা বলতে গিয়ে সারদাসুন্দরী দেবী লিখেছেন—

> ‘‘বিবাহের পূর্বে কেশব বলিয়াছিলেন, ‘আমার বিবাহ করিয়া দরকার নাই।’ বিয়ের পর তাঁর মনে কী হইল, তারপর থেকেই তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত মিশিতে

লাগিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্ম হইলেন। তাঁর ব্রাহ্ম হওয়ার দরুণ আমি অনেক ভুগিয়াছি, ভাশুরের নিকট অনেক গালাগাল খাইয়াছি, অনেক অত্যাচার সহ্য করিয়াছি, বিনা কান্নায় আমার দিন যায় নাই। আমি কেশবকে তাঁর ধর্ম্মের জন্য কিছুই বলিতাম না বলিয়া তিনি এক একদিন রাগিয়া এত বকিতেন যে বলা যায় না।"[৩৫]

আসলে হিন্দুধর্মের বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান ও পৌত্তলিকতার বিরোধিতা করে ব্রাহ্মসমাজ নিরাকার একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত করেছিল বলে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মদের খ্রিস্টান সমতুল্য বলে মনে করতো। তাই হিন্দু সমাজ থেকে যাঁরাই ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করতেন তাঁদেরকে এবং তাঁদের পরিবারকে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ নানাভাবে লাঞ্ছনা, অপমান ও অত্যাচার করতো। আর কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করলে এই সামাজিক লাঞ্ছনা-অপমান-অত্যাচারের কথা ভেবে কেশবের মা সারদাসুন্দরীকে তাঁর ভাশুর সবসময় তিরস্কার করতেন।

কেশবচন্দ্র সেন পরবর্তীকালে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজকে *নব-বিধান সমাজ* নামে ঘোষণা করেছিলেন। এই নব-বিধানে আরতি-অনুষ্ঠান, হোমানুষ্ঠান, নবান্ন উৎসব ইত্যাদির প্রবর্তন করেছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। ফলে এসবের মধ্যে হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা প্রবর্তনে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের ব্যক্তিগত যোগাযোগ এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আধ্যাত্মিক ভাবনার প্রভাব রয়েছে বলে অনেকেই মনে করেন। ড. বারিদবরণ ঘোষ বলেছেন—

"কেশবচন্দ্রের হৃদয়ের সাধুনতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না। কিন্তু তাঁর নব-বিধান প্রবর্তন নিয়ে ব্রাহ্মসমাজে নানা প্রশ্ন উঠেছিল— বিশেষ করে পৌত্তলিকতার প্রশ্নে। কেশবচন্দ্রের মনের এই পরিবর্তনের জন্য রামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগকে দায়ী করা হয়ে থাকে। বস্তুতপক্ষে প্রতিবার নব-বিধান সমাজের বার্ষিক উৎসবের পরে একদিন কেশবচন্দ্র সদলবলে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে কীর্তন করতেন।"[৩৬]

কেশবচন্দ্রের সঙ্গে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের এই যোগাযোগের কথা কেশবচন্দ্রের মা সারদাসুন্দরী দেবী *আত্মকথা*-য় উল্লেখ করেছেন। সারদাসুন্দরী দেবীর *আত্মকথা* থেকে আমরা জানতে পারি, কেশবচন্দ্রের সঙ্গে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ব্যক্তিগত সম্পর্ক অনেকদিনের— কেশবচন্দ্র যখন দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন তখন একদিন কেশবচন্দ্রের সঙ্গে রামকৃষ্ণের প্রথম

সাক্ষাৎ হয় এবং ক্রমে দু'জনের মধ্যে হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। রামকৃষ্ণ তখন থেকেই মাঝে মাঝে কেশবচন্দ্রের বাড়িতে আসতেন এবং কেশবের হাত ধরে ভক্তির আবেগে নাচ ও গান করতেন। কেশবচন্দ্র সেনও মাঝে মাঝে রামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য দক্ষিণেশ্বরে যেতেন। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে রামকৃষ্ণের হৃদ্যতার কথা বলতে গিয়ে সারদাসুন্দরী দেবী লিখেছেন—

> ''রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয় একদিন আদিসমাজ দেখিতে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনজন উপাসনা করিতেছিলেন। পরমহংস উপাসনার পর বলিলেন, 'এই তিনজনের ভিতর একজনকে দেখে বুঝিতে পারিলাম ইঁহারই হইয়াছে। তারপর তিনি কেশবের সঙ্গে ভাব করেন।''[৩৭]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হিন্দু রক্ষণশীল সমাজের কুসংস্কার, রীতি-নীতি, সংকীর্ণতায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে অনেক প্রগতিশীল ব্যক্তি হিন্দুধর্ম থেকে অপেক্ষাকৃত উদার-প্রগতিশীল ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। ইন্দিরা দেবীর স্বামী প্রিয়নাথ শাস্ত্রী বিয়ের পূর্বে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে আদি ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং তিনি ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একজন প্রিয় শিষ্য। ইন্দিরা দেবীর বাবা শ্রীনাথ ঠাকুর ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাধানাথের পৌত্র মথুরনাথের পুত্র। আবার ইন্দিরার মা হেমাঙ্গিনী দেবী ছিলেন ঠাকুর পরিবারের দৌহিত্রীয় কন্যা। সেই সূত্রে শৈশবকালে একবার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখেছিলেন ইন্দিরা দেবী। বিয়ের পর দ্বিতীয়বার দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ইন্দিরা দেবীর সাক্ষাৎ হয়। তখন থেকে প্রায়ই দেবেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসে এবং তাঁর কাছে ব্রহ্ম উপাসনা সংক্রান্ত নানা উপদেশ শুনে ইন্দিরা দেবী ব্রাহ্মধর্মের অনুরাগী হয়ে এক বুধবার উপাসনার দিন ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং তাঁর ধর্মোপদেশের কথা প্রসঙ্গে ইন্দিরা দেবী *আমার খাতা*-য় বলেছেন—

> ''তাঁহার শান্ত উজ্জ্বল মূর্তি দেখিয়া আমার হৃদয় ভক্তিবিগলিত হইয়া তাঁহার চরণ স্পর্শ করিল। তাঁহাকে আমি একবার খুব ছোটোবেলায় দেখিয়াছিলাম আর এই দেখিলাম। সেই দিন থেকে তিনি আমাকে দেবী বলিয়া সম্বোধন করিতেন ও আমাকে বলিয়া দিলেন— প্রতি বুধবার সন্ধ্যার সময় আমার কাছে আসিবে, আমি তোমাকে ধর্ম উপদেশ দিব ও কথাবার্তা কহিব।
>
> সেই হইতে এক বুধবার আমাকে মন্ত্র দেন।''[৩৮]

এভাবে সেসময় এদেশের অনেকেই ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এদেশের অনেকে হিন্দু সমাজ থেকে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেছিলেন— হিন্দুধর্মের বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান ও পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস হারিয়ে, বৈধব্যের কারণে অহেতুক কঠোর ব্রহ্মচর্য পালনের হাত থেকে বাঁচার জন্যে, মেয়েদের শিক্ষা, মেয়েদের যথার্থ বয়েসে উপযুক্ত পাত্রে বিয়ে দেওয়া প্রভৃতি নানা কারণে। সুদক্ষিণা সেনের *জীবন স্মৃতি* থেকে আমরা জানতে পারি, সুদক্ষিণার মা অনেক আগেই তাঁদের বাড়িতে থাকা ডাক্তার রাজমোহন সেন ও দাদা কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রভাবে ব্রাহ্মধর্মের অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন এবং হিন্দুধর্মের বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান ও পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। আগেই বলেছি উনিশ শতকে কুলীনদের মধ্যে নিয়ম ছিল প্রথমে একটি অকুলীন মেয়েকে বিয়ে করে পরে যতখুশি কুলীন মেয়ে বিয়ে করা যাবে। এই নিয়ম মেনে সুদক্ষিণার বাবা মারা যাওয়ার পর সুদক্ষিণার কাকারা একরকম জোর করেই সুদক্ষিণার দাদা গোবিন্দবন্ধুর বিয়ে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন এরপরে ইচ্ছে করলেই গোবিন্দবন্ধু কুলীন মেয়ে বিয়ে করতে পারবে। এ ঘটনায় সুদক্ষিণার মা ভীত হয়ে উঠেছিলেন— এই আশঙ্কায় যে, সেকালের কুলীনদের বিয়ের নিয়ম অনুযায়ী সুদক্ষিণা এবং তাঁর বোনের যেখানেই বিয়ে দেওয়া হোক না কেন তাঁর মেয়েদের পূর্বে একজন বংশজ সতীন থাকবেই। সুদক্ষিণার বাবার ইচ্ছে ছিল মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে বড়ো করে উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া। কিন্তু কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু সমাজে থেকে সুদক্ষিণার বাবার এই ইচ্ছে পূরণ হওয়া কোনমতেই সম্ভব নয়। কাজেই সুদক্ষিণার মা মেয়েদের কথা ভেবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু সমাজ ত্যাগ করে নারী প্রগতির ধারক ও বাহক ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করবেন। সেজন্য তিনি নিজের অলঙ্কার বিক্রি করে গঙ্গাস্নানের নাম করে সন্তানদের নিয়ে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের অচলায়তন থেকে বেরিয়ে যাত্রা করেছিলেন কলকাতার উদ্দেশ্যে এবং কলকাতায় এসে তিনি কেশবচন্দ্র সেনের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেছিলেন। সেদিনের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে সুদক্ষিণা সেন জানিয়েছেন—

> ‘‘আমরা যে দিবস কলকাতা আসিয়া পৌঁছিলাম, সেই দিবস সৌভাগ্যক্রমে রবিবার ছিল। সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে সকলে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। আমাদিগকেও প্রস্তুত হইতে বলিলেন। তখন বুঝিতে পারি না আমাদিগকে কোথায় লইয়া যাইতেছেন। মন্দিরের সিঁড়ি ভাঙিয়া যখন গ্যালারীর

ওপর উঠিলাম তখন এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিলাম। জীবনে এরূপ দৃশ্য ত কখনও দেখি নাই। আচার্য কেশবচন্দ্র বেদিতে উপবিষ্ট। তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে যেন জ্যোতি নির্গত হইতেছে। ... ব্রহ্মমন্দির হইতে যখন বাড়ি ফিরিলাম তখন যেন অন্য মানুষ হইয়া গিয়াছি, — যেন নূতন জীবন লাভ করিলাম।"[৩৯]

তবে সেকালে অনেকে হিন্দু সমাজ থেকে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করে নতুন জীবন লাভ করতে চাইলেও তাঁদের পরিবারের লোকেরা অনেক সময় জোর করে তাঁদের ব্রাহ্মসমাজ থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে পুনরায় হিন্দু সমাজে ফিরিয়ে নিয়ে যেতেন। সেজন্য ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের পরেও সুদক্ষিণার মার মনে হয়েছিল দেওররা তাঁর মেয়েদের জোর করে ব্রাহ্মসমাজ থেকে নিয়ে গিয়ে অযোগ্য কুলীন পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিতে পারেন। সেকথা ভেবে সুদক্ষিণার মা তাঁর দুই কুলীন মেয়েকে ইচ্ছে করেই বৈদ্য ও কায়স্থ বংশীয় অকুলীন পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন ব্রাহ্মমতে— কেননা এই অসবর্ণ বিয়ের ফলে তাঁর দেওররা আর তাঁদের হিন্দু সমাজে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না সমাজচ্যুত হওয়ার ভয়ে।

হিন্দু সমাজের বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান, কুসংস্কার, জাতিভেদপ্রথা ইত্যাদি সংকীর্ণতা থেকে মানুষকে মুক্তি দানের জন্য উনিশ শতকে এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ব্রাহ্মসমাজ। রামমোহন রায় মনে করেছিলেন পৃথিবীতে একটি মাত্র জাতি— সেটি হল মানব জাতি আর পৃথিবীর সকল ধর্মই এক। সেজন্য রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজে নিরাকার এক ব্রহ্মের উপাসনার সূচনা করেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার জন্য যে ব্রহ্মসংগীত পরিবেশিত হতো সেখানে হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান সকলে একসঙ্গে ব্রহ্মসংগীত পরিবেশন করতেন। অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজ প্রথম থেকেই সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে সর্বধর্মের সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছিল। এমনকি, হিন্দু সমাজে যে জাতিভেদপ্রথা কঠোর ভাবে মেনে চলা হতো তার বিরুদ্ধেও বিরোধিতা করে ব্রাহ্মসমাজ শূদ্রদের সামনে ব্রাহ্মণদের বেদপাঠের ব্যবস্থা করেছিল। কেননা হিন্দু সমাজে শূদ্রদের বেদপাঠ ও বেদ শ্রবণ নিষিদ্ধ ছিল। এভাবে আমরা দেখি উনিশ শতকে ব্রাহ্মসমাজে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এক উদার-সমন্বয়ী ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়। তাই আমরা দেখি জালালউদ্দিন মিঞা নামে একজন মুসলমান ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়ে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের আশ্রম প্রতিষ্ঠা হলে তিনি সস্ত্রীক সেখানে বাস করতেন। সুদক্ষিণা সেন পরবর্তীকালে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ থেকে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে যান এবং তিনি যখন সপরিবারে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের আশ্রমে

বাস করতেন তখন মুসলমান ধর্ম থেকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত জালালউদ্দিন মিঞাও সস্ত্রীক সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। ফলে সে সময় ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের আশ্রমে আশ্রিত ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মিকাদের সঙ্গে সুদক্ষিণার পরিবারের একটা সুন্দর আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল—'সকলে মিলিয়া একটি পরিবার।' স্বাভাবিকভাবে জালালউদ্দিনের পরিবারের সঙ্গে সুদক্ষিণার পরিবারেরও একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। সেই সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে সুদক্ষিণা সেন *জীবন স্মৃতি*-তে লিখেছেন—

> ''জালাল মিঞা নামক একজন মুসলমান ভদ্রলোক ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনিও এই আশ্রমে ছিলেন। মাতৃদেবীকে তিনি দিদি বলিয়া ডাকিতেন। আমরা তাঁহাকে মিঞামামা ও তাঁহার পত্নী প্যারীবিবিকে মিঞামামি বলিয়া ডাকিতাম। জাতিভেদের আবরণ কিছুই ছিল না।''[৪০]

এভাবে ব্রাহ্মসমাজ ধর্মীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে মুসলমান জালালউদ্দিনকে আপনজন করে নিয়েছিল, অপরদিকে জালালউদ্দিন ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করলে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ ধর্মীয় সংকীর্ণতা থেকে তার তীব্র বিরোধিতা করেছিল।

উনিশ শতকে ব্রাহ্মধর্ম প্রসারে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের পাশাপাশি ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকাও ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্রজসুন্দর মিত্রের উদ্যোগে ১৮৪৬ সালে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুপ্রেরণায় ও উপদেশে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ছিলেন ব্রাহ্মধর্মের একজন অন্যতম প্রচারক। তিনি ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য পঁচিশ বছর ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেছিলেন। ১৮৬৩ সালে তিনি প্রথম ব্রাহ্মসমাজের আচার্য হয়ে ঢাকায় গিয়েছিলেন। কামিনী রায়ের পিতা চণ্ডীচরণ সেন ১৮৭০ সালে এই বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তবে এর পূর্বে চণ্ডীচরণ সেন যখন বরিশালের স্কুলে পড়তেন তখনই তিনি ব্রাহ্মধর্মের অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন। এসময় তিনি সেখানে অন্যান্য ব্রাহ্মদের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। এসময় থেকেই হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁর অনাস্থা এবং ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ পায়। পরবর্তীকালে তিনি যখন ঢাকায় পড়তে গেলেন তখন ব্রাহ্মধর্মের প্রতি তাঁর এই অনুরাগ আরো বৃদ্ধি পায় ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায়। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে কিছুকাল পরে তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। বরিশালের স্কুল জীবন থেকেই যে চণ্ডীচরণ সেন ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন তার বর্ণনা

দিতে গিয়ে কামিনী রায় *শ্রাদ্ধিকী* গ্রন্থে বলেছেন—

> ''স্কুলে ভরতি হওয়ার তিন বৎসরের মধ্যেই তৎকাল প্রচলিত হিন্দুধর্মের উপরে তাহার অনাস্থা উপস্থিত হইল। তৎকালে পূজনীয় রামতনু লাহিড়ী বরিশালে তাঁহার একজন শিক্ষক ছিলেন। শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি পুরাতন ব্রাহ্মগণ যখন বরিশালে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে ছিলেন, পিতা মহাশয় তখন দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র। সেই সময় হইতেই তিনি ব্রাহ্মদিগের সহিত উৎসাহ সহকারে যোগদিতে আরম্ভ করিয়া ছিলেন।''[৪১]

কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মদের অসবর্ণ বিবাহকে আইনসিদ্ধ করার জন্য উদ্যোগী হয়ে উঠেছিলেন এবং মূলত তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৮৭২ সালে *তিন আইন* নামে ব্রাহ্মদের বিবাহ বিধিসম্মত হয়েছিল। এই বিবাহ পদ্ধতিতে পাত্রীর বয়স কমপক্ষে চোদ্দ এবং পাত্রের বয়স আঠারো হতে হয়, আর এ পদ্ধতিতে বিয়ের সময় পাত্র-পাত্রীকে ঘোষণা করতে হয় আমরা হিন্দু নই বা কোনো সম্প্রদায়ভুক্ত নই। বস্তুত *তিন আইন* নামে ব্রাহ্মদের যে বিবাহ পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা হল— তা হিন্দুদের বিবাহ পদ্ধতির পরিপন্থী হওয়ায় এ বিবাহ পদ্ধতির বিরুদ্ধে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের বিরোধিতা লক্ষ করা যায়। শরৎকুমারী দেবের বাবা এবং শ্বশুর দু'জনেই হিন্দু সমাজ থেকে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেছিলেন বলে তাঁরা ঠিক করেছিলেন তাঁদের মেয়ে ও ছেলের অর্থাৎ শরৎকুমারী ও সত্যপ্রিয়ের বিয়ে *তিন আইনে* ব্রাহ্মবিবাহ পদ্ধতিতে হবে। এদিকে শরৎকুমারীর জেঠা ও কাকা এ সংবাদ পেয়ে অসন্তুষ্ট হন এবং তাঁদের পৈতৃক বাড়িতে ব্রাহ্মবিবাহ দেওয়া যাবে না বলে জানিয়ে দেন। কেননা শরৎকুমারীর বাবা ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করলেও জেঠা ও কাকা হিন্দু সমাজেই ছিলেন—স্বাভাবিকভাবেই হিন্দু বিবাহের পরিপন্থী ব্রাহ্মদের নতুন বিবাহ পদ্ধতিকে তাঁরা মেনে নিতে পারেননি। এদিকে ভাইদের কাছে বাধা পেয়ে শরৎকুমারীর বাবা কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে পরামর্শ করে রাতারাতি সার্কুলার রোডে একটি বড়বাড়ি ভাড়া করে বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। শরৎকুমারীর ব্রাহ্মবিবাহে তাঁর জেঠা ও কাকার বাধা এবং তাঁর বাবার ব্রাহ্মবিবাহে অটল থাকার প্রসঙ্গে তিনি *আমার সংসার* গ্রন্থে জানিয়েছেন—

> ''বাগবাজারে পিতার পৈতৃক বাটীতে আমার অব্যূঢ়ান্ন সমারোহ সমাধা হইবার পর, আমার জ্যেষ্ঠতাত ও খুল্লতাতগণ *"ইণ্ডিয়ান মিরার"* কাগজ পাঠে জানিলেন যে, এ বিবাহ নব আইন অনুসারে ও ব্রাহ্ম মতে হইতেছে। তখন তাঁহারা মহাকাণ্ড

> বাধাইলেন ও বলিলেনে, ''স্থানান্তরে দাও এ ভিটায় কখনো হইতে পারিবে না''। তখন পিতা আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া সার্কুলার রোডে সেই রাত্রের মধ্যেই একখানি সুবৃহৎ কক্ষযুক্ত বাটী ভাড়া লইয়া সুন্দর বস্ত্রাবাসে সভা সাজাইয়া সেই লগ্নেই কন্যা পাত্রস্থ করিতে দৃঢ় সংকল্প করিলেন।''[৪২]

এরপরও রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ থেকে নানা চক্রান্ত চালানো হয় যাতে সেই ব্রাহ্মবিবাহ পণ্ড হয়। বিরুদ্ধ দল বর যাতে বিবাহ বাসরে উপস্থিত হতে না পারে সেজন্য সদলবলে উপস্থিত হয়ে মাঝপথেই বরকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু শরৎকুমারীর পিতা এরকম চক্রান্তের কথা আশঙ্কা করে আগে থেকেই রাস্তায় ইউরোপীয় কন্সটেবল প্রহরী রাখার ফলে বর ও বরযাত্রী সকলেই বিনা বাধায় বিবাহ বাসরে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং ১৮৭৩ সালের ৩১ আগস্ট শরৎকুমারী ও সত্যপ্রিয়ের শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল *তিন আইন* অনুসারে ব্রাহ্মবিবাহ পদ্ধতিতে। বস্তুত শরৎকুমারী দেবের বিবাহে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের বিরোধিতায় আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, সেকালে যাঁরা ব্রাহ্মমতে বিবাহ করতেন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ তাঁদের নানাভাবে লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করতো।

সারদাসুন্দরী দেবী *আত্মকথা* গ্রন্থে জানিয়েছেন, কেশবচন্দ্র তাঁর মেয়ে সুনীতি দেবীর বিয়ে কোচবিহারের রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে ব্রাহ্মবিবাহ অনুসারেই দিয়েছিলেন। কিন্তু রাজার পরিবার হিন্দু হওয়ায় তাঁরা বিয়েতে হোমানুষ্ঠান করেছিলেন— সেজন্য বিয়েটি শেষপর্যন্ত হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানের রীতি মেনে সম্পন্ন হয়েছিল। এর ফলে বিয়ের শেষে কেশবচন্দ্র যখন কোচবিহার থেকে কলকাতায় ফিরে এলেন তখন তাঁকে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কিছু প্রগতিশীল ব্রাহ্ম নানাভাবে অপমান করেছিলেন। কেননা তিনি নিজে ব্রাহ্ম হয়েও মেয়ের বিবাহ ব্রাহ্মবিবাহ অনুসারে না দিয়ে হিন্দু মতে দিয়েছিলেন। সারদাসুন্দরী দেবী সুনীতি দেবীর বিয়েকে কেন্দ্র করে কেশবচন্দ্রের অপমানিত হওয়ার কথা বর্ণনা করতেগিয়ে লিখেছেন—

> ''আমরা বিয়ের দুই দিন পরেই রানিকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসি। কলিকাতায় আসার পর চারিদিক হইতে কেশবের উপর অত্যাচার আরম্ভ হইল। আমরা যেদিন এখানে আসি, তার পরদিনই মহারাজা বিলাত চলিয়া গেলেন। রানির সঙ্গে আর দেখা হয় নাই। এই বিবাহের জন্য কেশব যাহা সহ্য করিয়াছেন, লোকে তাহা পারে না। যে উদ্দেশে কেশব এত সহ্য করিলেন, কুচবিহার রাজ্যে

তাহা পূর্ণ হোক।”[৪৩]

তবে কেশবের মেয়ে সুনীতি দেবীর বিয়ে হিন্দু মতে হয়েছিল কেবলমাত্র সেজন্যই অন্যান্য ব্রাহ্মরা কেশবের বিরোধিতা করেননি, এর পেছনে আরো কারণ রয়েছে। ব্রাহ্মবিবাহ *তিন আইনে*-র দ্বারা বিধিবদ্ধ করার ব্যাপারে কেশবচন্দ্রই সবথেকে বেশি উদ্যোগী ছিলেন। এই *তিন আইন* বিবাহবিধিতে বলা হয়েছিল বিয়েতে পাত্রীর বয়স হতে হবে কমপক্ষে চোদ্দ বছর এবং পাত্রের বয়স হতে হবে আঠারো বছর, আর বিয়ের পর পাত্র-পাত্রীকে ঘোষণা করতে হয় তাঁরা হিন্দু নন বা কোনো সম্প্রদায়ভুক্ত নন। অথচ বিয়ের সময় সুনীতি দেবীর বয়স চোদ্দ পূর্ণ হয়নি এবং রাজার বয়সও আঠারো হয়নি। আর বিয়ে হিন্দুমতে হওয়ায় সেখানে পাত্র-পাত্রীরা স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা হিন্দু নন এরকম কোনো মন্তব্য করেননি। তাই যে কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে *তিন আইন* বিবাহ পদ্ধতি বিধিবদ্ধ হলো সেই কেশবচন্দ্রই নিজের মেয়ে সুনীতির বিয়েতে সেই বিবাহবিধির নিয়ম লঙ্ঘন করলেন। কেশবচন্দ্রের এই দ্বিচারিতার জন্যই তাঁকে অন্যান্য প্রগতিশীল ব্রাহ্মদের দ্বারা লাঞ্ছিত-অপমানিত হতে হয়েছিল। সারদাসুন্দরী দেবী সেকালের নারী হওয়ায় তাঁর পক্ষে এতকিছু জানা সম্ভব হয়নি বলেই তিনি মূলত সুনীতি দেবীর হিন্দুমতে বিয়েকেই অন্যান্য ব্রাহ্মদের দ্বারা কেশবের অপমানিত-লাঞ্ছিত হওয়ার কারণ বলে উল্লেখ করেছেন।

শরৎকুমারী দেবের *আমার সংসার* গ্রন্থ থেকে জানতে পারি, শরৎকুমারীর পিতা কালীনাথ বসু প্রথমে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেছিলেন এবং এই সমাজে তিনি কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতা ও প্রার্থনা শুনে কেশবচন্দ্রের একান্ত অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন। পরবর্তীকালে কেশবচন্দ্র জাতিভেদপ্রথা বিলোপের জন্যে অসবর্ণ বিবাহ সংঘটিত করলে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে যখন পুনরায় ব্রাহ্মণদের পইতা সমেত কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের বেদীতে বসার অধিকার দিলেন তখন কেশবচন্দ্র এবং তাঁর অনুগামীরা এর বিরোধিতা করেছিলেন এবং দেবেন্দ্রনাথের কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ থেকে বেরিয়ে গিয়ে ১৮৬৬ সালের ১১ নভেম্বর *ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ* নামে পৃথক একটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে এই বিচ্ছেদের পর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের নামকরণ করেছিলেন *আদি ব্রাহ্মসমাজ*। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পর শরৎকুমারীর পিতা কালীনাথ বসু সেখানে যোগদান করলেও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গেও তাঁর আগের মতোই হৃদ্যতা ছিল। তবে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে বেশিরভাগ সময় তাঁদের যোগ দিতে হতো বলে সে সময় ইচ্ছে থাকলেও তিনি দেবেন্দ্রনাথের

আদি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিতে পারতেন না। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজেও কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে অন্যান্য ব্রাহ্মদের বিরোধিতা লক্ষ করা যায়। কেশবচন্দ্রের মেয়ে সুনীতি দেবীর সঙ্গে কোচবিহারের রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের বিয়ে হয়েছিল ১৮৭৮ সালের ৬ মার্চ। আগেই বলেছি এ বিয়ের সময় সুনীতি দেবীর বয়স যেহেতু চোদ্দ পূর্ণ হয়নি ও রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণেরও বয়স আঠারো পূর্ণ হয়নি এবং এ বিয়ে ব্রাহ্ম বিয়ের নিয়ম অনুযায়ী না হয়ে হিন্দু বিয়ের নিয়ম অনুযায়ী হয়েছে সেহেতু ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্বর্তী কেশবচন্দ্রের বিরোধী ব্রাহ্ম— শিবচন্দ্র দেব, দুর্গামোহন দাস, আনন্দমোহন বসু, দুকড়ি ঘোষ, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, সত্যপ্রিয় দেব প্রমুখরা কেবশচন্দ্রের বিরোধিতা করেছিলেন। কেননা কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মদের অসবর্ণ বিয়েকে আইনসিদ্ধ করার জন্য উদ্যোগী হলে ১৮৭২সালে *তিন আইন* নামে ব্রাহ্মদের বিয়ে পদ্ধতি বিধিসম্মত হয়। এ প্রসঙ্গে স্বপন বসু বলেছেন—

> ‘‘এইকালে কেশবচন্দ্র সেন এবং তাঁর অনুগামীরা নতুন একটি বিবাহবিধি প্রবর্তনের জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে ব্যস্ত। তাঁদের প্রচেষ্টা ১৮৭২-এ সফল হয়। এই বছর নতুন যে বিবাহবিধি চালু হয়, তা তিন আইনে বিবাহ নামে খ্যাত। মেয়ের বয়স কমপক্ষে চোদ্দ ও ছেলের বয়স কম করে আঠারো না হলে এই আইন অনুযায়ী বিয়ে করা সম্ভব ছিল না।’’[৪৪]

স্বাভাবিকভাবে এই *তিন আইনে*-র জন্যই পরবর্তীকালে সুনীতি দেবীর বিয়েকে কেন্দ্র করে কেশবচন্দ্র অপমানিত হয়েছিলেন সে বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করেছি। এক্ষেত্রে কেশবচন্দ্রের বিরোধীদের যুক্তি ছিল ইতিপূর্বে যাঁরা *তিন আইন* মতে বিয়ে করে সমাজচ্যুত ও জাতিচ্যুত হয়ে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের কাছে অনেক লাঞ্ছনা-অপমান সহ্য করেছেন সেখানে কেশবচন্দ্র সেন নিজের মেয়ে সুনীতির বিয়েতে সেই বিয়ের পদ্ধতি না মানায় এরপর অনেকেই সেই বিবাহবিধিতে বিয়ে করতে রাজি হবেন না হিন্দু রক্ষণশীল সমাজের অত্যাচার-লাঞ্ছনার ভয়ে। ফলে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ ব্যাহত হবে। এতদিন পর্যন্ত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ভেতরে নানা কারণে কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে বিরোধিতার যে চোরাস্রোত বয়ে যাচ্ছিল, তা সুনীতি দেবীর বিয়েকে কেন্দ্র করে শতধারায় প্রকট হয়ে ওঠে। এসময় কেশবচন্দ্রের বিরোধী সভ্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শরৎকুমারী দেবের শ্বশুর শিবচন্দ্র দেব এবং স্বামী সত্যপ্রিয় দেব। অন্যদিকে সেসময় শরৎকুমারীর পিতা কালীনাথ বসু কেশবচন্দ্রের পক্ষেই ছিলেন। সেজন্য এসময় সত্যপ্রিয় ও শরৎকুমারীর কন্যা নির্মলার জাতকর্ম

অনুষ্ঠানে সত্যপ্রিয় কেশবচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করেননি এবং সত্যপ্রিয়ের শ্বশুর কালীনাথ বসু সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে যখন জানতে পারেন কেশবচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি তখন তিনি এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। এখান থেকেই যে শরৎকুমারীর শ্বশুরকুল ও পিতৃকুলের মনান্তরের সূচনা হয়েছিল সেকথা বলতে গিয়ে শরৎকুমারী দেব *আমার সংসার* গ্রন্থে লিখেছেন—

> ''আমাদের বিবাহের দেড় বৎসর পরে খ্রি: ১৮৭৮ সালে ২ এপ্রিল, বাং ২১ শে চৈত্র যখন নির্মলার জন্ম হয়, সে সময় কোচবিহার বিবাহ লইয়া আন্দোলন চলিতে ছিল। ২৮ এপ্রিল নির্মলার জাতকর্মে কলকাতায় দুকড়ি বাবুর বাড়ি সেই প্রথম আচার্য মহাশয় কেশবচন্দ্র সেন বিনা আমাদের মঙ্গলক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ায় আমার শ্বশুরকুল ও পিতৃকুলে মনান্তর ঘটে।''[৪৫]

এসময় সুনীতি দেবীর বিয়েকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত কেশবচন্দ্রের বিরোধীরা একত্রিত হয়ে অনেক সভার আয়োজন করেছিলেন কেশবচন্দ্রকে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য পদ থেকে অপসারণের জন্যে। এরপর একদিন প্রকাশ্য সভায় শিবনাথ শাস্ত্রী কেশবচন্দ্রকে আচার্য পদ থেকে অপসারণের প্রস্তাব তুললে কেশবচন্দ্র তাঁর অনুগামীদের নিয়ে সেই সভা ত্যাগ করলেও কেশব বিরোধী ব্রাহ্মদের মধ্যে সে বিষয়ে প্রচণ্ড তর্ক-বিতর্ক চলতেই থাকে এবং সেই তর্ক-বিতর্কে শরৎকুমারীর স্বামী-শ্বশুরও যোগ দিতেন। ব্রাহ্মসমাজের এই দলাদলি শরৎকুমারীর দাম্পত্য জীবনেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। কেননা এই দলাদলিতে শরৎকুমারীর পিতা কালীনাথ বসু কেশবচন্দ্রের পক্ষে ছিলেন এবং শরৎকুমারীর স্বামী সত্যপ্রিয় দেব ও শ্বশুর শিবচন্দ্র দেব কেশবচন্দ্রের বিপক্ষে ছিলেন। এসময় কালীনাথ বসু শরৎকুমারীর শ্বশুরবাড়িতে গেলে সত্যপ্রিয় দেব কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে কথা বলে শ্বশুর কালীনাথকে উত্তেজিত করে তুলতেন, অন্যদিকে কালীনাথও উত্তেজিত হয়ে কেশবচন্দ্রের বিরোধী দলের সম্পর্কে দু'একটি খারাপ কথা বললে সত্যপ্রিয়ও উত্তেজিত হয়ে উঠতেন। সুনীতি দেবীর বিয়েকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত ব্রাহ্মদের এই দলাদলি কীভাবে শরৎকুমারীর পিতা এবং স্বামীর মধ্যেও প্রবল তর্ক-বিতর্কের সূচনা করতো তার বর্ণনা দিতে গিয়ে শরৎকুমারী দেব জানিয়েছেন—

> ''শুনিতাম আচার্য মহাশয় চলিয়া গেলেও ঘোর বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতেছে, ইনিও মধ্যে মধ্যে দু-একটি কথার ফোড়ন দিতেছেন। আমার পিতা আসিলে, কেশবচন্দ্র বিরুদ্ধের কথা তাঁর অপ্রিয় লাগিবে, কিম্বা রাগি মানুষ শুনিলে হঠাৎ পাছে রাগিয়া

> উঠেন ভাবিয়া, আমার শ্বশুর মহাশয় স্বেচ্ছায় মিটিং-এর কোনো কথা বৈবাহিকের কাছে পাড়িতেন না। কিন্তু ইনি বাবা আসিবামাত্রই সেই কথা লইয়া বসিতেন, তিনিও জ্বলিয়া উঠিতেন, মাঝে মাঝে বলিতেন, ''নতুন দলের নেতা কে? যাঁহার সাতটি বিবাহ? আর একজন যে হন্নে কুকুরের মতো কামড়াতে আসে রাগে"।"[৪৬]

জামাই-শ্বশুরের এই বাক্‌যুদ্ধে শরৎকুমারীর পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের মধ্যে একটা অশান্তির বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল— যা শরৎকুমারীকে গভীর মনোবেদনায় বিষণ্ণ করে তুলতো। এদিকে অনেক বাক্-বিতণ্ডার পরেও কেশবচন্দ্রের বিরোধীরা কেশবচন্দ্রকে আচার্য পদ থেকে সরাতে না পেরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন এবং ১৫ মে ১৮৭৮ সালে তাঁরা *সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ* নামে পৃথক একটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সম্পাদক হয়েছিলেন শরৎকুমারী দেবের শ্বশুর শিবচন্দ্র দেব। আর এ সময় শরৎকুমারীর পিতা কালীনাথ বসু কেশবচন্দ্রের সঙ্গেই ছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার প্রায় এক বছর পরে সত্যপ্রিয় ও শরৎকুমারীর কন্যা নির্মলার নামকরণ উপলক্ষে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল সেই অনুষ্ঠানে আত্মীয়তার খাতিরে কালীনাথ বসুকে নিমন্ত্রণ করা হলেও কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজের আর কোনো সভ্যকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি। এ ঘটনায় শরৎকুমারীর পিতা কালীনাথ বসু ক্ষুব্ধ হয়ে মিষ্টিমুখ না করেই চলে যাওয়ায় শরৎকুমারীর শ্বশুর শিবচন্দ্র দেব খুবই দুঃখ পেয়েছিলেন। এভাবে ব্রাহ্মসমাজের দলাদলির প্রভাবে শরৎকুমারীর পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের মধ্যে যে মনান্তর ঘটেছিল— তা থেকে আমরা সহজেই অনুমান করে নিতে পারি সেকালে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের এই দলাদলিতে অনেক ব্রাহ্ম পরিবারের তথা ব্রাহ্মের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবেও মনান্তর হয়েছিল।

সুনীতি দেবীর বিয়েকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়লে ব্রাহ্মরা নিজেদের মতাদর্শ অনুযায়ী দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই দু'দলের মধ্যে মতাদর্শগত ভিন্নতার কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মনান্তর ঘটতো। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও লক্ষ করা যায়। কামিনী রায় *শ্রাদ্ধিকী* গ্রন্থে জানিয়েছেন, তাঁর স্বামী কেদারনাথ রায় প্রথমে কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেছিলেন এবং কেশবচন্দ্রের সঙ্গে কেদারনাথের সদ্ভাব ছিল। কেদারনাথ রায় যখন কর্মসূত্রে বাঁকীপুরে ছিলেন তখন কেশবচন্দ্র সেন কয়েকজন প্রচারককে সঙ্গে নিয়ে সেখানে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করতে এসে কেদারনাথের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ভেঙে যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত

হয়েছিল তখন কেদারনাথ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করলেও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর আজীবন সুসম্পর্কই বজায় ছিল। অর্থাৎ এক্ষেত্রে মতাদর্শগত ভিন্নতার কারণে কেদারনাথ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ থেকে বেরিয়ে গেলেও তাঁদের সঙ্গে তাঁর কখনো মনান্তর ঘটেনি। আবার এ সময় অনেকে মনান্তরের ভয়ে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কিংবা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ— কোনো ব্রাহ্মসমাজেই নির্দিষ্টভাবে নাম লেখাননি। কেশবচন্দ্রের কাছে সুদক্ষিণা সেনের স্বামী অম্বিকাচরণ সেন ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং কেশবচন্দ্রকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ দ্বিধাবিভক্ত হলেও অম্বিকাচরণ সেন সেই বিতর্কের মধ্যে না থেকে দুই ব্রাহ্মসমাজেই যোগদান করতেন। কেননা দুই সমাজের ব্রাহ্মদের প্রতিই ছিল তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। সুদক্ষিণা সেন *জীবন স্মৃতি*-তে স্বামী অম্বিকাচরণের এই সমন্বয়বাদী মনোভাবের প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> ‘‘... পরের দলাদলির ভিতর তিনি থাকিবেন না, দুই সমাজেই সমভাবে যোগদান করিবেন। বস্তুত নববিধান ও সাধারণ, দুই ব্রাহ্মসমাজেরই প্রচারক ও বন্ধুদিগকে তিনি সমভাবে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা দান করিতেন। তাঁহার ধর্ম মিলনের ধর্ম ছিল। বুদ্ধদেবের প্রতিও স্বামীর প্রগাঢ় ভক্তি ছিল।’’[৪৭]

উনিশ শতকে ব্রাহ্মসমাজ নারী শিক্ষা, বাল্যবিবাহ নিবারণ, বিধবার বিবাহ দান, রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ থেকে কুলীন কন্যা ও বিধবা কন্যা উদ্ধার করে ব্রাহ্মসমাজে আশ্রয় দান প্রভৃতি নারী কল্যাণমূলক কাজ করেছিল। ফলে উনিশ শতকে বালবিধবা নারীরা তাঁদের ওপর হিন্দু সমাজের আরোপিত ব্রহ্মচর্য পালনের কঠোর বিধান তথা সামাজিক অত্যাচারের হাত থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে বাঁচার জন্য হিন্দু সমাজ থেকে পালিয়ে ব্রাহ্মসমাজে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সুদক্ষিণা সেন *জীবন স্মৃতি*- তে জানিয়েছেন, তাঁর প্রতিবেশিনী পার্বতী মাসি বালবিধবা ছিলেন এবং অল্পবয়সে মাতৃহীন হলে বিমাতার আগমনে পার্বতী মাসির জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল— একদিকে বাল্যকাল থেকে কঠোর ব্রহ্মচর্য পালনে এবং অন্যদিকে বিমাতার অত্যাচারে। এরকম দুর্বিষহ বন্দী জীবন কাটানোর সময় পার্বতী মাসি সুদক্ষিণার মামা কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে একদিন ব্রাহ্মসমাজের নারী কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের কথা শুনে ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণে আগ্রহী হয়েছিলেন। কালীচরণের কাছে ব্রাহ্ম ভগবানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পার্বতীর দুঃখের কথা এবং পার্বতীর ব্রাহ্মসমাজে আশ্রয় গ্রহণের ইচ্ছার কথা শুনেছিলেন। পরে ভগবানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও আরো কয়েকজন ব্রাহ্মের প্রচেষ্টায় পার্বতী হিন্দু সমাজ তথা পিতৃগৃহ থেকে পালিয়ে ব্রাহ্মসমাজে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।

আবার ১৮৫৬ সালে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় ব্রিটিশ সরকার বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়ন করেছিলেন। কিন্তু তখনও রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে হিন্দু বিধবার পুনর্বার বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল এবং যাঁরা আইন পাশ হলে বিধবা বিবাহ করতেন তাঁদের নানা ভাবে অত্যাচার করা হতো। ফলে বিধবা বিবাহ আইন পাশ হলেও কেউ বিধবা বিবাহ করার সাহস দেখাতেন না সামাজিক বয়কটের ভয়ে। এরকম অবস্থায় বিধবাদের বিবাহ প্রায় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে, ফলে বালবিধবা নারীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। তবে ব্রাহ্মসমাজ বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী ছিল এবং অনেক বালবিধবা নারীকে তাঁরা হিন্দু সমাজ থেকে উদ্ধার করে লেখাপড়া শিখিয়ে বিয়ে দিয়েছিলেন। কামিনী রায়ের *শ্রাদ্ধিকী* গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি, তাঁর পিতা চণ্ডীচরণ সেন ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করে কয়েকজন বিধবা নারীকে নিজের কাছে আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং জলপাইগুড়িতে থাকার সময় তিনি একজন বিধবা নারীকে নিজের কাছে আশ্রয় দিয়ে পরে সেই বিধবা নারীর বিয়ে দিয়েছিলেন। এভাবে তখনকার ব্রাহ্মসমাজের প্রায় সকল সভ্যই এরকম নারীকল্যাণমূলক কাজে যুক্ত থাকতেন।

উনিশ শতকে হিন্দু রক্ষণশীল সমাজ ছিল নানা কুসংস্কার এবং সামাজিক বিধি-নিষেধের সংস্কারে আবদ্ধ। সে সময় রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে সমুদ্র পার করে বিদেশে যাওয়া, ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করা, খ্রিস্টান-মুসলমানদের সঙ্গে মেলামেশা করা এবং তাদের সঙ্গে একত্রে আহার করা, শূদ্র তথা নিচু জাতের মানুষকে স্পর্শ করা, ব্রাহ্মণদের পইতা ত্যাগ করা নিষিদ্ধ ছিল। প্রসন্নময়ী দেবী *পূর্ব্বকথা-য়* জানিয়েছেন, তাঁর বড় ভাই আশুতোষ চৌধুরী সমুদ্র পার করে বিদেশে গেলে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ তাঁর পরিবারকে সমাজচ্যুত করে একঘরে করে দিয়েছিল। কেননা উনিশ শতকে সমুদ্র পার হয়ে হিন্দুদের বিদেশ যাত্রা নিষিদ্ধ ছিল হিন্দু রক্ষণশীল সমাজে। তাই সেসময় যারা বিদেশ যেতো তাঁদের জাত গেছে বলে মনে করা হতো এবং তাঁদের পরিবারকে সামাজিক অত্যাচার সহ্য করতে হতো। সেজন্য প্রসন্নময়ীর পিতা দুর্গাদাসকে সামাজিক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল। তবে দুর্গাদাস চৌধুরী তাঁর বড় ছেলে আশুতোষকে ত্যাগ না করায় তাঁকেও জাতিচ্যুত করা হয়েছিল। সেসময় যাকে জাতিচ্যুত করা হতো তাঁর সঙ্গে যদি কেউ মেলামেশা করতো তাহলে তাঁকেও সমাজচ্যুত করে একঘরে করে রাখা হতো— তাই দুর্গাদাসের সকল আত্মীয় একঘরে হওয়ার আশঙ্কায় দুর্গাদাসকে ত্যাগ করেছিলেন। কেননা সেকালে খুবই মারাত্মক ছিল এই একঘরে প্রথা— এটি এমন একধরনের সামাজিক শাস্তি যাতে মানুষ সমাজের মধ্যে বাস করেও যেন বিচ্ছিন্ন দ্বীপে নিঃসঙ্গ হয়ে যেতো। এই একঘরে প্রথায় যাকে একঘরে করা হতো তার বাড়ির সকল অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হতো,

কেউ তার কোনো কাজ করতো না বা তার সঙ্গে মেলামেশা করতো না, এমনকি তার বাড়ির কেউ মারা গেলেও কেউ সহযোগিতা করতো না। প্রসন্নময়ী দেবী *পূর্ব্বকথা* গ্রন্থে সেকালের এই ভয়ঙ্কর প্রথা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

> ''সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর দণ্ড 'একঘরে' করা। কন্যার বিবাহ, পুত্রের উপনয়ন, পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ বন্ধ, গ্রামে কাহারও নিমন্ত্রণ নাই, গুরু পুরোহিত ধোপা নাপিত দাস দাসী এবং ভুঁইমালি পর্যন্ত এককালীন রহিত। পথে ঘাটে বাহির হওয়া দুঃসাধ্য।...
>
> সর্ব্বাপেক্ষা দুর্গতি 'একঘরে' ব্যক্তির গৃহে মৃত্যু সংগঠন হইলে সৎকার করিবার লোক ও দাহের কাষ্ঠ পাওয়া যায় না! কাহারও কোনো সহানুভূতি নাই, বাসিমরা হইবার ভয়ে প্রিয়তম আত্মীয় স্বজনের মৃতদেহ আপন স্কন্ধে বহন করিয়া শ্মশান ঘাটে লইয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে হয়, জনপ্রাণী সাহায্য করে না। এ শাস্তি ফাঁসির অপেক্ষাও ভয়ংকর।''[৪৮]

এতটাই নির্মম ছিল এই একঘরে প্রথা। তবে প্রসন্নময়ীর পিতা দুর্গাদাস একঘরে প্রথার ভয় পাননি বলেই সমুদ্র পার হয়ে পুত্র আশুতোষ বিদেশে গেলেও তাঁকে ত্যাগ করেননি। তবে সেকালে এর বিপরীত ঘটনাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে লক্ষ করা যেতো। সেকালে কোনো হিন্দু ব্যক্তি সমুদ্র পার করে বিদেশে গিয়ে দেশে ফিরে এলে হিন্দু সমাজ এমনকি তার মা-বাবা, ভাই-বোন ও নিকট আত্মীয়রা তার জাত গেছে মনে করে তাকে আর গ্রহণ করতে চাইতো না একঘরে হওয়ার আশঙ্কায়। সেজন্য বিদেশ থেকে আগত কোনো ব্যক্তিকে তার নিকট আত্মীয়রা ত্যাগ করে সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চাইতো— এমনই ভয়ঙ্কর ছিল সেকালের রক্ষণশীল সমাজের জাত-পাতের লড়াই। কৃষ্ণভাবিনী দাসী স্বামী দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সেকালে ইংল্যাণ্ডে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যখন পুরুষদেরই সমুদ্র পার হয়ে বিদেশ যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। অনিবার্যভাবে হিন্দু রক্ষণশীল সমাজ যে তাঁকে জাতিচ্যুত করবে, এমনকি তাঁর নিকট আত্মীয়রাও যে তাঁর জাত গেছে মনে করে তাঁকে ত্যাগ করবেন— এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। তাই স্বামী দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে যখন তিনি ইংল্যাণ্ডে যাওয়ার জন্য জাহাজে করে সমুদ্র পথে পাড়ি দিয়েছিলেন তখন তিনি মনে মনে ভেবেছিলেন তাঁর এই সমুদ্রপথে বিদেশে যাওয়ার জন্য তাঁর মা তাঁকে খ্রিস্টান বিবেচনা করে দুঃখ পাবেন। কেননা তাঁর এই সমুদ্র যাত্রার মতো নিষিদ্ধ কাজের জন্যে তাঁর মা আর যে তাঁর সাথে এজীবনে সামাজিক সম্পর্ক রাখতে পারবেন না— যদি রাখেন তাহলে তাঁকেও জাতিচ্যুত করা হবে। কৃষ্ণভাবিনীর মা

যেন একদিকে জাতিচ্যুত হওয়ার ভয় এবং অন্যদিকে কন্যাকে ত্যাগ করার মানসিক বেদনায় ক্ষত-বিক্ষত হন। আবার কৃষ্ণভাবিনী ভাবেন তাঁর ভাই-বোনেরাও হয়তো পূর্বের মতো দৌড়ে এসে তাঁর হাত ধরার সাহস পাবে না জাত যাওয়ার আশঙ্কায়— তাঁরা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের রক্তচক্ষুকে ভীষণ ভয় পায়। এছাড়া অন্যান্য আত্মীয়রা তাঁর এই বিদেশ যাত্রা এবং বেশভূষা দেখে হয়তো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করবেন। কৃষ্ণভাবিনী দাসী *ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা* গ্রন্থে তাঁর এই ভাবনাকে ব্যক্ত করতে গিয়ে লিখেছেন—

> ''বই হাতে করিয়া বসিয়া রহিলাম, মনে কত রকম চিন্তা আসিল; ভারতবর্ষ-জন্মস্থান-কলকাতা-আত্মীয়বন্ধু ইত্যাদি এক এক করিয়া ভাবিতে লাগিলাম। সকলকে যেখানে যে রকমভাবে দেখিয়া আসিয়াছি তাহারা প্রায় সেইখানে সেই রকম ভাবে আছে, কিন্তু এই চারিদিনে আমি কতদূরে আসিয়াছি এবং আমার আহারাদির কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মা দেখিলে হয়তো খ্রিস্টান হইয়াছি মনে করিয়া কাঁদিবেন, ভাইবোনেরা দেখিলে আর দৌড়িয়া আসিয়া 'দিদি' বলিয়া হাত ধরিতে সাহস করিবে না— পাছে 'জাত' যায়। অন্যান্য আত্মীয়েরা দেখিলে 'মেম সাহেব' বলিয়া ঠাট্টা করিবেন।''[৪৯]

এমনই ভয়ংকর ছিল সেকালের জাত-পাতের বালাই যে, নিকট আত্মীয়দেরও মানুষের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিতো।

উনিশ শতকে ব্রাহ্মরা যেহেতু হিন্দুদের পৌত্তলিকতা ও বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান বর্জন করে নিরাকার একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেহেতু সেকালে যাঁরা হিন্দু সমাজ থেকে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করতেন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ তাঁদের খ্রিস্টানদের মতোই বিধর্মী মনে করতো এবং তাঁদের জাত গেছে মনে করে অস্পৃশ্য, সমাজচ্যুত করে দিতো, আর তাঁদের পরিবারের ওপর নানারকম সামাজিক অত্যাচার চালাতো। যাঁরা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করতেন তাঁদের নিকট আত্মীয়, এমনকি তাঁদের পিতা-মাতারাও তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন না। কেননা সে সময় যাঁরা ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করতেন তাঁদের সঙ্গে যদি হিন্দু সমাজের কেউ যোগাযোগ রাখতেন তাহলে তাঁকে কখনো নানারকম অত্যাচার সহ্য করতে হতো, আবার কখনো সমাজচ্যুত করা হতো। সেজন্য সুদক্ষিণা সেন *জীবন স্মৃতি* গ্রন্থে জানিয়েছেন, ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের বহুদিন পরে যখন তাঁরা মামাবাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন তখন তাঁদের আগমন সংবাদ পেয়ে মামাবাড়ির মানুষরা বহুদিন পরে নিকট

আত্মীয়দের কাছে পাওয়ার আনন্দে আনন্দিত হলেও দিনের বেলায় সুদক্ষিণাদের বাড়িতে আনার সাহস পাননি তাঁরা রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের দ্বারা সমাজচ্যুত হওয়ার আশঙ্কায়। সুদক্ষিণা সেনের ভাষায়—

> ''দিবসে তাঁহারা আমাদিগকে বাড়িতে উঠাইতে সাহস পাইলেন না; অথচ তাঁহাদের স্নেহপ্রবণ প্রাণ আমাদিগকে বক্ষে ধরিবার জন্য আগ্রহে ব্যাকুল। সমাজ তাঁহাদিগকে অভিশাপ-অঙ্গুলি তুলিয়া নিষেধ করিতে ছিল।''[৫০]

তবে এথেকে আমরা বুঝতে পারি যে, সে সময় একদিকে সামাজিক বিধি-নিষেধগুলি সাধারণ মানুষের কাছে ক্রমে শিথিল হয়ে আসছিল এবং অন্যদিকে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ তাঁদের প্রাচীন অচলায়তনকে টিকিয়ে রাখার জন্য সামাজিক বিধি-নিষেধগুলিকে আরও কঠোর করে তুলেছিল। তাইতো আমরা দেখি কামিনী রায়ের স্বামী কেদারনাথ রায় যখন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন তখন তাঁর পরিবারের লোকেরা হিন্দু সমাজে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন এবং তাঁরা তাঁর ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণের ঘটনায় অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এ সময় কেদারনাথের প্রথম স্ত্রী সৌদামিনী দেবী শুধুমাত্র স্বামীর সঙ্গে চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ রাখতেন বলে তাঁকে অনেক সামাজিক লাঞ্ছনা ও অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল। এতটাই কঠোরতা লাভ করেছিল হিন্দু সমাজের বিধি-নিষেধ। আবার সেকালে যাঁরা হিন্দু সমাজের প্রচলিত রীতি-অনুষ্ঠানকে অগ্রাহ্য করতো তাঁদের একঘরে করে দেওয়া হতো। তাই চণ্ডীচরণ সেন পিতার মৃত্যুর পূর্বে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হওয়ায় তিনি হিন্দুধর্মের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী পিতার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করতে অস্বীকার করেছিলেন এবং ব্রাহ্মধর্ম মতে পিতার শ্রাদ্ধ করেছিলেন। ফলে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ তাঁকে সমাজচ্যুত করে একঘরে করে দিয়েছিল, এমনকি তাঁর বাড়ির দাস-দাসীরা পর্যন্ত তাঁকে বয়কট করেছিল— তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের জন্য সমাজচ্যুত হওয়ার ভয়ে। এভাবে হিন্দু সমাজের সঙ্গে তাঁর সবরকম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পিতা চণ্ডীচরণ সেনের এই একঘরে হওয়ার দুর্দশার কথা বলতে গিয়ে কামিনী রায় *শ্রাদ্ধিকী* গ্রন্থে লিখেছেন—

> ''১৮৭১ সনের ১৫ জানুয়ারি পিতামহদেবের মৃত্যু হয়। পিতামহাশয় স্বগ্রামে আসিয়া প্রচলিত রীতি অনুসারে শ্রাদ্ধাদি করিতে অস্বীকৃত হওয়াতে, আমার মাতৃদেবী শ্বশুরের মুখাগ্নি হইতে শ্রাদ্ধ পর্যন্ত সমস্তই করিলেন। পিতামহাশয় বরিশালে থাকিয়া হবিষ্যের নিয়ম মাত্র পালন করিয়া, ব্রাহ্মমতে শ্রাদ্ধ করিলেন

> এবং হিন্দুসমাজ কর্ত্তৃক বর্জিত হইলেন। এই সময়ে তাঁহাকে নানা প্রকার অত্যাচার ও উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছিল। হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার পাচক ও ভৃত্য তাঁহার চাকরি ছাড়িয়া চলিয়া যায়। কিছুদিন পর্যন্ত তিনি ধোপা ও নাপিত পর্যন্ত পান নাই।"[৫১]

আবার কামিনী রায়ের স্বামী কেদারনাথ রায়ও ব্রাহ্ম হওয়ার কারণে যখন হিন্দু রীতি মেনে পিতৃশ্রাদ্ধ করলেন না তখন তাঁর আত্মীয় স্বজনরা তাঁকে সমাজচ্যুত করে দিয়েছিলেন এবং তাঁর প্রথম স্ত্রী সৌদামিনীকে সেজন্য অনেক লাঞ্ছনা-অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল।

উনিশ শতকে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে জাতিভেদপ্রথা কঠোরভাবে মেনে চলতে হতো। জাতিভেদপ্রথা অনুসারে পূর্বজন্মের কর্মফল অনুযায়ী চারটি বর্ণের সৃষ্টি হয়েছে। যথা— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। এদের মধ্যে ব্রাহ্মণরা সকলের ওপরে থাকায় তারা যাবতীয় ক্ষমতা ও সুখ ভোগ করে, আর শূদ্রদের অবস্থান সকলের নিচে হওয়ায় তারা সকলের দাস হয়ে এবং অস্পৃশ্য হয়ে বেঁচে থাকে। জাতিভেদপ্রথা অনুযায়ী শূদ্ররা অস্পৃশ্য হওয়ায় তাদের উচ্চবর্ণের মানুষরা স্পর্শ করতো না। কেননা সামাজিক বিধান অনুযায়ী শূদ্রদের স্পর্শ করলে বা ছোঁয়া লাগলে উচ্চবর্ণের মানুষরাও অস্পৃশ্য হয়ে যাবে। দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর রচনা *চর্যাপদের* ১০ সংখ্যক পদে কাহ্নপাদ লিখেছেন, 'নগর বাহিরেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।' — ডোমনী অস্পৃশ্য হওয়ায় নগর থেকে দূরে কুঁড়ে ঘরে বাস করে, যাতে তার ছোঁয়া ব্রাহ্মণ তথা উচ্চবর্ণের মানুষদের না লাগে। অর্থাৎ দশম-দ্বাদশ শতাব্দীতেও এদেশের সমাজে যে জাতিভেদপ্রথার কঠোরতা ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই, আর তার রেশ উনিশ শতকেও এদেশের সমাজে যে অব্যাহত ছিল তার পরিচয় আমরা পাই প্রসন্নময়ী দেবীর *পূর্ব্বকথা*-য়। প্রসন্নময়ী দেবী জানিয়েছেন, তাঁর পিতা দুর্গাদাস চৌধুরীর মামিরা এই জাতিভেদপ্রথাকে কঠোরভাবে মেনে চলতেন। তাঁরা ঘর থেকে বাইরে বেরনোর আগে দাসীকে পাঠিয়ে দিয়ে শূদ্রদের সরিয়ে দিতেন, যাতে শূদ্রদের ছায়াও তাঁদের মাড়াতে না হয়। আবার সেকালে এদেশের সমাজে জাতিভেদপ্রথা অনুযায়ী শূদ্র ব্যতীত অন্য বর্ণের মানুষদের সঙ্গে ব্রাহ্মণেরা মেলামেশা করলেও অন্য বর্ণের মানুষদের হাতের অন্ন ব্রাহ্মণদের গ্রহণ করা নিষিদ্ধ ছিল, যদিও ব্রাহ্মণদের অন্ন সকলে গ্রহণ করতে পারতো। আর এক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের বিধান ছিল, যে নিম্নবর্ণের মানুষ উচ্চবর্ণের মানুষকে অন্ন ভোজন করাবে সে মহাপাপে পতিত হবে। ফলে একদিকে যেমন উচ্চবর্ণের মানুষরা নিম্নবর্ণের মানুষদের অন্ন গ্রহণ করতেন না,

অন্যদিকে তেমনি নিম্নবর্ণের মানুষরাও উচ্চবর্ণের মানুষদের অন্ন ভোজন করাতে সাহস পেতেন না। তাই সুদক্ষিণা সেন *জীবন স্মৃতি*-তে জানিয়েছেন, তিনি তাঁর প্রিয় দু'জন কায়স্থ বান্ধবী— শিবসুন্দরী ও হরকামিনের সঙ্গে খেলাধূলা করলেও তাঁদের বাড়ির লোকেরা তাঁকে খেতে দিতেন না তিনি ব্রাহ্মণের মেয়ে বলে। তিনি তাঁর কায়স্থ বান্ধবীদের বাড়িতে খেতে চাইলেও তাঁরা তাঁকে খেতে দিতেন না সেকালের জাতিভেদপ্রথার নিয়ম অনুযায়ী নিম্নবর্ণ তথা কায়স্থ হয়ে উঁচু বর্ণের ব্রাহ্মণকে ভোজন করানোর মতো মহাপাপের ভয়ে। একইভাবে সেকালে এদেশে বৈদ্যরা কায়স্থদের সঙ্গে মেলামেশা করলেও কায়স্থদের হাতে বৈদ্যদের অন্নগ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল— বৈদ্যরা কায়স্থদের তুলনায় উঁচু জাত বলে। তাই সুদক্ষিণা সেনের একজন কায়স্থ বন্ধুর কাকা তাঁর একজন বৈদ্য বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করলে রান্নার জন্য কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যা সুদক্ষিণা সেনকে ডেকেছিলেন। কেননা ব্রাহ্মণদের হাতে সকলে অন্ন গ্রহণ করতে পারতেন। তবে এক্ষেত্রে সুদক্ষিণা সেন সবকিছু রান্না করেননি, বেশিরভাগ খাবারই সেই কায়স্থ পরিবারের লোকেরাই তৈরি করেছিলেন এবং সুদক্ষিণাকে দিয়ে তাঁরা সেই বৈদ্য ভদ্রলোকের খাবার পরিবেশন করিয়েছিলেন। এর থেকে আমরা অনুমান করে নিতে পারি যে, উনিশ শতক থেকেই ধীরে ধীরে এই জাতিভেদপ্রথার কঠোরতা শিথিল হয়ে আসছিল। তাই রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের চাপে শুধু দেখানোর জন্য কায়স্থ পরিবারটি ব্রাহ্মণ কন্যা সুদক্ষিণা সেনকে দিয়ে নামমাত্র রান্না করিয়ে নিজেরাই অধিকাংশ রান্না করেছিলেন বৈদ্য ভদ্রলোকটিকে খাওয়ানোর জন্য—বিন্দুমাত্র মহাপাপের ভয় না করেই।

সেকালে যাঁরা খ্রিস্টান বা মুসলমানদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন বা একত্রে আহার করতেন হিন্দু রক্ষণশীল সমাজ তাঁদের বিধর্মীর মতোই ঘৃণার চোখে দেখতো এবং তাঁদের অস্পৃশ্য করে রাখতো। কৈলাসবাসিনী দেবীর *ডায়েরী*-তে আমরা দেখি, কৈলাসবাসিনীর স্বামী কিশোরীচাঁদ মিত্র ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে খ্রিস্টান সাহেবদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন বলে কৈলাসবাসিনী খুব ভয় পেতেন— এই আশঙ্কায় যে, খ্রিস্টানদের সঙ্গে তাঁর স্বামীর মেলামেশার জন্য হিন্দু রক্ষণশীল সমাজ তাঁদেরও না অস্পৃশ্য করে রাখে। সেজন্য কৈলাসবাসিনী হিন্দুধর্মের বাহ্যিক আচার-আচরণ মন থেকে না মানলেও বাইরে শুধুমাত্র দেখানোর জন্য সেসব আচার-অনুষ্ঠান বেশি করে পালন করতেন। কেননা তিনি যদি হিন্দুধর্মের আচার-আচরণ পালন না করেন তাহলে তাঁর স্বামী আর হিন্দু ধর্মে আস্থা রাখবেন না। ফলে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ তাঁদের অস্পৃশ্য করে রাখবে এবং সেজন্য এজন্মের মতো কৈলাসবাসিনীর সঙ্গে তাঁর হিন্দু আত্মীয়দের বিচ্ছেদ ঘটে যাবে। কৈলাসবাসিনী দেবী তাঁর

এই হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান পালন প্রসঙ্গে বলেছেন—

> ''আমি হিন্দুআনি করি বলে আর কোন গোল নাই। আমার স্বামি জা ইচ্ছা তাই করুণ তাতে কোন কথা নাই। বাঙ্গালিদের এই ধর্ম্ম, এইজন্য জাদের বুদ্ধি আছে তারা বাঙ্গালি ধর্ম্ম মানে না। আমি তো মানিনে। কিন্তু এ কথা আমার স্বামিকে কখন বলিনে। বাবু জদি এই কথা আমার মুখে শুনিতেন তা হলে কতো সুকি হতেন তাহা আমি বলিতে পারিনে।''[৫২]

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, সেকালের সমাজে ধর্মীয় অস্পৃশ্যতার কঠোরতা থাকলেও এবং কৈলাসবাসিনীর মতো অনেকেই বাইরে তা মেনে চললেও অন্তর থেকে তা মেনে নিতে পারেননি।

উনিশ শতকে হিন্দু সমাজের আচার-আচরণ, বিধি-বিধানের কঠোরতা তথা সংকীর্ণতার পরিবর্তনের জন্যে নানারকম সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ফলে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ তাদের আচার-আচরণ, বিধি-বিধানকে টিকিয়ে রাখার জন্য আরও কঠোর হয়েছিল। সেজন্য সেসময় যাঁরাই হিন্দু ধর্মের বিরোধিতা করতেন বা হিন্দু সমাজের প্রচলিত রীতি-নীতিকে অমান্য করতেন তাঁদেরই সমাজচ্যুত করা হতো, একঘরে করা হতো— যাতে আর কেউ এরকম হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করতে না পারে। তবে আমরা যদি একটু গভীরভাবে ভাবি তাহলে দেখব রক্ষণশীল সমাজের এই সমাজচ্যুত, একঘরে করার মূল উদ্দেশ্য ছিল রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা। কেননা এসময় অনেকেই পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে হিন্দুধর্মের বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান, কুসংস্কার ইত্যাদির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধাচরণ শুরু করেছিলেন। আর হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধাচরণের জন্য যদি সকলকে সমাজচ্যুত, জাতিচ্যুত করা হয় তাহলে তো হিন্দু সমাজ সংখ্যালঘু হয়ে কোণঠাসা হয়ে যাবে। সেজন্য সেসময় হিন্দু সমাজ জাতিচ্যুত-সমাজচ্যুত করার পাশাপাশি পুনরায় জাতিচ্যুত- সমাজচ্যুতদের হিন্দু সমাজে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রায়শ্চিত্তের মতো ব্যবস্থাও করেছিল। প্রসন্নময়ী দেবী *পূর্ব্বকথা*-য় জানিয়েছেন, তাঁর বড় ভাই আশুতোষ সেকালের সামাজিক বিধানকে অগ্রাহ্য করে সমুদ্র পার করে বিদেশে গেলে রক্ষণশীল সমাজ তাঁদের পরিবারকে সমাজচ্যুত করেছিল এবং এই সামাজিক দণ্ড থেকে আশুতোষের বাড়িতে আশ্রিত তাঁর বিধবা পিসিরাও মুক্তি পাননি। তখন আশুতোষ ও প্রসন্নময়ীর পিসিরা পাঁচ কাহন কড়ি সহ মস্তক মুণ্ডন করে প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন এবং এই প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা তাঁরা পুনরায় হিন্দু সমাজে স্থান পেয়েছিলেন। আবার কামিনী রায়ের স্বামী কেদারনাথ রায় হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলে রক্ষণশীল হিন্দু

সমাজ তাঁকে সমাজচ্যুত করেছিল। সেজন্য কেদারনাথের পিতা কেদারনাথকে প্রায়শ্চিত্ত করে পুনরায় হিন্দু সমাজে ফিরে আসার অনুরোধ করেছিলেন। কামিনী রায় *শ্রাদ্ধিকী*-তে লিখেছেন—

> ''তাঁহার পিতা সংবাদ পাইয়াই কলিকাতায় আসিয়া তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া হিন্দু হইতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু বিফলচেষ্টা হইয়া ভগ্নহৃদয়ে কাশীতে ফিরিয়া গিয়া, অনতিকাল পরেই ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।''[৫৩]

কেদারনাথের পিতার মৃত্যুর পর কেদারনাথের কাকা শ্রীনাথ রায়ও চেয়েছিলেন প্রায়শ্চিত্তের মধ্য দিয়ে কেদারনাথকে হিন্দু সমাজে ফিরিয়ে আনতে। সেই অনুযায়ী শ্রীনাথ রায় প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও করেছিলেন। কেননা তিনি চেয়েছিলেন কেদারনাথের দ্বারাই তাঁর পিতার হিন্দু মতে শ্রাদ্ধ করাতে। কিন্তু কেদারনাথ তাঁর সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন বলেই প্রায়শ্চিত্ত না করে তিনি পিতার শ্রাদ্ধের আগেই বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। এরকমই ছিল সেকালের রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা। এই প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থার দ্বারা অনেকে হিন্দু সমাজে ফিরে আসতেন, আবার অনেকে স্বেচ্ছায় হিন্দু সমাজ ত্যাগ করায় প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইতেন না।

উনিশ শতকে এদেশের সমাজে নারীর অবস্থান, হিন্দু সমাজের প্রচলিত বিভিন্ন রীতি-নীতি, ব্রাহ্মসমাজ ও হিন্দু সমাজের দ্বন্দ্ব প্রভৃতি সামাজিক প্রসঙ্গগুলি যেভাবে বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে তার পরিচয় আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলিতেও লেখিকারা জীবনের কাহিনি বর্ণনা প্রসঙ্গে বিচ্ছিন্নভাবে তুলে ধরেছেন। আর আত্মকথাগুলিতে বর্ণিত বিচ্ছিন্ন সামাজিক প্রসঙ্গগুলি থেকে সেকালের সমাজ জীবনের একটা সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায়। তবে সেকালের একটা অন্যতম প্রথা *সতীদাহপ্রথা*-র কোন পরিচয় আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলিতে নেই। কেননা রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর সতীদাহপ্রথা নিষিদ্ধ করলে ধীরে ধীরে এই পৈশাচিক প্রথা লোপ পেতে থাকে। এছাড়া আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলির প্রায় সকল লেখিকাই বাড়ির বাইরে তেমন না যাওয়ায় বাইরের জগৎ সম্পর্কে তাঁদের সেরকম সম্যক ধারণা ছিল না— নিজেদের জীবন অভিজ্ঞতা এবং পরিবার-পরিজনদের সূত্রে যেটুকু অভিজ্ঞতা তাঁরা সঞ্চয় করেছিলেন, তা দিয়েই তাঁরা নিজেদের জীবনের কথা লিখে গেছেন। তাই হয়তো তাঁদের সঙ্গে পরিচিত এমন কেউ সতীদাহপ্রথার মতো পৈশাচিক প্রথার শিকার হননি বলেই তাঁরা যখন আত্মকথা লিখেছেন তখন সে বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, ইতিহাসে কখনো সাধারণ মানুষের কথা সেভাবে উল্লেখ করা হয় না— বিশেষত নারীর কথা।

তাই কোনো যুগেরই নারীদের সামগ্রিক জীবন যাত্রার পরিচয় আমরা পাই না। সেদিক থেকে আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলির গুরুত্ব স্বীকার করতেই হয়। এছাড়া উনিশ শতকের এদেশের সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন রীতি-নীতি, প্রসঙ্গের পরিচয় আমরা বিভিন্ন গ্রন্থে পেলেও সেইসব রীতি-নীতির প্রতিক্রিয়ায় নারীদের মানসিক অবস্থার কোনো পরিচয় আমরা পাই না। কেননা সেইসব গ্রন্থে পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গিতে নারীকে দেখানো হয়েছে। আর উনিশ শতকে এদেশে নানা প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে যখন ধীরে ধীরে নারী শিক্ষার সূচনা হলো তখন কয়েকজন নারী শিক্ষিতা হয়ে যখন নিজেদের জীবনের কথা লিখলেন তখন নারীদের জীবনের নানা অজানা কথা উঠে এল তাঁদের রচনায়। আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলিতে লেখিকারা যখন নিজেদের জীবন অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন তখন স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের রচনায় সেকালের সমাজ জীবনের বিশেষত নারী জীবনের নানা অজানা কথা উঠে এসেছে। এদিক থেকে আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলি সেকালের পূর্ণাঙ্গ সমাজ জীবনের বিশ্বস্ত দলিল হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র:

১. ঘোষ বিনয় : বাংলার নবজাগৃতি, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ: বৈশাখ ১৪২৩, পৃ. ১৫৮, ১৫৯।

২. চক্রবর্তী সুবোধ (সম্পাদনা) : বিদ্যাসাগর রচনাবলী (অখণ্ড সংস্করণ), কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ: চৈত্র ১৪১৬, পৃ. ৫৫৫

৩. প্রাগুক্ত : পৃ. ৫৫৫।

৪. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৮৫।

৫. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, পঞ্চম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ১১১।

৬. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৩০৪।

৭. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৯০।

৮. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৯৩, ৯৪।

৯. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৫১।

১০. ভাদুড়ী তন্দ্রিতা : পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় : পুরুষের স্বৈরতান্ত্রিক বিশ্লেষণে নারী, রিডার্স সার্ভিস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ২৬ জানুয়ারি ২০০৫, পৃ. ৬২।

১১. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ২৪৭।

১২. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, তৃতীয় খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৭৪, ৭৫।

১৩. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৯০।

১৪. চক্রবর্তী সম্বুদ্ধ : অন্দরে অন্তরে : উনিশ শতকে বাঙালি ভদ্রমহিলা, স্ত্রী, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ: ২০১০, পৃ. ৪।

১৫. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ২৮৪।

১৬. প্রাগুক্ত : পৃ. ২১৬।

১৭. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, তৃতীয় খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৫৫।

১৮. বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ (সঙ্কলিত ও সম্পাদিত) : সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ: পৌষ ১৪০১, পৃ. ২৪২।

১৯. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, তৃতীয় খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৭ পৃ. ৬৬।

২০. প্রাগুক্ত : পৃ. ৫৪।

২১. বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ (সঙ্কলিত ও সম্পাদিত) : সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ: পৌষ ১৪০১, পৃ. ২৪৭।

২২. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগহ, তৃতীয় খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৮১।

২৩. প্রাগুক্ত : পৃ. ৯৫

২৪. দেব চিত্রা : অন্তঃপুরের আত্মকথা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা:লি:, কলকাতা, অষ্টম মুদ্রণ: অক্টোবর ২০১৪, পৃ. ৩৪, ৩৫।

২৫. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, তৃতীয় খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৫৪।

২৬. বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ (সঙ্কলিত ও সম্পাদিত) : সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ: পৌষ ১৪০১, পৃ. ২৪২।

২৭. বসু স্বপন : বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ: আগস্ট ২০১৬, পৃ. ১৩৯।

২৮. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ২১২।

২৯. প্রাগুক্ত : পৃ. ২৪৯।

৩০. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, চতুর্থ খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৬৩।

৩১. রায় অলোক (সম্পাদনা) : প্যারীচাঁদ মিত্র রচনাবলী, সোপান, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ: ২০১৮, পৃ. ১৪০।

৩২. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১০১।

৩৩. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ২০১।

৩৪. প্রাগুক্ত : পৃ. ২২৫

৩৫. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৭২

৩৬. ঘোষ ড. বারিদবরণ : ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, জিজ্ঞাসা এজেন্সিজ লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ২৫ জানুয়ারি ১৯৯০, পৃ. ৮০।

৩৭. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১৮১।

৩৮. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, চতুর্থ খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ১৯১।

৩৯. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭৫।

৪০. প্রাগুক্ত : পৃ. ৯২।

৪১. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগহ, তৃতীয় খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ১২০।

৪২. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, চতুর্থ খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ১৫০।

৪৩. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১৭৯, ১৮০।

৪৪. বসু স্বপন : বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ: আগস্ট ২০১৬, পৃ. ১৫১।

৪৫. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, চতুর্থ খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ১৫২, ১৫৩।

৪৬. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৫৩

৪৭. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৩১

৪৮. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ২৫০, ২৫১।

৪৯. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ২৫।

৫০. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, চতুর্থ খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ১০০।

৫১. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, তৃতীয় খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ১২৩।

৫২. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ২০২।

৫৩. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, তৃতীয় খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ১৫৯।

পঞ্চম অধ্যায়

নারীর আত্মকথায় উনিশ শতক : নারীবাদী ভাবনা

অষ্টাদশ শতকের শেষে বিশেষত উনিশ শতকে নারীর ব্যক্তিসত্তার জাগরণ এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন নারী আন্দোলনের মাধ্যমে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে যে নারীবাদের (Feminism) সূচনা হয়েছিল, তা বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে— নারীর প্রতি সমাজের লিঙ্গবৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তুলে। এককথায় নারীবাদ বলতে বোঝায়, নারীর ব্যক্তিসত্তার জাগরণ এবং লিঙ্গসমতার ভিত্তিতে নারী অধিকার তথা নারীমুক্তির প্রতিষ্ঠা— এ অর্থে আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলি নারীবাদী ভাবনাসমৃদ্ধ নয়। আমরা জানি, বাংলা সাহিত্যে লেখিকাদের রচনায় নারীবাদী বক্তব্য প্রকাশ পেতে শুরু করে বিশ শতকে। তবে উনিশ শতকে এদেশে নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে যখন স্ত্রীশিক্ষা মোটামুটিভাবে সমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছিল তখন স্বল্পসংখ্যক নারী লেখাপড়া শিখে সাহিত্য রচনা করেছিলেন— বিশেষ করে তাঁরা যখন নিজেদের জীবনকথাকে আত্মকথায় তুলে ধরেছিলেন তখন তাঁদের লেখায় আপন অধিকার আদায়ের ভাবনা প্রকটভাবে প্রকাশিত না হলেও প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে গোলাম মুরশিদ মন্তব্য করেছেন—

> ''স্ত্রী স্বাধীনতা ঠিক কী বস্তু— এ সম্পর্কে গত শতাব্দীর মহিলাদের ধারণা সুস্পষ্ট চেহারা নিতে পারেনি। তাঁরা কী করার স্বাধীনতা চান, অথবা কিসের হাত থেকে স্বাধীনতা চান— এ বিষয়ে তাঁরা নিজেরাই খুব নিশ্চিত ছিলেন বলে মনে হয় না। তবে তা সত্ত্বেও, উনিশ শতকের শেষে এসে বাঙালি মহিলারা স্বাধীনতা বললে কিছু একটা বুঝতেন— লেখাপড়ার অধিকার, সীমিত অবরোধ, বিয়ের ব্যাপারে খানিকটা নিজেদের মতামত দেবার অধিকার, সংসার পরিচালনায় বর্ধিত অধিকার ইত্যাদি হয়তো এসবের মধ্যে ছিলো।''[১]

নারীবাদের উদ্দেশ্য হল নারীর অধিকারহীনতা, শোষণ, বঞ্চনা ইত্যাদির কারণ অনুসন্ধান এবং এসবের অবসান ঘটিয়ে নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা। আমরা জানি, আদিম সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থায় নারীর স্থান ছিল সবচেয়ে ওপরে এবং এসময় নারীদের আধিপত্য ছিল। কেননা আদিম সাম্যবাদী সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক সমাজ। পরবর্তীকালে মানুষ যখন কৃষিকাজ শুরু করল

তখন পুরুষদের হাতে সম্পত্তি আসায় পুরুষরা তাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল। মূলত পুরুষদের এই সম্পত্তির উত্তরাধিকারীর প্রয়োজনীয়তা থেকেই মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ভেঙে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং বিবাহ প্রথার প্রচলন হয়েছিল— যাতে পুরুষদের পক্ষে উত্তরাধিকারী চিহ্নিত করতে অসুবিধে না হয়। তবে এই বিবাহে পুরুষদের বহুবিবাহ প্রচলিত থাকলেও নারীদের ক্ষেত্রে একাবারমাত্র বিবাহের বিধান ছিল। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নারীদের প্রাধান্য লোপ পেয়ে পুরুষদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হল এবং নারীরা সমাজে অবহেলিত, শোষিত, নির্যাতিত হতে থাকল। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় জীবিকার্জনের দায়িত্ব পুরুষরা নিজেদের হাতে নিয়ে নিয়েছিল এবং নারীদের নিক্ষেপ করেছিল সাংসারিক কাজকর্মের মধ্যে তথা অন্দরমহলে। এভাবে নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে খর্ব করা হয়েছিল। এমনকি পিতৃতান্ত্রিক সমাজ সম্পত্তির অধিকার থেকেও নারীদের বঞ্চিত করেছিল শাস্ত্রীয় বিধানের দোহাই দিয়ে। এভাবে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীরা পূর্বের সমস্ত অধিকার হারিয়ে পুরুষদের দাসী, ভোগের সামগ্রী ও সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হয়ে উঠেছিল। আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলিতে নারীদের অধিকারহীনতা-বঞ্চনা-শোষণের এই তাত্ত্বিক দিক উঠে আসেনি। তবে এদেশের পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীদের অধিকারহীনতা-শোষণ-বঞ্চনা প্রভৃতির মূলে যে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের সৃষ্ট কতগুলি বিধি-বিধান এবং কুপ্রথা ছিল, তা আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলিতে লেখিকারা শুধু তুলেই ধরেননি, কখনো কখনো সেগুলিকে সমালোচনা ও ব্যঙ্গ করেছেন। আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলির লেখিকারা পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীদের অধীনতা-শোষণ- বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে নারী-পুরুষের সাম্য বা সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার সাহস দেখাতে না পারলেও পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর অধিকারহীনতা-শোষণ-বঞ্চনা এবং সেগুলির কারণ তুলে ধরে কিছুটা হলেও নারীবাদী ভবনার সূত্রপাত ঘটিয়েছেন উনিশ শতকেই। এছাড়া অনেক লেখিকা তাঁদের রচনায় নারীদের শিক্ষার অধিকার, জীবিকা নির্বাচনের অধিকার, অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে আসার অধিকারকেও তুলে ধরেছেন। আর আমরা জানি, সমাজে নারীরা যে শোষণের শিকার একথাটাই বলতে চায় নারীবাদ। তবে আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলিতে যে নারীবাদী ভাবনার আভাস-ইঙ্গিতের কথা আমরা বললাম, তা অনেকের পক্ষেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। কেননা আমরা আজও কলোনিয়াল হ্যাঙ্গওভার থেকে বেরোতে পারিনি— সেজন্য উনিশ শতকে যখন পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে নারীবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল তখন আমাদের দেশের লেখিকারাও যে তাঁদের লেখায় নারীবাদী

ভাবনার আভাস-ইঙ্গিতকে তুলে ধরতে পারেন, তা বিশ্বাস করা অনেকের পক্ষেই অসম্ভব। আসলে একদিনে কোনো মতবাদ তথা কোনোকিছুই সৃষ্টি হয় না— সকল ক্ষেত্রেই প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের পূর্বে সলতে পাকানোর একটা ইতিহাস অর্থাৎ পূর্ব প্রেক্ষাপট থাকে। তেমনি নারীবাদও একদিনে তৈরি হয়নি। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীরা দীর্ঘদিন অবহেলিত, বঞ্চিত থাকার পর ধীরে ধীরে একসময় নারীরা শুধু নিজেদের পরাধীন জীবনের জন্যে আক্ষেপ করেই ক্ষান্ত থাকেননি, পিতৃতান্ত্রিক সমাজের অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও করেছেন, আবার কখনো কখনো নিজেদের অধিকারও বুঝে নিতে চেয়েছেন। এই অধ্যায়ে আমরা নারীবাদকে নয়, বরং নারীবাদ সৃষ্টির পূর্ব প্রেক্ষাপট হিসেবে আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলিতে যে নারীবাদী ভাবনার আভাস-ইঙ্গিত রয়েছে— মূলত সেদিকটিরই অন্বেষণ করেছি।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী পাওয়ার জন্য পুত্রসন্তান কামনা করে। আর পুরুষের এই পুত্রসন্তানের আকাঙ্ক্ষাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে মনুর বিধান। কেননা *মনুসংহিতা* অনুযায়ী পুত্র *পুৎ* নামক নরক থেকে পিতাকে উদ্ধার করায় পিতার আত্মার মুক্তি ঘটে। কিন্তু কোনো পুরুষের যদি পুত্রসন্তান না হয় তাহলে তার *পুৎ* নামক নরক থেকে পরিত্রাণ ঘটবে না। কাজেই মনু বিধান দিয়েছেন কোনো পুরুষের যদি শুধু কন্যাসন্তানই হয় তাহলে সে এগারো বছর অপেক্ষা করে পুত্রসন্তান কামনায় পুনরায় বিয়ে করতে পারে। ফলে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, আর কন্যা অবহেলিত হয়; লাঞ্ছিত হয়। কৈলাসবাসিনী দেবী *ডায়েরী* গ্রন্থে বলেছেন—তাঁর প্রথম পুত্রের মৃত্যুর পর যখন একটি কন্যাসন্তান হয় তখন পরিবারের সকলে খুশি হলেও তাঁর শাশুড়ি খুশি হতে পারেননি। আসলে সে সময় এদেশের অধিকাংশ মানুষই কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণে খুশি হতেন না— তাঁরা কন্যাসন্তান চাইতেন না। তবে কৈলাসবাসিনীর স্বামী কিশোরীচাঁদ সেকালের তুলনায় অনেকটাই প্রগতিশীল ছিলেন বলে কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করায় তিনি খুশিই হয়েছিলেন এবং তিনি স্ত্রী কৈলাসবাসিনীকে বলেছিলেন পুত্র ও কন্যা সকলেই সমান। কৈলাসবাসিনীর ভাষায়—

> ‘‘১২৫৪ সালে বৈসাক মাসের ৭ তারিখে মঙ্গলবার আমার একটি কন্যা সন্তান হলো ১১ ঘন্টার সময়। তাহাতে শকলে বলেন জা হইয়াচে তাই ভাল। ছেলে মানুসের কতো হবে। কিন্তু আমার শাসুড়ি ঠাকুরানি বড় দুঃখিত হলেন। বলেন জে সোনা হারিয়ে কাঁচ পাইলাম। আমার স্বামি বড় আহ্লাদিত হইলেন। চিটি

নিকিলেন তোমার একটি কন্যা হইয়াচে সুনে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি তাহা বর্ণনা জায় না। শ্রীশ্রীজগদিশ্বরের ইচ্ছাতে তুমি ভালো য়াছ ও আমার কন্যাটি ভালো আচে শুনে আমি পরম আহ্লাদিত হইলাম। তুমি মনে কিচু দুঃখিত হও না। শ্রীশ্রীজগতপতির কাচে সব সমান। আমাদের কাচে সব সমান ভাবা উচিত।"[২]

তবে কৈলাসবাসিনীর স্বামী উনিশ শতকেই প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় দিলেও এই একবিংশ শতকেও এদেশের অনেকে পিতৃতান্ত্রিক সংকীর্ণ মনোভাব থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। তাইতো কন্যাভ্রূণ হত্যা বন্ধ করার জন্য সরকারকে গর্ভস্থ শিশুর লিঙ্গ নির্ধারণ আইন করে বন্ধ করে দিতে হয়। সেকালে পুত্রসন্তানের চাহিদা এত বেশি ছিল যে, কোনো পুরুষের যদি প্রচুর ধনসম্পত্তি থাকতো এবং সেই পুরুষ যদি অপুত্রক হতো তাহলে সেই পুরুষটি একটি পুত্রসন্তান দত্তক হিসেবে গ্রহণ করতো। এ প্রসঙ্গে নিস্তারিণী দেবী *সেকেলে কথা*-য় জানিয়েছেন, সেকালে যাদের বিষয়-সম্পত্তি প্রচুর ছিল অথচ পুত্রসন্তান ছিল না এবং তারা যদি পুত্রসন্তান কামনায় একাধিক বিয়ে করেও পুত্রসন্তানের মুখ দেখতে না পায় তাহলে তারা মৃত্যুর পরে পুত্রের পিণ্ডদানের মধ্য দিয়ে মুক্তি প্রত্যাশায় যাদের ঘরে অনেক পুত্র থাকতো তাদের ঘরের পুত্রকে নিজের পুত্র হিসেবে গ্রহণ করতো 'ভিক্ষাপুত্র প্রথা'র মধ্য দিয়ে। আবার অনেকে পুত্রসন্তান না থাকায় কন্যার বিয়ে দিয়ে জামাইকে ঘরে রেখে পুত্রের চাহিদা পূরণ করতো। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের কাছেই পুত্রসন্তানই ছিল অধিক প্রিয়। কন্যাসন্তানকে বিবাহ প্রথার নিয়ম অনুসারে পরের ঘরে পাঠাতে হয় ও পুত্রসন্তানই শুধু নিজেদের কাছে থাকে এবং বৃদ্ধবয়সে এই পুত্রসন্তানই তাদের অর্থনৈতিক অবলম্বন হবে— এই ভাবনায় হয়তো সেকালের অনেক নারীও পুত্রসন্তানের জন্ম কামনা করতো। তাই আমরা দেখি সেকালে অনেকেই কন্যাসন্তান থাকলেও পুত্রসন্তান কামনায় দেবতার কাছে মানত করতো। শরৎকুমারী দেব *আমার সংসার* গ্রন্থে জানিয়েছেন, তাঁর স্বামী সত্যপ্রিয় দেব পিতা-মাতার আদরের সন্তান ছিলেন। কেননা সত্যপ্রিয়ের জন্মের পূর্বে তাঁর পিতা-মাতার ছ'টি কন্যাসন্তান ও দুটি পুত্রসন্তান হলেও পুত্রসন্তান দুটি আঁতুড় ঘরেই মারা যায়। আর পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুত্রসন্তানের মূল্য বেশি হওয়ায় সত্যপ্রিয়ের মা ছ'টি কন্যাসন্তান থাকার পরেও দেবতার কাছে মানত ও পূজাপাঠ করেছিলেন পুত্রসন্তান কামনায়। পরে অপরিণত বয়সে, সাতমাসে সত্যপ্রিয়ের জন্ম হলে তাঁর চোখ দুটি প্রস্ফুটিত না হলে সত্যপ্রিয়ের মা নিতান্তই দুঃখিত হয়েছিলেন—

> ''কন্যা ব্যতীত আর একটিও পুত্রসন্তান না থাকায় মাতা ঠাকুরানি অনেক দেবতার দোরে মাথা কুটিয়া, অনেক যাগযজ্ঞ, হোম পর্যন্ত করিয়াও পুত্রমুখ দর্শন করিতে পারেন নাই। যদিও বা আবার এই পুত্রটি জন্মিল তাও অন্ধ। মাতা মনে মনে নিতান্ত দুঃখিত হইলেন।''[৩]

তবে পরবর্তীকালে পিতা-মাতার আদর-যত্নে সত্যপ্রিয়ের জীবন রক্ষা পেয়েছিল।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুত্রসন্তানের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই কন্যাসন্তানের প্রতি অবহেলা বৃদ্ধি পায়। মানকুমারী বসু *আমার অতীত জীবন*-এ বলেছেন, তাঁর জন্মের চার বছর পূর্বে তাঁর একজন দিদি বসন্ত রোগে মারা গেলে তাঁর মা কন্যা শোকে শোকাকুলা হয়েছিলেন তখন তাঁর দিদিমা এবং দুই মাসিমা দেবতার কাছে মানত করেছিলেন যাতে মানকুমারীর মায়ের পুনরায় আরেকটি কন্যাসন্তান হয়। পরে যখন মানকুমারীর জন্ম হয়েছিল তখন আত্মীয়-স্বজনেরা কন্যাসন্তান হওয়ায় খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন। মানকুমারীর ভাষায়—

> ''১২৬১ (মতান্তর ১২৭১) সালে ১৩ মাঘ রাত্রিকালে, ইংরেজি ১৮৬৩ সনের ২৩ জানুয়ারি, মাতুলালয় শ্রীধরপুরে এ অভাগিনীর জন্ম হয়। দেবতার কৃপায় সেই মৃত কন্যা আবার আসিয়াছে, এই বিবেচনায় আত্মীয়গণ যারপরনাই আনন্দিত হইলেন এবং 'যথোচিতের ওপরে'ও আমার আদর যত্ন হইতে লাগিল। বাঙালির মেয়ের অদৃষ্টে ইহা ক্বচিৎ ঘটিয়া থাকে।''[৪]

মানকুমারী বসু এখানে বলেছেন যে, তিনি কন্যাসন্তান হয়েও যে আদর-যত্ন পেয়েছেন, তা সেকালের খুব স্বল্পসংখ্যক বাঙালি মেয়ের ভাগ্যেই জুটতো। অর্থাৎ এ থেকে অমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, পিতৃতান্ত্রিক সমাজে সকলে পুত্রসন্তান কামনা করতো বলে কন্যাসন্তানের ক্ষেত্রে অবহেলা অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। এমনকি কখনো কখনো কন্যাসন্তান জন্মদানের জন্য কন্যার মাকেও অপমান-অবহেলা সহ্য করতে হতো। সেরকম পরিবেশে ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল। কিন্তু ব্যতিক্রম কখনো বাস্তব ঘটনা ও পরিবেশের উদাহরণ হতে পারে না। তাই পিতৃতান্ত্রিক সমাজে কন্যাসন্তানকে ছেলেবেলা থেকেই পিতৃগৃহে নানা অনাদর-অবহেলার মধ্য দিয়ে বড় হতে হয়। আমোদিনী দাশগুপ্ত *আমার জীবন-কাহিনি* গ্রন্থে বাল্যকালে পিতৃগৃহে তাঁর অনাদর-অবহেলার প্রসঙ্গে বলেছেন—

> ''আমার জন্মের পর ক্রমে আমার তিনটি ভ্রাতা জন্মে। অন্যান্য ভ্রাতা-ভগিনীদের সহিত আমিও প্রতিপালিত ও বর্ধিত হইতে লাগিলাম, কিন্তু সেই বাল্যকালেই

> বেশ বুঝিতাম যে মা তাঁহার অন্য সন্তানদের যে প্রকার স্নেহ যত্নে প্রতিপালন করিতেন আমাকে সেরূপ করিতেন না। আমি আপনার মনে আপনি আমোদ করিয়া খেলিয়া বেড়াইতাম। এ রূপে অভাগিনীর বাল্যজীবন অতিবাহিত হইল।"[৫]

অর্থাৎ কন্যাসন্তান হওয়ায় আমোদিনী দাশগুপ্ত পিতৃগৃহে (মাতুলালয়ে) মায়ের অনাদর-অবহেলায় বড়ো হয়েছেন। আবার আমোদিনীর মা কন্যাপণের বেশি টাকার লোভে আমোদিনীকে এগারো বছর বয়সে বিয়ে দিয়েছিলেন তেতাল্লিশ বছরের এক বিপত্নীক চতুর্থ পক্ষের পাত্রের সঙ্গে— আমোদিনীর ভবিষ্যতের কথা না ভেবেই। বিয়ের পর আমোদিনী পিতৃগৃহে গিয়ে বালিকাসুলভ স্বভাবে একটি আম দেখে সেটি খেতে চাইলেও তাঁর মা তাঁকে সেই আমটি খেতে দেননি— তাঁর ছোট ভাই আমটি খাবে বলে। এভাবে নিতান্ত বাল্যকালেই আমোদিনী বুঝতে পেরেছিলেন যে, পিতৃতান্ত্রিক সমাজে কন্যাসন্তানের তুলনায় পুত্রসন্তানের মূল্য বেশি। বিয়ের পর শ্বশুবাড়িতে গিয়ে আমোদিনীর অবহেলা-মানসিক যন্ত্রণা আরো বৃদ্ধি পায়। আমোদিনীর শ্বশুরবাড়িতে শাশুড়ি থাকলেও তিনি সংসারের কিছু দেখতেন না, তবে আমোদিনীর ছোট জা আমোদিনীর ওপর কর্তৃত্ব করতেন, আমোদিনীর ওপর মানসিক নির্যাতন চালাতেন। সংসারের সমস্ত কাজ করেও আমোদিনীর কপালে জুটতো ডালভাত, নয়তো শুধু ভাত— তাও আবার প্রতিদিন নয়। আমোদিনী কোন কোন দিন আবার একবেলা খাবার পেতেন। এসময় একমাত্র বিধবা জা ছাড়া শ্বশুরবাড়ির সকলে, এমনকি বাড়ির চাকরাণীও তাঁকে অবহেলা করতো। সেই অনাদর-অবহেলার কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—

> ''ইহাদের অত্যাচারে মাসের মধ্যে দশদিন আমার অন্ন জুটিত না। পনেরো দিন একবেলা জুটিত। তখন সেই বিধবা জা আমাকে খাওয়াইবার চেষ্টা করিত। ঘরে ভালো খাদ্যবস্তু আসিলে আমি তাহা পাইতাম না। যদি কখনও কাহারও পাত্রে অবশিষ্ট কিছু থাকিত তবে তাহাই আমার ভাগ্যে জুটিত। নচেৎ ডাইল ভাত কী শুধু ভাতই আমার নিয়মিত খাদ্য ছিল। আমার এমনই কপালের লিখা যে মধ্যম দেবর দু'জন ঝি আনিয়া একজনকে বাড়ি রাখিয়া যান। সেও আমার প্রতি অত্যাচার করিতে থাকে। আমি যেন তাহার অপেক্ষাও নিকৃষ্ট এবং তাহারও অধীন।"[৬]

পরবর্তীকালে আমোদিনী শ্বশুরবাড়ি থেকে স্বামীর সঙ্গে আগরতলা গেলে তাঁর বঞ্চনা কিছুটা লাঘব হয়েছিল। তবে সেখানে গিয়েও স্বামীর সঙ্গে তাঁর সাময়িক ভালোবাসার সম্পর্ক হলেও স্বামীর

প্রকৃত ভালোবাসা তিনি পাননি। আগরতলায় স্বামীর সংসারে তিনি একা ছিলেন না, সঙ্গে থাকতো কখনো সতীনের বড় ছেলে, কখনো মামাশ্বশুরের ছেলে, কখনো বিধবা জায়ের মধ্যম পুত্র, কখনো শাশুড়ি, আবার কখনো তাঁর স্বামীর কাছে সংস্কৃত পড়তে আসা ছাত্র। অর্থাৎ আমোদিনীর নতুন সংসারে লোকসংখ্যা কম ছিল না। পরবর্তীকালে আমোদিনীর সন্তান হলেও সন্তান পালন এবং সংসারের সমস্ত কাজকর্ম তাঁকে একাহাতে করতে হতো। এমনকি শরীর খারাপ হলেও সাংসারিক কাজ-কর্ম থেকে তাঁর অব্যাহতি ছিল না এবং এসময় শরীর খারাপ নিয়ে সাংসারিক কাজ করতে গিয়ে সামান্য ত্রুটি হলেও তাঁর স্বামী রাগারাগি করতেন। আমোদিনীর সংসারে থাকা তাঁর দেওরের পুত্ররাও কারণে-অকারণে তাঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতো। আমোদিনীর শাশুড়ি যখন আমোদিনীর সংসারে আসতেন তখন তিনি আমোদিনীর বিরুদ্ধে এমনভাবে বলতেন যে, আমোদিনী এবং তাঁর স্বামীর মধ্যে ভালোভাবে কথা বলাই প্রায় বন্ধ হয়ে যেতো। এভাবে দেখা যায় তাঁর সংসারে থেকে তাঁর নামেই নিন্দা করতে কেউ পিছপা হতেন না। এদিকে আমোদিনীর অল্পবয়সে অনেকগুলি সন্তান হওয়ায় তাঁর শরীর খারাপ করলেও তাঁকে সাহায্য করার কেউ নেই। তাঁর মেয়ের বিয়ের পর তাঁর স্বামীর এক নতুন ছাত্র তাঁদের বাড়িতে পড়তে এলে তিনি যখন পুত্রসম মনে করে সেই ছাত্রকে আদর-যত্ন করেন তখন তাঁর মামাশ্বশুরের ছেলে তা দেখে হিংসার বশবর্তী হয়ে তাঁর ও সেই ছাত্রের মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে বলে কুৎসা রটিয়ে দেয়। আর তা শুনে আমোদিনীর কাছে মানুষ হওয়া তাঁর বিধবা জায়ের মধ্যম পুত্রও তাঁকে তিরস্কার করতে দ্বিধা করেনি। অন্যদিকে আমোদিনীর শাশুড়ি এসব কুৎসায় বিশ্বাস করে আমোদিনীর স্বামীকে তা বলে দিলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মানসিকভাবে চিরকালের মতো বিচ্ছেদ ঘটে যায়। আসলে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে স্বামীর চরিত্র স্খলন ঘটলেও স্ত্রী তা মেনে নেয় কিংবা মেনে নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু স্ত্রীর চরিত্র স্খলনের কথা স্বামী কোনমতেই মেনে নিতে পারে না। তাই আমরা দেখি, স্বামীর এক ছাত্রের সঙ্গে আমোদিনীর অবৈধ সম্পর্কের যখন মিথ্যা প্রচার চালানো হয় তখন আমোদিনীর স্বামী সেই অপপ্রচারেই বিশ্বাস করে আমোদিনীর সঙ্গে কথা বলাই বন্ধ করে দেন। এক্ষেত্রে আমোদিনীর স্বামী মানুষের মিথ্যা রটনাতেই বিশ্বাস করেছিলেন, আমোদিনীর কোনো কথাই তিনি শুনতে চাননি। বরং আমোদিনীর স্বামী এই মিথ্যা রটনায় বিশ্বাস করে মাঝে মাঝে নিজের মৃত্যু কামনা করতেন। এভাবে আমোদিনীর দাম্পত্য জীবন বিষময় হয়ে উঠেছিল— স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ-বিবাদ প্রায়ই লেগেই থাকতো। আমোদিনী দাশগুপ্তের ভাষায়—

> ''স্বামী এখন হইতে কারণে অকারণে আমার প্রতি কঠোর ভাব প্রকাশ করিতেন। কাজেই উভয়ের নিয়তই ঝগড়া বিবাদ হইত। যে স্বামী রাজবাড়ি হইতে আসিতে বিলম্ব হইলে সংসার অন্ধকার দেখিতাম সেই স্বামীর বাসায় আসার সময় হইলেই বুকের মধ্যে কাঁপিত। কী জানি বাসায় আসিয়া কী নিয়া রাগিয়া যাইবেন!''[৭]

একসময় আমোদিনী ও তাঁর স্বামীর মধ্যে কথা বলাও বন্ধ হয়ে যায়। আর এভাবে আমোদিনী দাশগুপ্ত স্বামীর সংসারে সকলের সেবা করেও বিনিময়ে শুধুই পেয়েছেন— তিরস্কার, মানসিক যন্ত্রণা, অবহেলা। যাদের ভালোবেসে আপন করে নিয়েছিলেন তাদের মিথ্যা রটনায় স্বামীর সঙ্গে মানসিক দিক থেকে তাঁর চিরবিচ্ছেদ ঘটে যায়। এভাবে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারী সকলের দ্বারা অবহেলিত হয়, নির্যাতিত হয়, তাঁর ভালোলাগা-মন্দলাগা নিয়ে কারো কোন মাথাব্যথা নেই। আসলে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর ব্যক্তিসত্তাকে কেউ স্বীকার করতে চায় না— তাঁকে কেউ মানুষই মনে করে না, মনে করে এক ধরনের অসম্পূর্ণ মানুষ।

সিমোন দ্য বোভোয়ার মন্তব্য করেছেন—

> ''সকলেই এই সত্যিটা স্বীকার করে যে মানবপ্রজাতির মধ্যে স্ত্রীলিঙ্গের অস্তিত্ব বিদ্যমান এবং চিরকালের মতো এখনো তারা মানবসমাজের অর্ধেক, তারপরও আমাদের বলা হয় নারীত্ব বিপদগ্রস্ত। আমাদের বিশেষভাবে উপদেশ দেওয়া হয় নারী হতে, নারী থাকতে। নারী হয়ে উঠতে তাই মনে হয় প্রতিটি স্ত্রীলিঙ্গ মানুষ অপরিহার্যভাবে নারী নয়, নারী হতে হলে থাকতে হবে তার সেই রহস্যময় ও বিপন্ন বৈশিষ্ট্য, যাকে বলা হয় নারীত্ব, ...।''[৮]

অর্থাৎ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারীর কাছে আকাঙ্ক্ষা করে গৃহকর্মে দক্ষতা, বিনম্রতা, লজ্জা প্রভৃতি তথাকথিত নারীত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি— এগুলিকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে আদর্শ নারীর বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই নারীকে এসব বৈশিষ্ট্য আয়ত্ত করার জন্য উপদেশ দেওয়া হয় এবং যেসকল নারী এসব বৈশিষ্ট্য আয়ত্ত করতে পারে না তাদের তিরস্কার করা হয়; সমালোচনা করা হয়। মানকুমারী বসুকে পিতৃগৃহে সেকালের এদেশের রীতি অনুযায়ী গৃহকর্মের শিক্ষা দেওয়া হয়নি, বরং লেখাপড়ার শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। তাই বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে তিনি সেকালের এদেশের গৃহবধূদের মতো গৃহকর্ম প্রভৃতি কাজে দক্ষতা দেখাতে না পারলে সকলেই তাঁর এই অক্ষমতার জন্য তাঁকে তিরস্কার, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছিলেন। মানকুমারী বসু *আমার অতীত জীবন* গ্রন্থে বলেছেন—

> ''আমাকে 'অদ্ভুত জীব' দেখিয়া অর্থাৎ আত্মগোপন করিতে অক্ষম, ছলনা-চাতুরীতে অনভ্যস্ত এবং গৃহকর্মে অশক্ত, এমনতর অদ্ভুত জীব দেখিয়া অনেকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ এবং নিষ্ঠুর সমালোচনা করিতে প্রবৃত্তা হইলেন। কেবল আমি বলিয়া নহি, বঙ্গ-গৃহের অনেক বালিকা বধূকেই এইরূপে 'মানুষ' হইতে হয়।''[৯]

এই সমালোচনায় মানকুমারী বসু পরবর্তীকালে আদর্শ নারীর বৈশিষ্ট্যগুলি রপ্ত করে সকলের প্রশংসা পেয়েছিলেন। আসলে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারীর কাছে নারীত্বের গুণাবলী দাবি করে— যাতে অনায়াসেই তাঁর ওপর কর্তৃত্ব করা যায়।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীকে নারীত্বের গুণগুলি আয়ত্ত করার পাশাপাশি শেখানো হয় বিয়েই হচ্ছে তার জীবনের স্বাভাবিক নিয়তি। এ প্রসঙ্গে তন্দ্রিতা ভাদুড়ী লিখেছেন—

> ''আর এই বিয়েকেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর পরম প্রাপ্তি বলা হয়, এবং শিশু বয়স থেকেই নারীকে শিক্ষা দেওয়া হয় বিয়েই তোমার শেষ ভরসা। ছোটবেলা থেকেই তাই নারী শিখতে থাকে বিয়েই তার শেষ অবলম্বন। মেয়েদের বোঝানো হয় জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান খণ্ড হলো বিবাহিত খণ্ড।''[১০]

—ছেলেবেলা থেকে এই পারিবারিক শিক্ষা পেয়ে উনিশ শতকের এদেশের নারীরাও বিয়েকেই তাদের জীবনের একমাত্র ও পরম অবলম্বন বলে মনে করতো। কৃষ্ণভাবিনী দাসী *ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা* গ্রন্থে ইংরেজ নারীদের সঙ্গে আমাদের দেশের নারীদের তুলনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, আমাদের দেশের কোন নারীর যদি বিয়ে না হয় তাহলে সে তার জীবনের কোন উদ্দেশ্য খুঁজে পায় না। আবার সমাজের পাশাপাশি এদেশের বিবাহিতা নারীরাও মনে করে বিধবা হওয়া তাদের জীবনের মর্মান্তিক পরিণতি। কৃষ্ণভাবিনীর ভাষায়—

> ''কিন্তু আমাদের দেশে অবিবাহিতারা দূরে থাকুক, বিবাহিতারা পর্যন্ত দেশের মঙ্গল সাধনে অগ্রসর হন না। ইংরাজ স্ত্রীলোকেরা, বিবাহ না হইলে বা বিধবা হইলে, জীবনকে নিরর্থক না ভাবিয়া যতদূর সাধ্য মানুষের জীবনের কর্তব্য কর্ম্ম সাধিতে চেষ্টা করে। অন্যের সাহায্যে অনেকে অনেক কাজ করিতে পারে, কিন্তু যাঁহারা নিজে নিজের সহায় হইয়া নিজ বিবেকশক্তির দ্বারা পৃথিবীর উপকার করিতে পারেন ও অগ্রসর হন, তাহাদের জীবন যে কত বহুমূল্য তাহা আমরা ভাবিতে পারি না।''[১১]

—আমাদের দেশের নারীরা ইংরেজ নারীদের মতো বিবাহ না হলে, কিংবা বিধবা হলে মহৎকর্মের মধ্যে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার কথা ভাবতে পারে না। কেননা পিতৃতান্ত্রিক সমাজ এদেশের নারীদের জীবিকার্জনের স্বাধীনতা দেয়নি এবং সম্পত্তিরও অধিকার দেয়নি। ফলে এদেশের নারীদের বাধ্য হয়েই পুরুষদের আশ্রয়ে থাকতে হয়। আর এভাবে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ অর্থনৈতিক দিক থেকে বঞ্চিত করে এদেশের নারীদের বিয়ের মাধ্যমে স্বামীর আশ্রয়ে থাকতে বাধ্য করেছে। তাই এদেশের নারীরা স্বাবলম্বী না হওয়ায় অবিবাহিতা থাকলে কিংবা বিধবা হলে জীবনকে নিরর্থক মনে করতো। আর পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর বিয়ের অর্থই হচ্ছে পুরুষের অধীনতা স্বীকার করা। কেননা পিতৃতান্ত্রিক সমাজে বিয়ের পর নারীকে পিতৃগৃহ তথা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে সারাজীবনের জন্য স্বামীর সংসারে থাকতে হয় এবং আজীবন স্বামীর অধীনতা স্বীকার করতে হয়— নারীর এই স্বামীর অধীনতা স্বীকার করাকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ধর্মশাস্ত্র তথা ঈশ্বরের বিধান বলে মনে করে। রাসসুন্দরী দাসী *আমার জীবন* গ্রন্থে বিয়ের মাধ্যমে নারীর পূর্বের সব কিছু ছেড়ে স্বামীর অধীনতা স্বীকারকে নারীজীবনের দুঃখের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন—

> ‘‘বাস্তবিক আপনার মা ও আপনার সকলকে ছাড়িয়া ভিন্ন দেশে গিয়া বাস এবং যাবজ্জীবন তাহাদিগের অধীনতা স্বীকার, মাতাপিতা কেহ নহেন— এটি কী সামান্য দুঃখের বিষয়।’’[১২]

মাতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর যৌনস্বাধীনতা থাকলেও মাতৃতান্ত্রিক সমাজ থেকে যখন পিতৃতান্ত্রিক সমাজ গঠিত হল তখন পুরুষের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নিশ্চিত করার জন্য নারীর কাছে দাবি করা হল সতীত্ব। কেননা একজন নারীর পক্ষে তার সন্তানের পিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হলেও একজন পুরুষের পক্ষে তার স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান যে তারই ঔরসজাত, তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। তাই নারীর সতীত্ব ধর্ম রক্ষার জন্য পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারীর কামনাকে শাস্ত্রীয় বিধানের বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছিল এবং নারীকে নিক্ষেপ করেছিল অন্তঃপুরে। এ প্রসঙ্গে সিমোন দ্য বোভোয়ার বলেছেন—

> ‘‘... নারীকে রাখা হয় বিশুদ্ধ সতীত্বে। নানা নিষেধ সত্ত্বেও মাতৃধারার সমাজে মেনে নেয়া হয় অনেক বেশি আচরণের স্বাধীনতা। বিবাহ পূর্ব কুমারীত্ব সেখানে প্রয়োজনীয় ছিল না এবং ব্যভিচারকে কঠোরতা ছাড়াই বিচার করা হত। পক্ষান্তরে, যখন নারী হয়ে ওঠে পুরুষের সম্পত্তি, সে চাইল স্ত্রীটি হবে কুমারী

এবং চরম দণ্ডের ভয় দেখিয়ে স্ত্রীর কাছে দাবি করা হল সম্পূর্ণ সতীত্ব।"[১৩]

—এই সতীত্ব ধর্মকে নারীর আজীবন রক্ষা করতে হয়। তাই স্বামীর মৃত্যু হলে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ বিধবা নারীকে নিরালঙ্কারা হয়ে সাদা পোশাক পরিধান করে নির্জলা একাদশী পালনের বিধান দিয়েছে— যাতে নারীর যৌনচাহিদা হ্রাস পায় এবং তার প্রতি কোন পুরুষ আকৃষ্ট না হয়। আসলে নারীরা যাতে স্বামীর মৃত্যুর পরেও ব্যভিচারে লিপ্ত না হয়ে সতীত্ব ধর্ম রক্ষা করে, সেজন্য পিতৃতান্ত্রিক সমাজ বিধবা নারীদের ওপর এসব বিধি-বিধান আরোপ করেছে। আর এসব বিধি-বিধান যে শুধুমাত্র বিধবা নারীদের সতীত্ব ধর্ম রক্ষার জন্য পিতৃতান্ত্রিক সমাজের অপকৌশল এবং এসবের যে কোন যৌক্তিকতা নেই— তা বুঝতে অসুবিধে হয় না কৈলাসবাসিনী দেবীর। তাই কৈলাসবাসিনী দেবী *ডায়েরী* গ্রন্থে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের এই অপকৌশলকে ব্যঙ্গ করে লিখেছেন—

> ''একাদশিটি, যেটি ছোটো ঘরে নাই, কেবল ভদ্র ঘরে কেন ? তার কারণ শরিরে কষ্ট দিতে বিধবাদের তেজ কমিবে তা হলে সতীত্ব অনায়াশে থাকিবে, একাহারে নানান কষ্ট করিবে। বেশ বিলাষ করিবে না, তার কারণ আছে। তা হলে কেউ চেয়ে দেকিবে না। ... এখানে বিধবাদের সব বারণ করিআছে, সতীত্বের কর্তে ধর্ম্ম জগতে নাই। দেখ পুরানে কোরানে বাইবেলে সবেতে সতীত্বের মান্য। জেখানে ভারতবরষে পুনু বিবাহ চলিত নাই, কাজে ২ এই নিয়ম চলিত হইয়াছে। জদি সতীত্ব রাকিতে পারে তাহলে ধর্ম্ম রাকা হল। এ নিয়মে ধর্ম্ম জায় না ও থাকেও না। সতীত্ব স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম। সতীত্ব মান্য, সতীত্ব হচ্ছে আশল ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম থাকিবে বলে এই কষ্ট বিধান হইয়াছে।"[১৪]

—এখানে যুক্তির দ্বারা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের অপকৌশলকে খণ্ডন করেছেন কৈলাসবাসিনী দেবী।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষই প্রধান এবং নারী তার করুণাতেই বেঁচে থাকে। নারী সংসারের যাবতীয় কাজ করলেও তার ইচ্ছে-অনিচ্ছে, ভালোলাগা-মন্দলাগা ইত্যাদির কোন মূল্যই নেই পিতৃতান্ত্রিক সমাজের কাছে। নারী বিয়ের পরে স্বামীর সংসারে গিয়ে সম্পূর্ণ পরাধীন হয়ে যায়— স্বামী কিংবা শ্বশুরবাড়ির গুরুজনদের ইচ্ছেতেই তখন চলতে হয় নারীকে। নারীকে সাধারণত অন্দরমহল থেকে বাইরে বেরোতে দেওয়া হতো না, এমনকি বাপের বাড়ি যেতে চাইলেও নারীর যাওয়া হতো না যতক্ষণ না পর্যন্ত তার স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির কর্তাব্যক্তিদের ছাড়পত্র মেলে। রাসসুন্দরী দাসী *আমার জীবন* আত্মকথায় বলেছেন, বিয়ের পর তাঁর মা তাঁকে নিজের কাছে নিয়ে যেতে

চাইলেও সংসারের কাজ তাঁকে ছাড়া হবে না বলে স্বামী তাঁকে মা-র কাছে যাওয়ার অনুমতি দেননি। তবে বাপের বাড়িতে কোন অনুষ্ঠান থাকলে রাসসুন্দরীর স্বামী রাসসুন্দরীকে দু'-চার দিনের জন্যে বাপের বাড়িতে যাওয়ার অনুমতি দিতেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও রাসসুন্দরীর স্বামী কিছুলোক দিয়ে রাসসুন্দরীকে বাপের বাড়ি পাঠাতেন এবং সেইসকল লোক নৌকোয় বসে রাসসুন্দরীর জন্য অপেক্ষা করতো এবং দু'-চারদিন পর রাসসুন্দরীকে নিয়ে তারা রাসসুন্দরীর শ্বশুরবাড়িতে ফিরে যেতো। এমনই বন্দীজীবন ছিল রাসসুন্দরীর। হরগৌরীর কাহিনিতেও পিতৃতান্ত্রিক সমাজে শ্বশুরবাড়িতে নারীর বন্দীজীবনের এই করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। সেখানে আমরা দেখি শিব বছরে মাত্র একবার চারদিনের জন্যে গৌরীকে বাপের বাড়িতে যাওয়ার অনুমতি দেন। কেননা গৌরীকে ছাড়া শিবের সাংসারিক কাজ চলবে না। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর এই পরাধীনতার কারণে রাসসুন্দরীর মা মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁকে দেখতে চাইলেও সাংসারিক কাজকর্মের জন্য স্বামীর অনুমতি না মেলায় রাসসুন্দরী তাঁর মা-কে শেষ দেখা দেখতে পাননি। রাসসুন্দরী তাই আক্ষেপ করে বলেছেন—

> ''আহা! আমি মাকে দেখিবার জন্য কত প্রকার চেষ্টা পাইয়াছিলাম, কিন্তু আমার দুরদৃষ্টিহেতু কোনোক্রমেই যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। এটি কী আমার সাধারণ আক্ষেপের বিষয়! হা বিধাতঃ। তুমি কেনই বা আমাকে মানবকুলে সৃষ্টি করিয়াছিলে? পৃথিবী মধ্যে পশু পক্ষ্যাদি যে কিছু ইতর প্রাণী আছে, সর্বাপেক্ষা মনুষ্য-জন্ম দুর্লভ বটে। সেই দুর্লভ জন্ম পাইয়াও আমি এমন মহাপাতকিনী হইয়াছি। আমার নারীকুলে কেন জন্ম হইয়াছিল? আমার জীবন ধিক্। পৃথিবীর মধ্যে মাতার তুল্য স্নেহময়ী আর কে আছে। মাতাকে পরমেশ্বরের প্রতিনিধি বলিলেও বলা যায়। এমন যে দুর্লভ বস্তু মা, এই মায়ের সেবা করিতে পারি নাই।''[১৫]

—পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারী যে পুরুষের অনুমতি ব্যতীত কিছুই করতে পারে না রাসসুন্দরী দাসীর এই আক্ষেপ থেকে তা বুঝতে আমাদের অসুবিধে হয় না। এ প্রসঙ্গে সুদক্ষিণা সেনের মাসির কথা আমাদের মনে পড়ে। সুদক্ষিণা সেন *জীবন স্মৃতি*-তে জানিয়েছেন, একবার তিনি এবং তাঁর দাদামহাশয় মাসির শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছিলেন মাসিকে বাপের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু সুদক্ষিণার মাসি সেবার সুদক্ষিণাদের সঙ্গে বাপের বাড়িতে যেতে পারেননি— শ্বশুরবাড়ির কর্তাব্যক্তিদের অনুমতি না পাওয়ায়। সুদক্ষিণা সেন তাঁর মাসির বাপের বাড়িতে যেতে না পারার

মনোবেদনার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন—

> ''তিনি সজল নয়নে যতক্ষণ আমাদের দেখা যাইতেছিল, একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। এখনও তাঁহার সেই করুণ মুখচ্ছবি আমার চোখে ভাসিতেছে। সে'কালে শ্বশুরালয়ে বধূরা প্রায় বন্দিনীর মতন থাকিতেন। শ্বশুর শাশুড়ির অথবা অভিভাবকদের অনুমতি বিনা পিত্রালয়ে আসিতে পারিতেন না। অনেক সময় পিতা কন্যাকে তাঁহার বাটীতে আনিতে গিয়া বিরস বদনে ফিরিয়া আসিতেন। এই সকল কারণে তৎকালে বালিকাবধূগণের পিতৃগৃহ ছাড়িয়া শ্বশুরগৃহে বাস করিতে যে কিরূপ কষ্ট হইত, তাহা সকলেই অবগত আছেন।''[১৬]

—সেকালে এদেশের পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ নারীর ওপর কর্তৃত্ব করার ফলে নারী শ্বশুরবাড়ির অন্দরমহলের পরাধীন জীবনে যে দুঃখ ও মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতো— সুদক্ষিণা সেন এখানে সেদিকটির প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ নারী শুধুমাত্র নারী হওয়ার কারণেই পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পরাধীন জীবন যাপন করে। অথচ প্রচলিত অর্থে নারী ও পুরুষ বলতে আমরা যা বুঝি জন্মসূত্রে কেউ সেরকম গুণাবলী নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। শৈশবকালে কন্যাসন্তান ও পুত্রসন্তানের দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতা প্রায় একইরকম থাকে। কিন্তু সমাজ তথা পরিবার ছেলেবেলা থেকেই কন্যাসন্তান ও পুত্রসন্তানকে যথাক্রমে নারী ও পুরুষ হিসেবে দেখে এবং সেভাবেই তাদের গড়ে তোলে। এ প্রসঙ্গে সিমোন দ্য বোভোয়ার মন্তব্য করেছেন—

> ''কেউ নারী হয়ে জন্ম নেয় না, নারী হয়ে ওঠে। সমাজে মানবকুলের স্ত্রীজাতি যে ভাবে দেখা দেয়, কোনও জৈবিক, মনস্তাত্ত্বিক বা আর্থনীতিক নিয়তি তার রূপ নির্ধারণ করে না। সামগ্রিকভাবে সভ্যতাই সৃষ্টি করে পুরুষ ও নপুংসকের মাঝামাঝি এই প্রাণীটিকে, যাকে বলা হয় নারী, শুধু অন্য কারো হস্তক্ষেপই একটি মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে অপর রূপে। শিশু যতক্ষণ নিজের মধ্যে এবং নিজের জন্যে অস্তিত্বশীল, তখন কোনও শিশুর পক্ষে নিজেকে লৈঙ্গিকভাবে আলাদা ভাবাই কঠিন।''[১৭]

— কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুত্রসন্তানকে কন্যাসন্তানের তুলনায় উৎকৃষ্ট ভেবে বেশি স্বাধীনতা দেওয়া হয় এবং কন্যাসন্তানকে তাচ্ছিল্য করা হয়। নারীকে জীবিকার্জনের স্বাধীনতা দেওয়া হয় না বলে নারীকে স্বামীর অধীনে থাকতে হয় এবং সেখানে তার কর্তৃত্ব চলে না। সমাজ তথা পরিবারের

এই লিঙ্গ বৈষম্যের কারণে পুরুষ তার পুরুষত্বের জন্যে গর্ববোধ করলেও নারী তার নারীত্বের জন্যে গর্ববোধ করতে পারে না, বরং নারী তার নারীত্বের জন্য আক্ষেপ করে এবং অনেক সময় পুরুষ হওয়ার মনোবাঞ্ছা প্রকাশ করে। তাই রাসসুন্দরী দাসীকে আমরা দেখি যখন তিনি স্বামীর অনুমতি না পাওয়ায় মুমূর্ষু মা-কে শেষবারের মতো দেখতে যেতে পারলেন না তখন তিনি নারী হয়ে জন্মানোর জন্য আক্ষেপ করেছেন এবং পুরুষ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন। নারীবাদীদের মতে, কোন নারী পুরুষ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে শুধুমাত্র পুরুষের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার জন্যে। আর নারীর এই মনস্তাত্ত্বিক ভাবনার মূলে রয়েছে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নিম্ন অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসার একটা প্রবণতা।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষই কর্তা হওয়ায় সেখানে নারীর ইচ্ছে-অনিচ্ছের কোন মূল্যই নেই। সারদাসুন্দরী দেবীর স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারের কর্তৃত্ব করেন তাঁর ভাশুর— সেক্ষেত্রে সারদাসুন্দরীর মতামতের কোন মূল্যই দেয়নি তাঁর ভাশুর। তাই সারদাসুন্দরীর ছেলে-মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারেও তাঁর ভাশুরই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং সেক্ষেত্রে তিনি সারদাসুন্দরীর ইচ্ছে-অনিচ্ছেকে গুরুত্বই দেননি। স্বামীর মৃত্যুর পর সারদাসুন্দরীর সেজো মেয়ে চুণীর বিয়ে এক ধনবান ছেলের সঙ্গে ঠিক হলেও তাঁর ভাশুর সে বিয়ে ভেঙে দিয়ে সারদাসুন্দরীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও সারদাসুন্দরীর বিপত্নীক বড় জামাই লক্ষ্মীনারায়ণের সঙ্গে চুণীর খুব সাধারণভাবে বিয়ে দিয়েছিলেন। সারদাসুন্দরী দেবী *আত্মকথা*-য় বলেছেন—

> ‘‘আমার বড়ো জামাই লক্ষ্মীনারায়ণের সঙ্গেই সেজো মেয়ের বিবাহ হয়। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই বিবাহ হয়। পূর্ব্বে এক ধনবানের ছেলের সঙ্গে বিবাহের কথা ঠিক হইয়াছিল। শেষে আমার বড়ো মেয়ের মৃত্যুর পর সেই বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙিয়া ভাশুর বড়ো জামাই-এর সঙ্গে চুণীর বিবাহ দেন।’’[১৮]

— এরপর সারদাসুন্দরী দেবী ছোট মেয়ে পান্নার বিবাহ নিজে ঠিক করলেও সেই বিয়েতে টাকা-পয়সা তথা খরচের হিসেব তাঁর ভাশুরই করেছিলেন। আবার তাঁর ছেলে কেশবচন্দ্রের বিয়ের সময়েও আমরা তাঁর ভাশুরের কর্তৃত্ব লক্ষ করি। কেশবচন্দ্রের বিয়ের জন্যে এক সুন্দরী মেয়ের প্রস্তাব এলে তাঁর ভাশুর সুযোগ বুঝে নিজের সেজো ছেলের সঙ্গে সেই সুন্দরী মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেন। এরপর তাঁর ভাশুর গোলাপসুন্দরী নামে এক রোগা ও শ্যামবর্ণা মেয়ের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের বিয়ে ঠিক করেন। কিন্তু গোলাপসুন্দরী অসুন্দরী হওয়ায় সারদাসুন্দরী সেই বিয়েতে অনিচ্ছে প্রকাশ করলেও

তাঁর ভাশুর যেহেতু গোলাপসুন্দরীকে আশীর্বাদ করেছেন সেহেতু তিনি গোলাপসুন্দরীর সঙ্গেই কেশবচন্দ্রের বিয়ে দিয়েছিলেন। যদিও পরবর্তীকালে কেশবচন্দ্রের স্ত্রী গোলাপসুন্দরী দেখতে সুন্দরী হয়েছিলেন তবুও কেশবচন্দ্রের এই বিয়ের ঘটনা থেকেও আমরা বুঝতে পারি, সারদাসুন্দরীর মতামতের কোন মূল্যই দেয়নি তাঁর ভাশুর। সেকালে এদেশের পিতৃতান্ত্রিক সমাজে এমনই ছিল পুরুষের কর্তৃত্ব।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ নারীর ওপরে কর্তৃত্ব করলেও পুরুষ কখনোই নারীর সামান্যতম কর্তৃত্বও স্বীকার করতে চায় না। বিনোদিনী দাসী *আমার কথা*-য় জানিয়েছেন, তিনি গুর্মুখ রায়ের রক্ষিতা হতে রাজি হয়েছিলেন বলেই গুর্মুখ রায় নতুন থিয়েটার তৈরির জন্য টাকা খরচ করেছিলেন। বিনোদিনীর এই আত্মত্যাগের জন্যে তখন তাঁর সহকর্মীরা বলেছিলেন নতুন থিয়েটারের নাম হবে বিনোদিনীর নামের আদ্যক্ষর দিয়ে *বি থিয়েটার*। কিন্তু থিয়েটার যখন প্রস্তুত হয় তখন নতুন থিয়েটারের নামকরণ করা হয় *স্টার থিয়েটার*। এতে বিনোদিনী সহকর্মীদের চক্রান্তে অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন। তবে এরপরও বিনোদিনীর বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র করেছিলেন সহকর্মীরা। পরবর্তীকালে নানা কারণে গুর্মুখ রায় যখন থিয়েটারের স্বত্ব ত্যাগ করতে চাইলেন তখন তিনি শর্ত দিয়েছিলেন যে, বিনোদিনীকে থিয়েটারের অর্ধেক স্বত্ব না দিলে তিনি থিয়েটারের স্বত্ব হস্তান্তর করবেন না— যাতে বিনোদিনীর *স্টার থিয়েটারে-র* ওপর একটা কর্তৃত্ব থাকে। তবে গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখরা গুর্মুখ রায়ের এ শর্তে রাজি হলেন না। কেননা তাহলে *স্টার থিয়েটারে* বিনোদিনীর অধীনে তাঁদের কাজ করতে হবে এবং পুরুষ হয়ে নারীর অধীনে কাজ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়— এতে তাঁদের পুরুষত্বের আপহ্নব ঘটবে বলে তাঁরা মনে করেন। সেজন্য বিনোদিনী যাতে থিয়েটারের অর্ধেক স্বত্ব গ্রহণ না করে সেজন্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ বিনোদিনীর মা-কে বলেন, বিনোদিনীর পক্ষে থিয়েটারের স্বত্বাধিকারিণী হয়ে থিয়েটার পরিচালনার মতো কঠিন কাজ করা সম্ভব নয়। আর গিরিশচন্দ্রের এসব কথা শুনে বিনোদিনীর মা বিনোদিনীকে থিয়েটারের স্বত্বাধিকারিণী হতে দেননি। আর বিনোদিনীর থিয়েটারের স্বত্ব ত্যাগ করার পেছনে যে গিরিশচন্দ্রের হাত ছিল, তা বিনোদিনীর লেখায় স্পষ্ট। বিনোদিনী লিখেছেন—

> ‘‘গিরিশবাবুর এই সকল কথা শুনিয়া মা আমার কোনো মতেই রাজি হইলেন না। যেহেতু আমার মাতাঠাকুরানিও গিরিশবাবু মহাশয়কে অতিশয় ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন।’’[১৯]

—এথেকে আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ নারীর কর্তৃত্ব স্বীকার করতে চায় না বলেই নানা কৌশলে পুরুষ নারীকে কর্তৃত্ব করার সামান্যতম অধিকার থেকেও বঞ্চিত করে। নারীর এরকম বঞ্চনার দৃষ্টান্ত আমরা শরৎকুমারী দেবের *আমার সংসার* গ্রন্থেও পাই। শরৎকুমারীর স্বামী সত্যপ্রিয় তাঁদের ভদ্রাসনের বাড়ি বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং তিনি এক ব্যক্তিকে তাঁর সেই ভদ্রাসনের বাড়িটি বিক্রি করবেন বলে কথা দিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু শরৎকুমারী সেই বাড়িটির সঙ্গে তাঁর বধূ জীবনের নানা স্মৃতি জড়িয়ে আছে বলে স্বামীর বাড়ি বিক্রির সিদ্ধান্তে আপত্তি জানিয়েছিলেন এবং স্বামীর সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁর রীতিমতো কলহ-বিবাদও হয়েছিল— যাতে স্বামী সেই বাড়িটি বিক্রি না করেন। পরে শরৎকুমারীর স্বামী শরৎকুমারীর আপত্তিতে সাময়িকভাবে সে বাড়ি বিক্রি করার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেছিলেন। এতে সাময়িকভাবে শরৎকুমারীর সিদ্ধান্তে তাঁর স্বামী নতি স্বীকার করলেও একই সঙ্গে পুরুষত্বের অহঙ্কার থেকে তিনি শরৎকুমারীকে জানাতে ভোলেন না যে, এতে তিনি অসম্মানিত হয়েছেন এবং একপ্রকার অভিসম্পাতের ভঙ্গিতেই বলেন— একসময় মামলা-মোকদ্দমায় এ বাড়ি শরৎকুমারীর হাতছাড়া হয়ে যাবে। শরৎকুমারী দেবের ভাষায়—

> ''ভদ্রাসন বাটী সবটা বিক্রয় করিব না আমার ইচ্ছা, এই লইয়া তাঁহার সহিত কত বাক্‌বিতণ্ডা করিয়াছি। ভদ্রলোক বায়নার টাকা লইয়া আসিয়া ফেরত দিলে আমাকে বলিলেন, ''বাড়ির মোহে তুমি কী অন্যায় করিলে জান না, আমি জীবনে যখন কাহাকেও কোনো কথা দিয়া এ পর্যন্ত নড়চড় করি নাই। তোমার জন্য আমাকে তাহাই করিতে হইল, তুমি স্ত্রী হয়ে ভদ্রলোকের কাছে এরূপে আমাকে অপমানিত করিলে এই শাস্তি একদিন পাইতে হইবে। জানিও, এই বাড়ির একখানি ইঁটও তোমরা দখলে পাইবে না, ও কলহ, বিবাদ, মোকদ্দমা মামলায় উৎসন্ন যাইবে''। তার কথাগুলি আমার যেন বিষম অভিসম্পাতের মতো বোধ হইল।''[২০]

—শরৎকুমারীর স্বামী সত্যপ্রিয় সেকালে অনেকের তুলনায় প্রগতিশীল হলেও পুরুষত্বের অহঙ্কারকে তিনি সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে পারেননি। তাই সাময়িকভাবে স্ত্রীর সিদ্ধান্ত তিনি মেনে নিলেও বিনিময়ে তিনি স্ত্রীকে তিরস্কার করেছেন। আর স্বামীর এই মনোভাবের জন্যে শেষপর্যন্ত শরৎকুমারী স্বামীর ভদ্রাসনের বাড়ি বিক্রির সিদ্ধান্তেই মত দিয়েছিলেন। এ থেকে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি, পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ নারীর প্রাধান্যকে কখনই মেনে নিতে পারে না— তা সেই পুরুষ

প্রগতিশীলই হোক কিংবা রক্ষণশীলই হোক না কেন।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর কোনো নিজস্ব পরিচয় নেই। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারী জীবনের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পুরুষের আশ্রয়ে থাকে— *মনুসংহিতা*-য় রয়েছে সেই বিধান। মনুর মতে, নারী হীনস্বভাবী হওয়ায় নারীকে বাল্যকালে পিতার, যৌবনে স্বামীর এবং বৃদ্ধ বয়সে স্বামীর মৃত্যু হলে পুত্রের অধীনে থাকতে হবে— কোনো অবস্থাতেই নারীকে স্বাধীনতা দেওয়া যাবে না। তাই পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর পরিচয় হয় বাল্যকালে পিতার মেয়ে হিসেবে, যৌবনকালে স্বামীর স্ত্রী হিসেবে এবং শেষবয়সে সন্তানের মা হিসেবে। এ প্রসঙ্গে রাসসুন্দরী দাসী *আমার জীবন* গ্রন্থে তাঁর ষাট বছর পর্যন্ত জীবনের কাহিনি বর্ণনা করে লিখেছেন—

> ''আমার নাম মা, আমার পিত্রালয়ে যে নাম ছিল, তাহাতো অনেক কাল লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে বিপিনবিহারী সরকার, দ্বারকানাথ সরকার, কিশোরীলাল সরকার, প্রতাপচন্দ্র সরকার এবং কন্যা শ্যামসুন্দরী আমি ইহাদিগের মা! এক্ষণে আমি সকলেরই মা।''[২১]

—রাসসুন্দরী দাসীর এই বক্তব্যের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিসত্তার সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। আসলে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীও যে একজন ব্যক্তি এবং তারও যে নিজস্ব নাম-পরিচয় আছে সেকথা একসময় সকলেই ভুলে যায়— নারীর পরিচয় হয় তার আশ্রয়দাতা পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। এমনকি এদেশের অনেক নারীও তাদের আশ্রয়দাতা পুরুষদের সঙ্গে সম্পর্কের নিরিখে নিজেদের পরিচয় তুলে ধরে মানুষের কাছে। রাসসুন্দরী দাসীরও শেষজীবনের পরিচয় তাঁর সন্তানদের মা হিসেবে হলেও এতে যে তাঁর ব্যক্তিপরিচয় বিঘ্নিত হয়েছে— সে বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন।

উনিশ শতকেও এদেশের পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীদের জীবিকার্জনের স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি এবং সম্পত্তির অধিকারও দেওয়া হয়নি। কেননা নারীদের জীবিকার্জনের স্বাধীনতা দিলে ও সম্পত্তির অধিকার দিলে নারীরা স্বাধীন হয়ে যাবে এবং তাদের আর পরাধীন করে রাখা যাবে না। তাই পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কৌশলে নারীদের আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে রেখেছে— যাতে নারীরা পুরুষের ওপর নির্ভরশীল হয় এবং পুরুষরা ইচ্ছেমতো তাদের শোষণ, অবহেলা করতে পারে। এ প্রসঙ্গে সারদাসুন্দরী দেবী *আত্মকথা*-য় বলেছেন, তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পনেরো দিন পরেই সেজো দেওর বংশী তাঁর স্বামীর বড় খাটটি, এমনকি তাঁর স্বামীর শালগুলিও জোর করে নিয়ে যান।

সারদাসুন্দরীর সেজো দেওর বংশীর এরকম আচরণের মধ্য দিয়ে আমরা এটুকু বুঝতে পারি যে, বংশী যেন বুঝিয়ে দিতে চাচ্ছিলেন যে— স্বামীর সম্পত্তিতে সারদাসুন্দরীর কোন অধিকার নেই এবং স্বামীর অস্তিত্ব ছাড়া পিতৃতান্ত্রিক সমাজে স্ত্রীর কোন পৃথক অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তাই বংশী তাঁর দাদার মৃত্যুতে বৌদিকে তথা সারদাসুন্দরীকে বঞ্চিত করে দাদার খাট এবং দাদার শালগুলিও দখল করে নিয়েছেন।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের কাছে নারী শুধু যৌনক্ষুধা পরিতৃপ্তির ও সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র। এ প্রসঙ্গে সিমোন দ্য বোভোয়ার বলেছেন—

> '' নারী তা-ই, যা পুরুষ ঘোষণা করে। তাকে তাই বলা হয় শুধু 'লিঙ্গ'। যা দিয়ে বোঝানো হয় নারী পুরুষের কাছে শুধুই একটি যৌন সত্তা। পুরুষের কাছে নারী লিঙ্গ, চরম লিঙ্গ, তার কম নয়।"[২২]

— পুরুষের কাছে নারীর ব্যক্তিসত্তার কোনো মূল্য নেই— পুরুষের কাছে নারী ভোগ্যবস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই স্ত্রীর মৃত্যু পুরুষের কাছে বেদনাদায়ক নয়, বরং তা পুরুষের পক্ষে লাভজনক— প্রবাদ আছে, 'ভাগ্যবানের বউ মরে'। কেননা পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের বহুবিবাহের সমর্থন থাকায় কোনো পুরুষের স্ত্রী মারা গেলে সে পুনরায় আরেকটি বিয়ে করে প্রচুর পণ এবং নতুন নারীকে সম্ভোগ করার সুযোগ পেয়ে যায়। সঙ্গত কারণেই তন্দ্রিতা ভাদুড়ী লিখেছেন—

> ''নারীর গুণ পুরুষের সব অন্যায় অত্যাচার মাথা পেতে গ্রহণ করে পুরুষের পদতলে পড়ে থেকে, পুরুষকে পুত্র সন্তান উপহার দিয়ে মরে যাওয়া; পুরুষের সমাজে যত বৌ মরে পুরুষের ক্ষেত্রে তা মঙ্গল, অর্থাৎ প্রথমতঃ ক্রমাগত বিয়ে করে পণপ্রথার মত পুরুষের দাবীর অর্থ সংগ্রহ করা, দ্বিতীয়তঃ নতুন নতুন নারী সম্ভোগে যৌন সুখ ভোগ করা।"[২৩]

তাই পিতৃতান্ত্রিক সমাজে স্ত্রীর মৃত্যুতে শোকাহত হয়ে পুনরায় বিয়ে না করা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রসন্নময়ী দেবী *পূর্ব্বকথা-য়* বলেছেন, ধরো মহাশয় পত্নী বিয়োগ-বেদনায় কাতর হলে তা দেখে তাঁর কাকা তাঁকে তিরস্কার করে বলেছিলেন, স্ত্রীলোক একজোড়া চটি জুতোর মতো— একজোড়া নষ্ট হলে তার জন্য দুঃখ না করে আরেক জোড়া কিনে আনতে হয়। অর্থাৎ স্ত্রীর মৃত্যুতে দুঃখ না করে আরেকটি বিয়ে করে ফেলতে হয়। প্রসন্নময়ী দেবীর ভাষায়—

> ''পিতৃদেব ও আমাদিগের পরিজনগণের গঙ্গাবাসে থাকাকালীন, ধরো মহাশয়ের

হঠাৎ পত্নী বিয়োগ হয়। তিনি তাঁহার স্ত্রীর অকাল মৃত্যুজনিত শোকে কাজকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া একেবারে শয্যা আশ্রয় করেন। তাঁহার কাকা এই সংবাদে অত্যন্ত কুপিত হইয়া ভ্রাতুষ্পুত্রকে ভর্ৎসনা করিয়া বলেন, 'যাদব, তোমার এ কী শোক? স্ত্রী এক জোড়া চটি জুতা বইতো না। এক জোড়া গিয়াছে আর এক জোড়া তার চেয়েও ভালো আনিয়ে দিব। কান্নাকাটি কী? ভাগ্যবানের বউ মরে, তামা পিতলে ঘর ভরে'।"[২৪]

—তবে যাদব ওরফে ধরো মহাশয় কাকার বক্তব্যে প্রভাবিত না হয়ে পুনর্বার বিয়ে না করলেও ধরো মহাশয়ের কাকার বক্তব্য থেকে নারীজাতি সম্পর্কে সেকালের পুরুষদের ধারণা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। আর প্রসন্নময়ী দেবী তাঁর ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই নারীজাতি সম্পর্কে পুরুষের এরকম ধারণায় তিনি ব্যথিত হয়েছিলেন।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষরাই নারীদের বারাঙ্গনা করে, অথচ সেই পুরুষরাই আবার বারাঙ্গনাদের সমাজে স্থান দেয় না। বিনোদিনী দাসী *আমার কথা-য়* বলেছেন, বারাঙ্গনা জীবন কলঙ্কের হলেও কেউ জন্মসূত্রে বারাঙ্গনা হয়ে জন্মায় না। তবে অনেক নারী স্বেচ্ছায় বারাঙ্গনা জীবন বেছে নিলেও অনেক নারীই আবার পুরুষদের ছলনার দ্বারা প্রতারিত হয়ে শেষপর্যন্ত কোনো পথ না পেয়ে কলঙ্কিত বারাঙ্গনার জীবন বেছে নেয়। অর্থাৎ আমরা বলতেই পারি, অনেক বারাঙ্গনার কলঙ্কিত জীবনের জন্যে অনেক পুরুষও দায়ী। অথচ সেসকল পুরুষই পিতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রতিভূ হয়ে বারাঙ্গনাদের সমাজে স্থান দেয় না। এমনকি কোনো বারাঙ্গনা তার সন্তানকে যদি লেখাপড়া শিখিয়ে সৎপথে রাখতে চায়, যাতে তার সন্তানকেও তার মতো কলঙ্কিত জীবন কাটাতে না হয়, তবে সেই সমাজপতিরাই বারাঙ্গনার সন্তানকে বিদ্যালয়ে পড়াশোনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার জন্যে ষড়যন্ত্র করে। কেননা সেই সকল তথাকথিত সমাজপতির আশঙ্কা, বারাঙ্গনার সন্তান যেন জন্মসূত্রেই বারাঙ্গনা; কলঙ্ক তার ভূষণ— এই বারাঙ্গনার সন্তানের সঙ্গে বিদ্যালয়ে একসঙ্গে লেখাপড়া শিখলে তাদের সন্তানরাও কলঙ্কিত হবে। স্বাভাবিকভাবেই বারাঙ্গনার পাশাপাশি বারাঙ্গনার সন্তানও তথাকথিত ভদ্রসমাজে স্থান না পেয়ে শেষপর্যন্ত কলঙ্কের পথকেই বেছে নিতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ পুরুষই নারীকে বারাঙ্গনা করে, অথচ সেই পুরুষই বারাঙ্গনাকে এবং তার সন্তানকে সমাজে গ্রহণ করে না। বিনোদিনী দাসী লিখেছেন—

''বারাঙ্গনা জীবন কলঙ্কিত ঘৃণিত বটে? কিন্তু সে কলঙ্কিত ঘৃণিত কোথা হইতে

হয়? জননী জঠর হইতে তো একেবারে ঘৃণিতা হয় নাই? জন্ম মৃত্যু যদি ঈশ্বরাধীন হয়, তবে তাহাদের জন্মের জন্য তো তাহারা দোষী হইতে পারে না? ভাবিতে হয় এ জীবন প্রথম ঘৃণিত করিল কে? হইতে পারে কেহ কেহ স্বেচ্ছায় অন্ধকারে ডুবিয়া নরকের পথ পরিষ্কার করে? কিন্তু আবার অনেকেই পুরুষের ছলনায় ভুলিয়া তাহাদের বিশ্বাস করিয়া চির কলঙ্কের বোঝা মাথায় লইয়া অনন্ত নরক যাতনা সহ্য করে। ... আবার এই বিপন্নাদের পদে পদে দলিত করিবার জন্য ওই অবলা-প্রতারকেরাই সমাজপতি হইয়া নীতি পরিচালক হন! যেমন ভাগ্যহীনাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, তাহারা যদি তাহাদের সুকুমার মতো বালক-বালিকাদের সৎপথে রাখিবার জন্য কোনো বিদ্যালয়ে বা কোনো কার্য্য শিক্ষার জন্য প্রেরণ করে, তখন ওই সমাজপতিরাই শত চেষ্টা দ্বারা তাহাদের সেই স্থান হইতে দূর করিতে যত্নবান হন।"[২৫]

—এভাবে যুক্তি দিয়ে বিনোদিনী দাসী বারাঙ্গনাদের বিরুদ্ধে পুরুষদের চক্রান্তের প্রতিবাদ করেছেন।

উনিশ শতকে এদেশের সমাজে স্বামীকে স্ত্রীর প্রভু বলে মনে করা হতো। কেননা সেকালে এদেশের নারীরা জীবন ধারণের জন্যে পুরুষের ওপর নির্ভরশীল ছিল। তাই স্বামী ছিল স্ত্রীর জীবনের যাবতীয় সুখ-সৌভাগ্যের মালিক। তাই সেকালে স্বামীর মৃত্যুকে স্ত্রীর জীবনের সব থেকে মর্মান্তিক ঘটনা বলে মনে করা হতো। কেননা স্ত্রী আর্থিক দিক থেকে স্বাবলম্বী না হওয়ায় স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীকে পুত্র কিংবা অন্য আত্মীয়দের আশ্রয়ে থেকে অনাদর-অবহেলা সহ্য করতে হতো। এছাড়া বিধবা নারীকে আবার অশুভ, অমঙ্গলসূচক বলে মনে করা হতো বলে সেকালে কোন নারীর বিধবা হওয়া যে কতটা দুর্ভাগ্যের ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় সেকালে নারীকে শাস্তি হিসেবে বিধবা হওয়ার অভিশাপ দেওয়ার ঘটনায়। রাসসুন্দরী দাসী *আমার জীবন* আত্মকথায় নিজের বৈধব্যের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বিধবাদের সম্পর্কে সেকালের মানুষদের মনোভাবের কথা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন—

"এক্ষণে শেষ দশাতে বৈধব্য দশা ঘটিয়াছে। কিন্তু একটি কথা বলিতেও লজ্জা বোধ হয়, শুনিতেও দুঃখের বিষয় বটে।

শত পুত্রবতী যদি পতিহীনা হয়।
তথাপি তাহাকে লোকে অভাগিনী কয়।।

বাস্তবিক যদি আর কিছু না বলে, তুমি বিধবা হইয়াছো, এটি বলিতেই চাহে।”[২৬]

—এরকম ধারণা সেকালের অধিকাংশ নারীরও ছিল— তারা মনে করতো স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাদের জীবনের মূল্যও যেন ফুরিয়ে গেছে। তাই কৈলাসবাসিনী দেবী স্বামীর মৃত্যুর পরবর্তী ঘটনা তাঁর আত্মকথায় আর লিপিবদ্ধ করেননি। তবে রাসসুন্দরী দাসী কৈলাসবাসিনীর মতো স্বামীর মৃত্যুতে তাঁর আত্মকথার সমাপ্তি টানেননি; তিনি স্বামীর মৃত্যু পরবর্তী ঘটনাও তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন। কেননা তিনি স্বামীর মৃত্যুতে দুঃখ পেলেও তাঁর জীবনকে নিরর্থক ভাবেননি। কেননা তিনি জানতেন মানব-সংসারে মৃত্যু একটি স্বাভাবিক ঘটনা এবং একজনের মৃত্যুতে আরেকজনের জীবন থেমে থাকতে পারে না। তাই স্বামীর মৃত্যুকে তিনি তাঁর জীবনের মর্মান্তিক ঘটনা রূপে মনে করেননি। আর রাসসুন্দরী দাসীর এই মানসিকতাকে আমরা অনায়াসেই বিধবাদের সম্পর্কে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের গড়ে তোলা নেতিবাচক ধারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে ধরে নিতে পারি।

বিধবা নারীদের জন্যে হিন্দু রক্ষণশীল সমাজ কঠোর ব্রত-অনুষ্ঠান পালনের বিধান দিয়েছে, এগুলির মধ্যে সবথেকে কঠোর ব্রত ছিল নির্জলা একাদশী পালন— পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সে বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। হিন্দু রক্ষণশীল সমাজ বিধবা নারীদের জন্যে যে কঠোর ব্রত-অনুষ্ঠান পালনের বিধান দিয়েছে, তা এতটাই কঠোর ছিল যে এসব পালন করতে গিয়ে অনেক বিধবা নারীর প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠতো। আর এসব বিধান বালবিধবা থেকে অধিক বয়স্কা বিধবা সকলের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য ছিল। স্বাভাবিকভাবেই বালবিধবা নারীদের অনেকেই এসব কঠোর বিধান পালন করতে গিয়ে অতিরিক্ত শারীরিক কষ্টের কারণে অনেক সময় অকালে মারা যেতো। কৈলাসবাসিনী দেবী বলেছেন, বিধবা নারীদের এরকম শারীরিক কষ্টের কারণ হল যাতে কোন পুরুষ বিধবা নারীর প্রতি আকৃষ্ট না হয়— এভাবে এসব কঠোর বিধি-বিধানকে তিনি বিধবা নারীদের সতীত্ব ধর্ম রক্ষার জন্য পিতৃতান্ত্রিক সমাজের অপকৌশল বলে আক্রমণ করেছিলেন। আবার প্রসন্নময়ী দেবী ততটা আক্রমণাত্মক না হলেও তিনি বিধবা নারীদের জন্যে বিশেষত বালবিধবা নারীদের জন্যে পুরুষতান্ত্রিক হিন্দু রক্ষণশীল সমাজের নির্ধারিত কঠোর ব্রত-অনুষ্ঠানকে মেনে নিতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে প্রসন্নময়ী দেবী *পূর্ব্বকথা-য়* বলেছেন—

> ‘‘হিন্দু রমণীর বৈধব্য জীবনের বিষয় বলিবার কিছু নাই; তাহা সকলেই অবগত আছেন। বিশেষত আমাদের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের ঘরের পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকা হইতে অশীতিবর্ষীয়া বৃদ্ধার সেই একই নিয়ম।”[২৭]

—এখানে প্রসন্নময়ী দেবী পিতৃতান্ত্রিক সমাজে বিধবাদের জন্যে নির্ধারিত কঠোর বিধানের সমালোচনা করেছেন। কেননা এই বিধান এতটাই কঠোর ছিল যে, এই কঠোর বিধানের হাত থেকে একজন বালবিধবারও রক্ষা নেই।

উনিশ শতকে এদেশের কুলীন নারীর জীবনের করুণ পরিণতির মূলে ছিল পিতৃতান্ত্রিক সমাজের সৃষ্ট কৌলীন্যপ্রথা। প্রসন্নময়ী দেবী *পূর্ব্বকথা*-য় সেকালের কৌলীন্যপ্রথার সমালোচনা করেছেন। সেকালে কৌলীন্যপ্রথা অনুসারে কুলীন পিতা অনেক সময় স্বঘরের উপযুক্ত কুলীন পাত্র না পেয়ে তার অল্পবয়সী কন্যাকে বিয়ে দিতো মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের সঙ্গে কাল্পনিক কুলমর্যাদা রক্ষার জন্য। এতে কুলীন নারীর জীবনে নেমে আসতো অকাল বৈধব্য এবং সমস্ত জীবন সেই কুলীন নারীকে পরের আশ্রয়ে অনাদর-অবহেলার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করতে হতো। আর কৌলীন্যপ্রথা অনুসারে যেহেতু কুলীন কন্যার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব কুলীন পাত্রের নিতে হতো না সেহেতু অনেক কুলীন পাত্র বরপণের লোভে বহুবিবাহকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিল। এভাবে কৌলীন্যপ্রথার ফলে কুলীন পিতার কাল্পনিক কুলমর্যাদা রক্ষার তাগিদে কন্যার জীবনের সর্বনাশ ঘটানো এবং বরপণের লোভে কুলীন পাত্রের বহুবিবাহ করার সমালোচনা করে প্রসন্নময়ী দেবী লিখেছেন—

> ‘‘কুলীনগণ পূর্ব্বে শতাধিক বিবাহ করিতেন, তাহা একপ্রকার ব্যবসাই ছিল। সেই নজিরানুসারে অতি বৃদ্ধ গঙ্গাযাত্রী কুলীন ব্রাহ্মণগণের সন্ধান পাইবামাত্র বয়স্থা কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা, পিতামহগণ সেই ব্যক্তির সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না, বৈতরণীর ঘাটে কন্যা দিয়া অন্তর্জ্জলী করিয়া যাইতেন।’’[২৮]

—এখানে কন্যাদায়গ্রস্ত কুলীন পিতার মৃত্যুপথযাত্রী কুলীন পাত্রের সঙ্গে কন্যার বিয়ে দেওয়া এবং মৃত্যুপথযাত্রী কুলীন পাত্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বেও বরপণের লোভে বিয়ে করার মানসিকতাকে আঘাত করতে চেয়েছেন প্রসন্নময়ী দেবী। তবে প্রসন্নময়ী দেবী সেকালের কুলীন নারীদের দুরবস্থা মোচনে কৌলীন্যপ্রথার অবসান ঘটানোর জন্যে প্রতিবাদ না করলেও সেকালের কুলীন পিতা ও কুলীন পাত্রের মানসিকতাকে ব্যঙ্গ করতে ছাড়েননি— সেকালের দিক থেকে এর গুরুত্ব কিন্তু কম নয়। সেকালের কুলীন পাত্রের টাকার লোভে বহুবিবাহ করার বিষয়টিকে আরও বিস্তৃতভাবে তুলে ধরেছেন নিস্তারিণী দেবী *সেকেলে কথা*-য়। তাঁর বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি, সেকালের

কুলীন পাত্রের টাকার লোভ কী অপরিসীম ছিল। কেননা কুলীন পাত্ররা একদিকে যেমন বিয়ের সময় কুলীন কন্যার কুল উদ্ধারের নামে প্রচুর টাকা বরপণ গ্রহণ করতো অন্যদিকে তেমনি যখনই তাদের টাকার অভাব হতো তখনই তারা শ্বশুরবাড়িতে যেতো টাকা আদায়ের জন্যে। আবার সেকালের নিয়ম অনুযায়ী কুলীন কন্যারা বিয়ের পরেও বাপের বাড়িতে থাকতো এবং তাদের কুলীন স্বামীরা বিয়ে করেই বরপণের লোভে বেরিয়ে পড়তো আরেকটি বিয়ে করার জন্যে। তাই কুলীন কন্যারা সাধারণত স্বামীসঙ্গ পেতো না। তবে যেসকল কুলীনের অর্থসঙ্গতি থাকতো শুধু তারাই তাদের কুলীন জামাইকে কন্যার কাছে এনে রাখতে পারতো। কেননা টাকা না পেলে কুলীন পাত্ররা শ্বশুরবাড়িতে থাকতে চাইতো না। কুলীন পাত্রদের এরকম মানসিকতার সমালোচনা করে নিস্তারিণী দেবী বলেছেন—

> ''জগদম্বার যে দিন স্বামী আসিল, সে গৃহপ্রবেশ করিবামাত্র পা-ধোয়ানির জন্য তাগিদ করিল— সে যে কুলীন! তার পা-ধোয়ানি, নমস্কারি, ভোজন-দক্ষিণা, এ সকল না দিলে, সে এরূপ শ্বশুরগৃহে পা ধুইবে না, নমস্কারি কাপড় না হইলে একরাত্রও বাস করিবে না, ভোজন-দক্ষিণা না পাইলে সে বাটীতে আর আহার করিবে না। সে তো বংশজ নহে— সে যে কুলীন!''[২৯]

—আবার সেকালের অনেক কুলীন পাত্র প্রচুর টাকা বরপণের লোভে ধনবান জমিদার বংশের অকুলীন কন্যাকেও বিয়ে করতো। কেননা সেকালে অনেক অকুলীন ধনবান জমিদাররা বংশের গৌরব বৃদ্ধির জন্যে তাদের কন্যার বিয়ে দিতে চাইতো কুলীন পাত্রের সঙ্গে। আর কৌলীন্যপ্রথার নিয়ম অনুসারে যেহেতু কুলীন হয়ে অকুলীন কন্যা বিয়ে করলে কুলীনের কুলভঙ্গ হয় সেহেতু প্রচুর টাকা বরপণ না পেলে কুলীন পাত্ররা কুলভঙ্গ করে অকুলীন কন্যাকে বিয়ে করতে রাজি হতো না। তাই অকুলীন ধনবান জমিদাররা বংশের গৌরব বৃদ্ধির জন্যে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে তাদের কন্যার সঙ্গে কুলীন পাত্রের বিয়ে দিতো। অর্থাৎ আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, কুলীন পাত্ররা শুধুমাত্র প্রচুর অর্থের লোভেই কুলভঙ্গ করে অকুলীন ধনবান জমিদারের কন্যাকে বিয়ে করতো— এই কুলভঙ্গ করে অকুলীন কন্যা বিয়ে করা কুলীনদের বলা হতো স্বকৃত ভঙ্গ। অথচ এসব অর্থলোভী কুলীনরা এমন ভাবভঙ্গি দেখাতো যে তারা শুধুমাত্র অকুলীন জমিদারদের কুলমর্যাদা বৃদ্ধির জন্যেই কুলভঙ্গ করে অকুলীন জমিদার কন্যাকে বিয়ে করে স্বকৃত ভঙ্গ হয়েছে। নিস্তারিণী দেবী নিজে কুলীন কন্যা ছিলেন বলে স্বকৃত ভঙ্গ কুলীনদের সম্পর্কে তাঁর সম্যক ধারণা ছিল। তাই তিনি স্বকৃত

ভঙ্গদের ব্যঙ্গ করেছেন—

> ''নিজের কুল ভাঙিয়া পরের মেয়ের বাপের কুলের উদ্ধার করিবার জন্য দৃঢ়ব্রত। আমাদের দেশের মধ্যে যাহারা নিজের ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং চৌমাথায় দাঁড়াইয়া অন্য সকলকে সেরূপ করিতে ডাকে, তাদের দেখিলেই আমার মনে হয়, তারা বুঝি স্বকৃত-ভঙ্গ! নইলে এত পরোপকারী লোক মনুষ্যসমাজে দেখা যায় না।''[৩০]

—এভাবে স্বকৃত ভঙ্গদের ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে নিস্তারিণী দেবী বোঝাতে চেয়েছেন যে, সেকালে কুলীন পাত্ররা শুধু কুলীন কন্যাদের জীবনই নয়, বরং অনেক অকুলীন কন্যার জীবনকেও দুর্বিষহ করে তুলেছিল। কেননা কুলীন পাত্ররা কখনই তাদের স্ত্রীদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিত না বলে তাদের স্ত্রীদের আজীবন পরের আশ্রয়ে থেকে অনেক অবহেলা-লাঞ্ছনা সহ্য করতে হতো।

উনিশ শতকে এদেশের অধিকাংশ নারী পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের কর্তৃত্বের তথা পুরুষের বঞ্চনা-প্রতারণার বিরুদ্ধে সরাসরি প্রতিবাদ না করলেও স্বল্পসংখ্যক নারী কিন্তু পরোক্ষভাবে হলেও প্রতিবাদ করেছেন— বিনোদিনী দাসীর *আমার কথায়* তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিনোদিনী দাসী থিয়েটার ভালোবাসতেন এবং থিয়েটারের প্রতি ভালোবাসার নিদর্শন হিসেবে তিনি গুর্মুখ রায় নামে এক মাড়োয়ারি যুবকের কাছে আত্মবিসর্জন দিয়ে *স্টার থিয়েটার* প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু এই আত্মবিসর্জন দেওয়ার বিনিময়ে তিনি পেয়েছেন শুধুই বঞ্চনা। যাদের জন্য তিনি আত্মবিসর্জন দিয়ে থিয়েটার তৈরি করেছিলেন পরবর্তীকালে তাঁরাই তাঁকে সেই থিয়েটার থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। আবার তাঁকে সেই থিয়েটারের স্বত্বাধিকারিণীও হতে দেননি তাঁর সহকর্মীরা— যা একজন নারীর ওপর পিতৃতান্ত্রিক সমাজের শোষণ-বঞ্চনারই নামান্তর। এভাবে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের শোষণ-বঞ্চনা-অবহেলার দ্বারা একের পর এক মানসিক আঘাত পেয়ে অভিনয় জীবনের সাফল্যের শিখরে থেকেও বিনোদিনী দাসী মাত্র চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সে অভিনয় জীবন থেকে অবসর নেন। এরপর তিনি আরো চুয়ান্ন বছর বাঁচলেও আর কোনদিন অভিনয় করেননি, যদিও তিনি নিয়মিত থিয়েটার দেখতেন। আসলে তিনি পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্যের তথা শোষণ-বঞ্চনা-প্রতারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্যেই অভিনয় জীবনের সাফল্যের শিখরে থাকাকালীন সময়েই অল্প বয়সে অভিনয় জীবন থেকে অবসর নিয়েছিলেন। অনেকে মনে করতে পারেন বিনোদিনী পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বঞ্চনা-প্রতারণার দ্বারা মর্মাহত হয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা যদি একটু অন্যভাবে

ভাবি তাহলে দেখব যে, বিনোদিনী দাসী পিতৃতান্ত্রিক সমাজের অন্যায়-প্রতারণাকে সহ্য করেননি। কেননা তিনি জানতেন, 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে/তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে'। তাই অল্পবয়সে অভিনয় জীবন থেকে অবসর নিয়ে তিনি পিতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রতারণা-বঞ্চনা, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে নিঃশব্দ প্রতিবাদ করে গেলেন— অনেকটা অহিংস আন্দোলনের মতো। এভাবে সেকালের জনপ্রিয় অভিনেত্রী বিনোদিনী দাসী হয়ে উঠলেন একটি প্রতিবাদী মুখ পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের আধিপত্যের বিরুদ্ধে।

উনিশ শতকে এদেশের নারীদের অন্তঃপুরে থেকে সাংসারিক কাজকর্ম করতে হতো— তারা অন্তঃপুরে একপ্রকার বন্দীজীবন যাপন করতো। কেননা তাদের অন্তঃপুর থেকে সাধারণত বাইরে বেরতে দেওয়া হতো না— তাদের কোনো স্বাধীনতা ছিল না। উনিশ শতকের এদেশের অধিকাংশ নারী স্বাধীনতা তথা স্বাধীনতার অর্থ সম্পর্কে সচেতন না হলেও স্বল্পসংখ্যক নারী এই অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে আসাকেই নারী অধিকার বা নারী স্বাধীনতা বলে মনে করতো। আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করেছি উনিশ শতকে এদেশের নারীদের অন্তঃপুরের আব্রুপ্রথাকে কঠোরভাবে মেনে চলতে হতো— নারীদের অন্তঃপুরে সর্বদা ঘোমটা দিয়ে কাজ করতে হতো, তাদের পুরুষের সামনে বের হওয়া কিংবা কথা বলা নিষিদ্ধ ছিল। সেকালের নারীরা শুধুমাত্র বছরে দু'-একবার বাপের বাড়ি যেতে পারতো— তাও নিশ্ছিদ্র পর্দার আবরণে। এদেশের নারীদের যখন অন্তঃপুরে বন্দী থেকে এরকম কঠোর আব্রুপ্রথাকে মেনে চলতে হতো তখন কৈলাসবাসিনী দেবী স্বামী কিশোরীচাঁদ মিত্রের কর্মসূত্রে স্বামীর সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং সেকালের নারী হিসেবে অনেকটাই স্বাধীনতা ভোগ করেছেন। নাটরে স্বামী যখন কর্মরত ছিলেন তখন তিনিও স্বামীর সঙ্গে সেখানে যান এবং সেখানে তিনি অন্য নারীদের সঙ্গে একত্রে বাগানে ভ্রমণ করার সুযোগ পান। তিনি এসময় মাঝে মাঝে স্বামীর সঙ্গেও ঘুরতে যেতেন এবং কখনো কখনো স্বামীর সঙ্গে তাসও খেলতেন। সেকালে অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে আসার স্বাধীনতা পেয়েই কৈলাসবাসিনী দেবী খুশি ছিলেন, তিনি *ডায়েরী* গ্রন্থে লিখেছেন—

> ''তাহাতে আমরা সুখি ছিলেম। তার কারণ য়েই জে আমরা স্ত্রীলোক আমাদের অন্তকরণ খুদুর, মন অল্প, কাজে কাজে অল্পতে তুষ্টু হই। অই স্বাধিনতায় আমরা তুষ্ট ছিলাম।''[৩১]

—সেকালের নারী হিসেবে কৈলাসবাসিনী দেবী এই অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে আসাকেই নারী

স্বাধীনতা বলে মনে করেছিলেন। কেননা সেকালে এদেশের নারীরা ছিল সম্পূর্ণ পরাধীন এবং তাদের কোনো অধিকার তখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। পরবর্তীকালে নানা সমাজ-সংস্কার আন্দোলন ও তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে নারীদের কিছুটা অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে পরবর্তীকালের নারীবাদী লেখিকাদের কাছে নারী স্বাধীনতার অর্থও পাল্টে যায়। তাই সাম্প্রতিককালের নারীবাদী লেখিকারা নারীদের অন্তঃপুর থেকে বাইরের জগতে বেরিয়ে আসাকেই নারী স্বাধীনতার পক্ষে যথেষ্ট মনে করেন না। কেননা নারী স্বাধীনতা বলতে যদি আমরা নারীমুক্তি বুঝি তাহলে শুধুমাত্র অন্তঃপুর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে নারীরা মুক্তি পায়নি, কেবলমাত্র অন্তঃপুরের চার দেওয়ালের বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়েছিল— নারীরা বাইরের জগতে বেরনোর সুযোগ পেলেও পারিবারিক-শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন থেকে তখনো নিষ্কৃতি পায়নি। এ প্রসঙ্গে সেলিনা হোসেন মন্তব্য করেছেন—

> ''এক সময় অন্তঃপুর নারীর শ্রেণিবৈষম্যও তৈরি করেছিল। এখন নারীর অন্তঃপুরের দরজা খুলেছে। কিন্তু এটুকু যথেষ্ট নয়। শুধু নারীর জন্য প্রযোজ্য এই শব্দটির অর্থের স্বরূপ বদলেছে মাত্র। এখন অন্তঃপুরের নারীরা পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হয়। ঘরগেরস্থির রাজনীতি বাংলা ভাষায় নারী-বৈষম্যের অবসান ঘটাতে এখনও সক্রিয় নয়।''[৩২]

— তবে এসব মনে রেখেও আমরা বলতে পারি যে, উনিশ শতকে এদেশের নারীরা যে অন্তঃপুরের বন্দীজীবন থেকে বাইরের জগতে বেরিয়ে আসার দুঃসাহস দেখিয়েছিল, তা নিঃসন্দেহে নারী স্বাধীনতার প্রথম সোপান তৈরি করেছিল।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারীদের বঞ্চিত করে রাখার জন্য যেসব কৌশল অবলম্বন করেছিল সেগুলির মধ্যে একটি অন্যতম কৌশল ছিল নারীদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে রাখা। সেজন্য তারা নানারকম বিধি-নিষেধ এবং কুসংস্কার প্রচলিত করেছিল। কাজেই উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এদেশের অধিকাংশ নারীকেই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এদেশের স্বল্পসংখ্যক নারী লেখাপড়া শিখতে চাইলেও সামাজিক বিধি-নিষেধ এবং রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের চাপে তাদের লেখাপড়া শেখা সম্ভব হয়নি। তাই রাসসুন্দরী দাসী শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে চোদ্দ বছর বয়সে লেখাপড়া শিখতে চাইলেও লেখাপড়া শিখতে পারেননি। নারী শিক্ষা বিষয়ে সেকালের রক্ষণশীল সমাজের মনোভাবের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে রাসসুন্দরী দাসী *আমার জীবন* নামক আত্মকথায় লিখেছেন—

> ''তখন মেয়েছেলে লেখাপড়া শিখিত না। তখনকার লোক বলিত, বুঝি কলিকাল উপস্থিত হইয়াছে দেখিতে পাই। এখন বুঝি মেয়েছেলেতেও পুরুষের কাজ করিবেক। এতকাল ইহা ছিল না, একালে হইয়াছে। এখন মাগের নামডাক, মিন্‌সে জড়ভারত, আমাদের কালে এত আপদ ছিল না। এখন মেয়ে রাজার কাল হইয়াছে। দিনে দিনে বা আর কত দেখিব! এখন যেমত হইয়াছে, ইহাতে আর ভদ্রলোকের জাতি থাকিবে না। এখন বুঝি সকল মাগিরা একত্র হইয়া লেখাপড়া শিখিবে।''[৩৩]

—সেকালে একদিকে যেমন পিতৃতান্ত্রিক রক্ষণশীল সমাজ নারীদের লেখাপড়া শিখতে দিতে চাইতো না অন্যদিকে তেমনি নানা কারণে নারীরাও লেখাপড়া শেখার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিল। তবে সেকালে রাসসুন্দরী দাসী লেখাপড়া শেখার সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন— তিনি পুরুষদের মতো শিক্ষার অধিকার পেতে চেয়েছিলেন এবং কীভাবে লেখাপড়া শেখা যায় সর্বদা সেই চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। এবং সেকালে নারীদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখার বিষয়ে তিনি বলেছেন—

> ''তখন আমাদিগের দেশের সকল আচার-ব্যবহারই বড়ো মন্দ ছিল না, কিন্তু এই বিষয়টি ভারী মন্দ ছিল। সকলেই ছেলেমেয়েকে বিদ্যায় বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তখনকার মেয়েছেলেগুলো নিতান্ত হতভাগা, প্রকৃত পশুর মধ্যে গণনা করিতে হইবেক।''[৩৪]

—অর্থাৎ লেখাপড়া না শিখলে মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় না বলে এদেশের নারীরা যে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে মানুষ হয়েও পশুর মতোই জীবন-যাপন করছে— সে বিষয়ে রাসসুন্দরী দাসী সচেতন ছিলেন। আমরা জানি, লিবারেল নারীবাদ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এ মতবাদ অনুসারে প্রত্যেকটি মানুষ স্বাধীনসত্তা বলে তারা নিজেদের ইচ্ছে-অনিচ্ছে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়— সমাজের বিধি-নিষেধের চাপে তারা নিজেদের ইচ্ছে-অনিচ্ছেকে নিয়ন্ত্রণ করে না। এছাড়া লিবারেল নারীবাদ নারী অধিকারের বিষয়টিকেও গুরুত্ব দিয়েছে। এদিক থেকে যদি আমরা রাসসুন্দরী দাসীকে দেখি তাহলে দেখব রাসসুন্দরী দাসীও একজন স্বাধীনসত্তা হিসেবে লেখাপড়া শিখতে চেয়েছিলেন। সেকালের অধিকাংশ নারী যখন পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বিধি-নিষেধের চাপে নিজেদের লেখাপড়া শেখার ইচ্ছেকে নিয়ন্ত্রিত করেছে তখন রাসসুন্দরী দাসী নিজের লেখাপড়া শেখার ইচ্ছেকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বিধি-নিষেধের চাপে বিসর্জন দেননি বলেই তিনি নিজের চেষ্টায় পঁচিশ

বছর বয়সে পড়তে শিখেছিলেন এবং পঞ্চাশ বছরের অধিক বয়সে লিখতে শিখেছিলেন। আর এই লেখাপড়া শেখাকে তিনি নারীর অধিকার বলেই মনে করতেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রাসসুন্দরী দাসী যখন *আমার জীবন* লিখতে শুরু করেন তখন এদেশের সমাজে নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে নারী শিক্ষার বিষয়টি মোটামুটিভাবে স্বীকৃত হয়েছে। আর এই নারী শিক্ষা যে নারীদের স্বাধীনতার আস্বাদ দিতে পারে সে সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—

> ''... এখনকার মেয়েছেলেগুলো যে নিষ্কণ্টকে স্বাধীনতায় আছে, তাহা দেখিয়াও মন সন্তুষ্ট হয়। এখন যাহার নিকটে মেয়েছেলে আছে, সে কত যত্ন করিয়া লেখাপড়া শিখায়। এই লেখাপড়া শিখিবার জন্য আমাদের কষ্ট হইয়াছে।''[৩৫]

লিবারেল বা উদার নারীবাদীদের সম্পর্কে হুমায়ুন আজাদ মন্তব্য করেছেন—

> ''নারীপুরুষের কোনো বৈষম্যকে তাঁরা প্রাকৃতিক বলে মনে করেন না, মনে করেন সমাজের সৃষ্টি এবং শিক্ষা আরো বাড়িয়েছে ওই বৈষম্য। তাই নারীপুরুষকে দিতে হবে একই শিক্ষা, যাতে তারা তাদের শক্তি ও সম্ভাবনা যাচাই করতে পারে।''[৩৬]

—আসলে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ যুগ যুগ ধরে পুরুষকে উৎকৃষ্ট ও নারীকে নিকৃষ্ট হিসেবে বিবেচনা করেছে এবং পুরুষকে জীবিকার্জনের স্বাধীনতা দিলেও নারীর ওপর চাপিয়ে দিয়েছে সন্তান পালন ও সাংসারিক কাজ-কর্মের দায়িত্ব। ছেলেবেলা থেকে কন্যাসন্তানকে তার পরিবার নারীত্বের গুণাবলী তথা সাংসারিক কাজকর্ম, শিল্পকর্ম, বেশভূষা ইত্যাদির শিক্ষা দেয় এবং কন্যাসন্তানকে দুঃসাহসিক কাজ-শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখে। ফলে ছেলেবেলা থেকে কন্যাসন্তান মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং নিজের ক্ষমতা ও সাহস সম্পর্কে সচেতন থাকে না। স্বাভাবিকভাবে ছেলেবেলা থেকেই কন্যাসন্তান তথা নারীও নিজেকে পুরুষের তুলনায় নিকৃষ্ট বলে মনে করতে থাকে। নারীদের এরকম মনোভাবের বর্ণনা দিতে গিয়ে হুমায়ুন আজাদ লিখেছেন—

> ''তারা নিজেদের ঘেন্না ও অবজ্ঞা করে, ও নিজের শ্রেণীকে অবজ্ঞা করে। কয়েক হাজার বছর ধ'রে শুনে আসছে তারা নিকৃষ্ট, দেখে আসছে তাদের নিকৃষ্ট অবস্থান; তাই তারাও মনে করে নিজেদের নিকৃষ্ট।''[৩৭]

—নারীরা এভাবে নিজেদের নিকৃষ্ট মনে করায় এবং তাদের জীবিকার্জনের স্বাধীনতা না থাকায় তারা বিয়ের মাধ্যমে পুরুষের অধীনতা স্বীকার করে। আর পুরুষদের শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করে ছেলেবেলা থেকে সকল বিষয়ে স্বাধীনতা দেওয়ায় পুরুষরা পরবর্তীকালে নিজেদের শ্রেষ্ঠ বলে গর্ববোধ করে

এবং নারীদের কখনো নিজেদের সমকক্ষ বলে মনে না করে অবহেলা করে, অপমান করে। কৃষ্ণভাবিনী দাসী নারীদের এই পরাধীনতা-বঞ্চনার কারণ সম্পর্কে *ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা* গ্রন্থে বলেছেন—

> ''হিন্দু রমণীদের বিলক্ষণ তেজ ও সাহস ছিল, এখনও আছে, কিন্তু কেবল স্বাধীনতা ও শিক্ষার অভাবে আমরা উহার পরিচয় দিতে পারি না। পুরুষদের তাচ্ছিল্য ও সামাজিক কুসংস্কারই হিন্দুস্ত্রীদের হীনাবস্থা ও সকল অমঙ্গলের কারণ। তেজ, সাহস ইত্যাদি কঠিন গুণ থাকিলেই যে কোমল গুণ হারাইতে হয়, এরূপ বিবেচনা করা নিতান্ত ভ্রম।''[৩৮]

—এখানে কৃষ্ণভাবিনী দাসী পিতৃতান্ত্রিক সমাজের লিঙ্গ বৈষম্যকে এদেশের নারীর পরাধীনতা ও বঞ্চনার কারণ হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন।

উনিশ শতকেও এদেশের অধিকাংশ নারীই নিজেদের ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে সচেতন ছিল না— নারীদের এই ব্যক্তিসত্তার অসচেতনতাই নারীদের পরাধীনতার কারণ। কৃষ্ণভাবিনী দাসীর মতে, এদেশের নারীরা দীর্ঘদিন পুরুষের অধীনে পরাধীন জীবন-যাপন করায় তারা মানসিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং তারা তাদের ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে হয়ে উঠেছিল উদাসীন। ফলে এদেশের নারীরা পুরুষদের সমান অধিকার আদায়ের জন্যে পুরুষদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। এ প্রসঙ্গে কৃষ্ণভাবিনী দাসী *ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা* গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন—

> ''শিক্ষিত বঙ্গযুবকেরা উপাধিগ্রহণে ব্যস্ত ও নিজ নিজ সুখ অন্বেষণে রত; পিঞ্জরাবদ্ধা বঙ্গবাসিনীদের নিঃশব্দ অশ্রুপাত তাঁহাদের চক্ষু আকর্ষিতে অক্ষম। ... আজ যদি আমরা স্ত্রীলোকের অবলা ও নম্র নাম বিসর্জ্জন দিয়া, অন্তরের বেগ গোপনে না রাখিয়া তাঁহাদের সম্মুখে চিৎকার স্বরে কোলাহল করিতাম; তাহা হইলে হয়তো বঙ্গবাসীদের কর্ণ আমাদের যন্ত্রণারবে আকৃষ্ট হইত। কিন্তু আমরা বহুদিন পরাধীনা থাকিয়া স্বাধীন জীবনের সমস্ত তেজ ও শক্তি হারাইয়াছি, সেই জন্যই আমরা এখন ইংরাজমহিলাদের ন্যায় সকল বিষয়ে পুরুষের সমকক্ষ হইবার জন্য প্রাণপণ শক্তিতে চেষ্টা করিতে অপারগ।''[৩৯]

—আসলে শৈশবকালেই পরিবারের মধ্যে নারীদের ব্যক্তিস্বাধীনতার বিনাশ ঘটানো হয়। ফলে পুরুষদের মতো নারীরা সমাজে তাদের ভূমিকা নির্ধারণের সুযোগ পায় না। কাজেই পুরুষদের ওপর নির্ভর করে নারীদের পরাধীন জীবন-যাপন করতে হয়। আর দীর্ঘদিন পরাধীনতার ফলে

নারীদের মনে একটা হীনম্মন্যতা তৈরি হয় এবং নারীরা তাদের ব্যক্তিসত্তার ক্ষমতা সম্পর্কে অসচেতন হয়ে ওঠে। এভাবে নারীরা পরাধীনতার শোষণ-বঞ্চনাকে তাদের নিয়তি মনে করে অধিকার আদায়ের শক্তি হারিয়ে ফেলে। এখানে কৃষ্ণাভাবিনী দাসী নারীদের পরাধীনতার কারণ হিসেবে নারীদের ব্যক্তিসত্তার অসচেতনতাকেই দায়ী করেছেন।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে দীর্ঘকাল ধরে নারীদের অবৌদ্ধিক সত্তা এবং পুরুষদের বৌদ্ধিক সত্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। একটু আগেই আমরা আলোচনা করেছি যে, দীর্ঘদিন ধরে এধরনের ভাবনা প্রচলিত থাকায় নারীরা নিজেদেরকেও নিকৃষ্ট ভেবেছে। তাই লিবারেল নারীবাদীরা নারীদের ব্যক্তিসত্তা তথা নারীদের ব্যক্তিত্বের জাগরণে গুরুত্ব দিয়েছেন— যাতে নারীরা নিজেদের ব্যক্তিসত্তার মূল্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে পারে। উনিশ শতকে এদেশের কিছু নারী তাঁদের ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। এ প্রসঙ্গে রাসসুন্দরী দাসী, কৃষ্ণভাবিনী দাসী, আমোদিনী দাশগুপ্ত প্রমুখদের কথা আমরা আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছি। রাসসুন্দরী দাসীর পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল— কোনো ক্ষেত্রেই নারী শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ ছিল না। তা সত্ত্বেও পরবর্তীকালে তিনি নানা বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় শুধু লেখাপড়াই শেখেননি, নিজের জীবনের কথাও লিখে গেছেন *আমার জীবন* গ্রন্থে— যা বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রকাশিত আত্মজীবনীর গৌরব লাভ করেছে। একজন ব্যক্তি হিসেবে তাঁর জীবনকথারও যে মূল্য আছে, সেই ভাবনা থেকেই রাসসুন্দরী দাসী আত্মজীবনী লিখেছেন। অথচ তাঁর সমকালে এদেশের অনেক নারী লেখাপড়া শেখার উপযুক্ত পরিবেশ পেয়েও লেখাপড়া শেখেননি, কিংবা লেখাপড়া শিখলেও নিজেদের জীবনকথা লেখার কথা ভাবেননি। এ প্রসঙ্গে গোলাম মুরশিদ বলেছেন—

> ''রাসসুন্দরী দেবীর দৃষ্টান্ত আরও প্রাসঙ্গিক। যে রকমের ঐতিহ্যিক পরিবারের সন্তান এবং বধূ ছিলেন তিনি, তাতে তাঁর পক্ষে প্রথম বাংলা আত্মজীবনী লিখতে পারা, অতি অসাধারণ— প্রায় অবিশ্বাস্য ব্যাপার। কিন্তু কার্যকালে সেটাই ঘটেছিলো। তাঁর চেয়ে বেশি উদার হাওয়ায় যাঁরা মানুষ হয়েছিলেন অথবা বিয়ের পরে বাকি জীবন বাস করেছিলেন, তাঁরা কেউ প্রথম আত্মজীবনী লেখার কৃতিত্ব দাবি করতে পারেননি।''[৪০]

—আসলে রাসসুন্দরী দাসী নিজের ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই লেখাপড়া শিখে নিজের জীবনের কথাও লিখেছেন। আবার উনিশ শতকে এদেশের অধিকাংশ নারী যেখানে বিয়ের

মাধ্যমে শ্বশুরবাড়ির সাংসারিক কাজকর্মের মধ্যে আবদ্ধ হওয়াকে তাদের নিয়তি বলে মনে করতো সেখানে রাসসুন্দরী দাসী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ থেকেই নারীদের শ্বশুরবাড়ির পরাধীন জীবনকে খাঁচার বদ্ধ পাখির সঙ্গে তুলনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে রাসসুন্দরী দাসী *আমার জীবন* গ্রন্থে লিখেছেন—

> ''তখনকার সেই এককাল ছিল; সেকালে মেয়েছেলেদিগের স্বাধীনতা মোটেই ছিল না। নিজের ক্ষমতায় কোনো কর্মই করিতে পারা যাইত না, সম্পূর্ণরূপে পরাধীনা হইয়া কালযাপন করিতে হইত। সে যেন এককালে পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গীর মতো থাকা হইত।''[৪১]

—আবার নিজের কথা বলতে গিয়ে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, বারো বছর বয়সে বিয়ে হওয়ার পর থেকে তিনি পিত্রালয়ের সকলের স্নেহ-মায়া-মমতা থেকে বঞ্চিত হয়ে শ্বশুরবাড়িতে পরাধীন জীবন-যাপন করেছেন। উনিশ শতকে রাসসুন্দরী দাসীর মতো কৃষ্ণভাবিনী দাসীও তাঁর ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। সেকালে কৃষ্ণভাবিনী দাসী যেরকম প্রগতিশীল স্বামী পেয়েছিলেন, তা সেকালে অধিকাংশ নারী না পেলেও স্বল্পসংখ্যক নারী যে পেয়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কেননা সে সময় পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে এদেশের অনেক নব্য শিক্ষিত পুরুষ প্রগতিশীল হয়ে উঠেছিলেন। আবার এদেশের সাধারণ নারীদের মতো কৃষ্ণভাবিনী দাসীও ইংল্যাণ্ড যাত্রার পূর্বে শ্বশুরবাড়িতে অন্দরমহলে বন্দীজীবন যাপন করেছিলেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও যে সময় পুরুষদেরই বিদেশ যাত্রা হিন্দু রক্ষণশীল সমাজে নিষিদ্ধ ছিল সেসময় কৃষ্ণভাবিনী দাসী স্বামীর সঙ্গে বিদেশে গিয়েছিলেন— যা সেকালের অধিকাংশ নারীর পক্ষেই কল্পনাতীত ছিল। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, কৃষ্ণভাবিনী দাসী প্রথম থেকেই নিজের ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং অন্দরমহলের বন্দীজীবন থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের জগতে একজন পুরুষের সমান স্বাধীন জীবন যাপন করতে চেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি ইংলণ্ডে *বঙ্গমহিলা* গ্রন্থে লিখেছেন—

> ''পাঠিকাগণ! আমিও আপনাদের ন্যায় একটি বাড়িতে বদ্ধ ছিলাম; দেশের, পৃথিবীর কোনো বিষয়ের সহিত সম্পর্ক ছিল না; সামান্য গুটিকতক জিনিসে মনকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিতাম কিন্তু পারিতাম না। দেশের সমস্ত ব্যাপার উত্তমরূপে জানিবার নিমিত্ত লালায়িত হইতাম, এবং কেহ বিলেত যাইতেছেন কিংবা কেহ বিলেত হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন শুনিলেই মন নাচিয়া উঠিত, বিদেশ হইতে প্রত্যাগত ব্যক্তিদের নিকটে গিয়া বিদেশ সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার নতুন

বিষয় শুনিবার জন্য ব্যস্ত হইতাম।"[৪২]

—আবার সেকালে আমোদিনী দাশগুপ্তও ছিলেন একজন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময়ী নারী— যিনি নিজের ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। আমোদিনী দাশগুপ্তের স্বামীর কাছে পড়তে আসা এক ছাত্রের সঙ্গে আমোদিনীর অবৈধ সম্পর্কের অপপ্রচারে বিশ্বাস করে আমোদিনীর সঙ্গে কথা বলা প্রায় বন্ধই করে দিয়েছিলেন তাঁর স্বামী। এ প্রসঙ্গে আমোদিনী দাশগুপ্ত *আমার জীবন-কাহিনি* গ্রন্থে বলেছেন, এ ঘটনার পূর্বে তিনি সেকালের রীতি অনুযায়ী স্বামীকে দেবতার মতো মনে করে স্বামীর চরণামৃত খেতেন। কিন্তু স্বামী যখন তাঁকে বিনা কারণে অবিশ্বাস করে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিলেন তখন তিনি পূর্বের মতো স্বামীর চরণামৃত খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আবার তিনি যেহেতু কোনো দোষ করেননি সেহেতু স্বামী কথা বলা বন্ধ করলে তিনিও উপযাচিকা হয়ে স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে যাননি। তাঁর ভাষায়—

> "আগে আমি প্রতিদিন ভাত খাইবার পূর্বে স্বামীর চরণামৃত খাইতাম। কিন্তু স্বামীর এই মৌন ভাব আরম্ভ হইবার পরে আমি চরণামৃত খাইতাম না। কারণ স্বামীর ভাবে আমার মনেরও অভিমান হইয়াছিল। মনে করিতাম স্বামী না ডাকিলে আমিও কথা বলিব না।"[৪৩]

— এথেকে আমরা বুঝতে পারি আমোদিনী দাশগুপ্ত তাঁর ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে ক্রমে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। তাই তিনি তাঁর ব্যক্তিসত্তার অপহ্নব যাতে না ঘটে সেজন্য স্বামী কথা বলা বন্ধ করে দিলে তিনিও স্বামীর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেননি।

উদার নারীবাদ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে হুমায়ুন আজাদ *নারীবাদ* প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন—

> "উদার নারীবাদে সাম্য হচ্ছে প্রতিটি নারী ও পুরুষের নিজের ইচ্ছে ও শক্তি অনুসারে নিজের ভূমিকা বেছে নেয়ার অধিকার; স্বাধীনতা হচ্ছে নারীর নিজের ইচ্ছেমতো ভূমিকা অর্জনের পথে কোনো বাধা না থাকা।"[৪৪]

— এর মধ্য দিয়ে নারী লাভ করবে পুরুষের সমকক্ষতা। ফলে নারী আর পুরুষের ওপর নির্ভর করবে না— নারী পুরুষতান্ত্রিক অধীনতা থেকে মুক্তি লাভ করবে । কামিনী রায় এরকম নারী-পুরুষের সমকক্ষতায় বিশ্বাস করতেন। তিনি *শ্রাদ্ধিকী* গ্রন্থে জানিয়েছেন, তাঁর পিতা চণ্ডীচরণ সেন নারীদের উচ্চ শিক্ষার সমর্থক ছিলেন বলে তাঁর মেয়েদের তথা কামিনী-যামিনীকে উচ্চ শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু চণ্ডীচরণ মেয়েদের ডাক্তারি পেশাকে পছন্দ করতেন না বলে মেয়ে কামিনী রায় যখন নিজেকে

প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে ডাক্তারি পড়তে চান তখন তিনি কামিনী রায়কে ডাক্তারি পড়তে দেননি— কাজেই কামিনী রায়ের ডাক্তারি পড়া আর হয়নি। এক্ষেত্রে কামিনী রায় নিজের ইচ্ছে ও শক্তি অনুযায়ী ডাক্তারি পেশাকে নির্বাচন করলেও পিতার বাধার কারণে তা সফল হয়নি। তবে কামিনী রায় নিজের ভূমিকা স্থির করার স্বাধীনতা না পেলেও পরবর্তীকালে যখন তাঁর বোন যামিনী নিজের ইচ্ছে ও শক্তি অনুযায়ী ডাক্তারি পেশাকে নির্বাচন করে ডাক্তারি পড়তে চেয়েছিলেন তখন তিনি পিতাকে রাজি করিয়েছিলেন যামিনীকে ডাক্তারি পড়ানোর জন্যে— এক্ষেত্রে যামিনী নিজের ইচ্ছে ও শক্তি অনুযায়ী নিজের ভূমিকা স্থির করেছিলেন এবং কামিনী রায় বোন যামিনীর ভূমিকা অর্জনের পথে কোনোরকম বাধার সৃষ্টি হতে দেননি। কেননা কামিনী রায় বিশ্বাস করতেন পুরুষদের মতো নারীরাও সমস্ত কাজ করতে সক্ষম।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি উনিশ শতকে এদেশের পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীদের অবস্থান, তাদের পরাধীনতা, শোষণ, বঞ্চনা এবং নারীদের এই পরাধীনতা, শোষণ, বঞ্চনার কারণ প্রভৃতি বিষয়কেই আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলিতে লেখিকারা বেশি করে তুলে ধরেছেন। কেননা তাঁরা নিজেরাও পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পরাধীন জীবন-যাপন করে পুরুষের শোষণ, বঞ্চনার শিকার হয়েছেন এবং সেই জীবন-অভিজ্ঞতাকেই তাঁরা আত্মকথায় তুলে ধরেছেন। আর পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীদের পরাধীন জীবন, শোষণ-বঞ্চনার শিকার হওয়া এবং সেগুলির কারণ অনুসন্ধানও নারীবাদের একটা উদ্দেশ্য— এই দিকটিই আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলিতে উঠে এসেছে। এছাড়া রাসসুন্দরী দাসী, কৃষ্ণভাবিনী দাসী, কামিনী রায়, আমোদিনী দাশগুপ্ত প্রমুখরা নিজেদের ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে সচেতন হয়ে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের সনাতন ঐতিহ্যকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে উনিশ শতকে যে নারীবাদী ভাবনার সূত্রপাত করেছিলেন, তাই বিশ শতকে এদেশের নারীবাদী লেখিকাদের হাতে পূর্ণতা পেয়েছিল। অর্থাৎ আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলির লেখিকারা তথাকথিত নারীবাদী লেখিকা না হলেও এঁদের লেখার মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে নারীবাদী ভাবনার সূত্রপাত হয়েছিল, তা কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। কেননা আমরা জানি, কোনোকিছুই একদিনে হঠাৎ করে সৃষ্টি হয় না— তার পেছনে থাকে এক সুদীর্ঘ অলিখিত প্রেক্ষাপট। তাই কোনো কিছু সৃষ্টিতে তার পূর্ব প্রেক্ষাপটটিকেও অস্বীকার করা যায় না। আর সেজন্যই এদেশের নারীবাদী লেখিকাদের রচনা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তার পূর্ব প্রেক্ষাপট হিসেবে যদি আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলিতে লেখিকাদের সচেতন-অসচেতন নারীবাদী ভাবনাকে আমাদের আলোচনার

অন্তর্ভুক্ত করি তাহলে বোধ হয় অসমীচীন হবে বলে মনে হয় না। বিশ শতকে এদেশের লেখিকারা তাঁদের রচনায় যে নারীবাদকে তথা নারী স্বাধীনতাকে প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন— তার পূর্বসূরী হিসেবে আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল যে, নারীবাদের মূল লক্ষ্য হল নারীর ব্যক্তিসত্তার জাগরণের মধ্য দিয়ে লিঙ্গসমতার ভিত্তিতে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা। আর এই নারী স্বাধীনতার জন্যে স্বাধীন ভারতের সংবিধানের বিভিন্ন ধারায় নারীদের সকল বিষয়ে সমান সুযোগলাভ, একই কাজের জন্যে সমান বেতন ইত্যাদির অধিকার দেওয়া হয়েছে এবং ভারতীয় সংবিধান কেন্দ্রীয় লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাগুলিতে ১/৩ ভাগ আসন সংরক্ষণ করেছে নারীদের জন্যে। তবে ভারতের সংবিধান নারী ও পুরুষের সমান অধিকারের স্বীকৃতি দিলেও বাস্তবে দেখা যায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক নানা কারণে নারীরা সকল ক্ষেত্রে সমান অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল এবং নানারকম শোষণ-নির্যাতনের শিকার হচ্ছিল। সেকারণে নারীদের সুরক্ষার দিকে লক্ষ রেখে ভারত সরকার পতিতাবৃত্তির জন্যে নারীপাচার বন্ধ করতে ১৯৫৬ সালে নারীপাচার নিয়ন্ত্রণ আইন, পণপ্রথা বন্ধ করার জন্যে ১৯৬১ সালে পণপ্রথা রদ আইন, কন্যাভ্রূণ হত্যা নিবারণের জন্যে ১৯৯৯ সালে ভ্রূণহত্যা সম্পর্কিত আইন প্রভৃতি প্রণয়ন করে। এছাড়া ভারতীয় নারীদের ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে ১৯৯২ সালের ৩১ জানুয়ারি গঠন করা হয়েছে *জাতীয় মহিলা কমিশন*, ২০০১ সালে গঠন করা হয়েছে *National Policy for the Empowerment of Women*, ২০১০ সালের ৮ মার্চ নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রকের অধীনে চালু হয় *National Mission for Empowerment of Women* ইত্যাদি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজও আমরা দেখি নারীরা হামেশাই ধর্ষিতা হচ্ছে, অ্যাসিড আক্রান্ত হচ্ছে, শ্বশুরবাড়িতে শারীরিক ও মানসিকভাবে অত্যাচারিত হয়ে কখনো কখনো আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছে, আবার কখনো শ্বশুরবাড়ির লোকেরাই নারীকে পুড়িয়ে মারছে। এসব দেখে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে সত্যি কি আমাদের দেশের নারীরা স্বাধীন হয়েছে? হয়নি, কেননা একদিকে যেমন নারীরা সমাজে পুরুষদের দ্বারা লাঞ্ছিত-বঞ্চিত হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি এদেশের অনেক নারী সচেতন কিংবা অসচেতনভাবে নিজেদের পুরুষদের তুলনায় নিকৃষ্ট মনে করছে। তাই আমরা দেখি আজও অনেক গৃহবধূ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে স্বামীর কোনো কৃতিত্বে স্বামী গরবে গরবিনী হয়ে সেকথা মনোমুগ্ধকর ভাষায় লিখে ফেসবুকে শেয়ার করছে— বন্ধুদের কাছে নিজেকে শ্রেষ্ঠ পুরুষের স্ত্রী হিসেবে পরিচিত করে বাহবা পেতে চাইছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে নারী নিজেই তার স্বামীর স্ত্রী হিসেবে নিজেকে পরিচিত

করতে চাচ্ছে— যেন তার নিজস্ব স্বতন্ত্র কোনো পরিচয়ই নেই। তবে ধীরে ধীরে এদেশের নারীরা তাদের ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে এবং অনেকেই স্বামীর ওপর নির্ভর না করে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করছে। তবে এ ধরনের নারীদের সংখ্যা আজও খুবই কম। আর এই স্বল্পসংখ্যক নারী কখনই এদেশের ব্যাপক নারী সমাজের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। তাই যেদিন এদেশের অধিকাংশ নারী তাদের ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠবে এবং নিজেদের স্বাবলম্বী করতে পারবে, সেদিনই এদেশের নারীরা যথার্থ স্বাধীনতা পাবে— অন্তত নারীবাদীরা তো সেরকমই মনে করেন। আর সেদিকেই আমরা তাকিয়ে থাকব।

তথ্যসূত্র:

১. মুরশিদ গোলাম : রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া : নারীপ্রগতির একশো বছর, অবসর, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ: নভেম্বর ২০১৮, পৃ. ১৪

২. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১৮৬

৩. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, চতুর্থ খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ১৪৫

৪. প্রাগুক্ত : পৃ. ২২৩

৫. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, পঞ্চম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ২৬

৬. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩০

৭. প্রাগুক্ত : পৃ. ৪৬

৮. বোভোয়ার সিমোন দ্য : দ্বিতীয় লিঙ্গ, অনুবাদ-কঙ্কর সিংহ,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১৩

৯. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, চতুর্থ খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ২২৯

১০. ভাদুড়ী তন্দ্রিতা : পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায়: পুরুষের স্বৈরতান্ত্রিক বিশ্লেষণে নারী, রিডার্স সার্ভিস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ২৬ জানুয়ারি ২০০৫, পৃ. ২১৫

১১. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৮০, ৮১

১২. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৮৫

১৩. বোভোয়ার সিমোন দ্য : দ্বিতীয় লিঙ্গ, অনুবাদ-কঙ্কর সিংহ, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৭৩

১৪. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ২১০

১৫. প্রাগুক্ত : পৃ. ৯৫, ৯৬

১৬. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, চতুর্থ খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৬৩

১৭. বোভোয়ার সিমোন দ্য : দ্বিতীয় লিঙ্গ, অনুবাদ- কঙ্কর সিংহ, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১৬৩

১৮. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১৬৩

১৯. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩২৬

২০. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, চতুর্থ খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ১৬১

২১. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১২৪

২২. বোভোয়ার সিমোন দ্য : দ্বিতীয় লিঙ্গ, অনুবাদ-কঙ্কর সিংহ, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১৫

২৩. ভাদুড়ী তন্দ্রিতা : পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায়: পুরুষের স্বৈরতান্ত্রিক বিশ্লেষণে নারী, রিডার্স সার্ভিস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ২৬ জানুয়ারি ২০০৫, পৃ. ৬০

২৪. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ২২৭

২৫. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৩৭

২৬. প্রাগুক্ত : পৃ. ১১৩

২৭. প্রাগুক্ত : পৃ. ২২৬

২৮. প্রাগুক্ত : পৃ. ২৮৪

২৯. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, তৃতীয় খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৫৫

৩০. প্রাগুক্ত : পৃ. ৫৫

৩১. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১৯১

৩২. হোসেন সেলিনা : নারীবিশ্ব, সম্পাদনা-বরেন্দু মণ্ডল, অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ৫০

৩৩. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৯২

৩৪. প্রাগুক্ত : পৃ. ৯৬

৩৫. প্রাগুক্ত : পৃ. ৯৯

৩৬. রহমান হাবিব আর (সংকলন ও সম্পাদনা) : পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব : ধ্রুপদী ও আধুনিক, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ: ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃ. ৩৭৩

৩৭. আজাদ হুমায়ুন : নারী, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ চতুর্বিংশ মুদ্রণ: মার্চ ২০১৭, পৃ. ৪১

৩৮. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৭৮

৩৯. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৪৫

৪০. মুরশিদ গোলাম : রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া: নারীপ্রগতির একশো বছর, অবসর, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ: নভেম্বর ২০১৮, পৃ. ১৫

৪১. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১০৫

৪২. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১১

৪৩. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, পঞ্চম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৪৮

৪৪. রহমান হাবিব আর (সংকলন ও সম্পাদনা) : পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব : ধ্রুপদী ও আধুনিক, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ: ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃ. ৩৭৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

নারীর আত্মকথায় উনিশ শতক : আধ্যাত্মিক ভাবনা

মানব সমাজে ধর্মের উৎপত্তি ঠিক কোন্ সময়ে হয়েছিল তা বলা অসম্ভব হলেও প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই ধর্ম যে মানব সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা ধর্ম সম্পর্কে ধারণা প্রায় সকল আদিম মানব সমাজেই বিদ্যমান ছিল। তাই ম্যাক্সমূলারের মতে, মানুষের ইতিহাস হল প্রকৃতপক্ষে ধর্মের ইতিহাস। এখন ধর্ম বিষয়ে আলোচনার পূর্বে ধর্ম শব্দের অর্থ এবং ধর্মের সংজ্ঞা বিষয়ে আলোকপাত করা যাক। ইংরেজি *Religion*-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে *ধর্ম* শব্দটি প্রচলিত হলেও দুটি শব্দের তাৎপর্য কিন্তু এক নয়। ইংরেজি *Religion* শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ *Re* এবং *Ligare* থেকে। ল্যাটিন শব্দ *Re* -এর অর্থ *পশ্চাৎ* এবং *Ligare*-এর অর্থ *নিয়ে যাওয়া*। অর্থাৎ দৃশ্যমান জগতের পশ্চাতে যা নিয়ে যায় কিংবা যা আমাদের ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায় তাই *Religion*। তবে বাংলা শব্দ *ধর্মের* ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করলে আমরা পাই— *√ধৃ + মন্ = ধর্ম*। *ধৃ* ধাতুর অর্থ *ধারণ করা*। আর এই *ধৃ* ধাতু থেকে ধর্ম শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। কাজেই ধর্ম বলতে আমরা বুঝি যা কোনো কিছুর অস্তিত্বকে অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্বকে ধারণ করে থাকে। এই ধর্মকে বিভিন্ন জন বিভিন্ন ভাবে বিশ্লেষণ করায় ধর্মের সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। যেমন— ম্যাক্সমূলারের মতে, ধর্ম হল এমন এক ধরনের মানসিক প্রবণতা যা আমাদের অসীমকে উপলব্ধি করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করে। *Oxford Dictionary*-তে বলা হয়েছে— ধর্ম হল মানুষের পক্ষে কোন উচ্চতর অদৃশ্য শক্তির অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেওয়া, যে শক্তি মানুষের অদৃষ্টের নিয়ন্তা এবং যে শক্তি মানুষের শ্রদ্ধা, আনুগত্য ও পূজা পাওয়ার অধিকারী। ধর্ম সম্পর্কে ডি মায়াল এডোয়ার্ডস্ বলেছেন—

> ''ধর্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাইরে একটি অফুরন্ত অপার্থিব শক্তির অস্তিত্ব অনুমান করে। দৃশ্যমান জগতের রূপের আবরণখানি উন্মোচন করে, সে অন্তস্থলটি অনুসন্ধান করতে চায়। আর সেই সঙ্গে বিশ্বাস করে, জীবন সংগ্রামের জন্য এবং মৌলিক অভাব মোচনের জন্য, সেই অপার্থিব শক্তির বাস্তব সহায়তা লাভ করা সম্ভব। অতীন্দ্রিয় জগতের প্রতি ধর্মের যতটা আস্থা রয়েছে পরিদৃশ্যমান জগতের প্রতি ততটা নেই। ইন্দ্রিয়াতীত জগতের কাছে ধর্মের অনেক প্রত্যাশা। ধর্ম বিশ্বাস

করে সেই অতীন্দ্রিয় আর্থিক জগৎ আমাদের সকল প্রত্যাশা পূরণ করতে সমর্থ। এমন কি যদি কখনো ধর্ম যুক্তির পথ ছেড়ে, অনুভূতির সাহায্যে পরম সত্তার ব্যাখ্যা করতে চায় তখন সেই অনুভূতি নিজেই হয়ে ওঠে মূল্যায়ন। সুতরাং এই মূল্যায়নও প্রকৃতপক্ষে পরম সত্তারই একটি ব্যাখ্যা। মানুষ বস্তুর সমগ্রতাকে উপলব্ধি করে। এই উপলব্ধির প্রতি তার যে প্রতিক্রিয়া হয় তাকেই বলে ধর্ম।"[১]

ধর্মের মতো ধর্মের উৎপত্তি বিষয়েও দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। পেট্রোনিয়াসের মতে, প্রাথমিকভাবে ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য ভয় থেকে এসেছে। হিউমও ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের উৎস হিসেবে ভয়ের অস্তিত্বকে স্বীকার করেছেন। আসলে আদিম যুগে মানুষ রহস্যময় ও বিপদসঙ্কুল প্রকৃতির হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্যে সেই রহস্যময় শক্তিকে প্রশস্তির দ্বারা শান্ত করার চেষ্টা করতো এবং সেই শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করতো। তাই ভয় থেকে ভক্তি তথা ধর্মের উৎপত্তি একটি বিখ্যাত মতবাদ। তবে আধুনিককালে অনেকেই শুধুমাত্র ভয় থেকেই ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে এরূপ মতবাদে বিশ্বাস করেন না। যেমন, ড. ম্যারেট *The Threshold of Religion* গ্রন্থে বলেছেন—

"আমরা যদি বিস্ময়, প্রশংসা, ভক্তি, শ্রদ্ধা এমনকি ভালবাসাকেও ধর্মীয় মানসিকতার ক্ষেত্রে ভয়ের থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে গ্রহণ করি তাহ'লে আমরা পেট্রোনিয়াসের মত ভুল করবো।"[২]

অর্থাৎ আধুনিককালের উন্নত ধর্মচেতনায় বিস্ময়, প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা, ভক্তি, শ্রদ্ধা প্রভৃতি আবেগের সঙ্গে ভয়ের অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটেছে। আবার *W.R. Smith The Religion of Semites* গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন—

"অজ্ঞাত-শক্তির ভয় থেকে নয়, যে দেবদেবী তাঁদের উপাসকদের সঙ্গে আত্মীয়তার দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ থাকতেন, সেই পরিচিত দেবদেবীর প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা থেকে প্রকৃত অর্থে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে।"[৩]

—বস্তুত ধর্ম এবং ধর্মের উৎপত্তি বিষয়ে বিভিন্ন জনের আলোচনা থেকে ধর্মের স্বরূপ এবং ধর্মীয় চেতনা তথা আধ্যাত্মিক ভাবনা সম্পর্কে একটা ধারণা আমরা করতে পারি। ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে ব্যক্তি তাঁর হৃদয়ে যেসকল ধারণা, ভাবনা-চিন্তা, অনুভূতি উপলব্ধি করে সেগুলিকে ধর্মীয় চেতনা বা আধ্যাত্মিক ভাবনা বলতে পারি। আবার মানুষের ধর্মীয় চেতনার বা

আধ্যাত্মিক ভাবনার একটি প্রধান অঙ্গ হল— ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে ঈশ্বরকে রক্ষাকর্তা হিসেবে দেখা। আর মানুষের এই ধর্মীয় চেতনা বা আধ্যাত্মিক ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এবং নিজেকে ঈশ্বরের চরণে সমর্পণ করার ভাবনায়। মানুষের হৃদয়ে এই আধ্যাত্মিক ভাবনার উদ্ভব হয় কখনো পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলের প্রভাবে, কখনো যুক্তি দ্বারা, কখনো আন্তর অভিজ্ঞতা দ্বারা, আবার কখনো বিশ্বাসের সংকল্প দ্বারা। উনিশ শতকে এদেশে নবজাগরণের প্রভাবে নতুন চিন্তা-চেতনার উদ্ভব ঘটলেও এদেশের নারীদের ঈশ্বরভক্তি হ্রাস পায়নি। কেননা এদেশের নারীদের পিতৃগৃহে রান্না শেখানো ছাড়াও পূজার্চনা, পূজার অর্ঘ্য জোগাড়, ব্রত-পার্বণ প্রভৃতিও করতে হতো। এভাবে পূজা, পূজার অর্ঘ্য সাজানো, ব্রত-অনুষ্ঠান প্রভৃতি করতে করতে শৈশবেই তাদের অবচেতন মনে আধ্যাত্মিক ভাবনার সূত্রপাত হতো। এ প্রসঙ্গে চিত্রা দেব লিখেছেন—

> ''সেকালে ঘরে ঘরে ঠাকুর থাকত। আরাধ্য দেবতার বিগ্রহ পুজো হত প্রতিদিন। পুরুত এসে পুজো করতেন। মেয়েরা ফুল গুছিয়ে মালা গেঁথে, চন্দন ঘষে, নৈবেদ্য সাজিয়ে রাখতেন। ঘর মুছতেন, প্রদীপের সলতে পাকাতেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এ কাজ পড়ত অল্পবয়সী মেয়ে বৌয়েদের ভাগে। শ্বশুরবাড়িতে আসা নতুন বৌ কিংবা দ্বিরাগমনের আগে বাপের বাড়িতে মেয়েদের এসব কাজ করতে হত। তাদের মনে ধর্মচেতনার বীজ বোনা হয়ে যেত শৈশবেই। আবাল্য সংস্কারের মতো মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে যেত ঠাকুরের নাম।''[৪]

—আবার উনিশ শতকে এদেশের পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীরা পুরুষের অধীনে পরাধীন জীবন-যাপন করতো। কাজেই পিতৃতান্ত্রিক সমাজে স্বাধীনতা না থাকায় নারীদের দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা ভোগ করতে হতো। ঈশ্বর দীর্ঘকাল ধরেই এদেশের পরাধীন নারীদের দুঃখ-যন্ত্রণা, হতাশা প্রভৃতির সান্ত্বনা হয়ে উঠেছেন। কেননা তাদের পরাধীন জীবনের দুঃখ-বেদনা-যন্ত্রণার কথা শোনার কেউ ছিল না— ঈশ্বরই তাদের একমাত্র ভরসার নির্ভরযোগ্য স্থল হয়ে উঠেছেন। এ প্রসঙ্গে সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী বলেছেন—

> ''স্বামী, পুত্র, পরিবার, হাসি-কান্নার মত ঈশ্বরও মেয়েদের জগতের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলেন। ঈশ্বর চিরকালই বাংলাদেশের অনেক হতভাগ্য রমণীর অনেক অতৃপ্ত কামনা, অনেক দুঃখ-বেদনা, অনেক গোপন ব্যথার নীরব শ্রোতার ভূমিকা

পালন করে এসেছেন।”[৫]

—এসব কারণে আধ্যাত্মিক ভাবনার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে পূজা-পার্বণ, ব্রত-অনুষ্ঠান প্রভৃতি এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হয়ে দুঃখ-যন্ত্রণা-হতাশা থেকে মুক্তি প্রত্যাশায় ঈশ্বরকে পরিত্রাতা হিসেবে দেখা প্রভৃতি আধ্যাত্মিক ভাবনা উনিশ শতকে এদেশের নারীদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলি উনিশ শতকের লেখিকাদের রচনা হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে এগুলিতেও পূজা-পার্বণ, ব্রত-অনুষ্ঠান এবং আধ্যাত্মিক ভাবনা একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে।

অনেকের হৃদয়ে আধ্যাত্মিক ভাবনার সূচনা হয় শৈশবে তাদের পূজা-পার্বণ, ব্রত-অনুষ্ঠান করতে বলা হয়েছিল বলে। সেই থেকে অনেকটা অভ্যাসবশত তারা আধ্যাত্মিক ভাবনায় বিশ্বাসী হয় এবং পরবর্তীকালে এই আধ্যাত্মিক ভাবনাই তাদের চেতনায় দৃঢ় ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত হয়। সারদাসুন্দরী দেবী *আত্মকথা*-য় জানিয়েছেন, তাঁর বিয়ে হয়েছিল ন'বছর বয়সে এবং বিয়ের পর এগারো বছর বয়সে বৈষ্ণব মতে তাঁর দীক্ষা হয়েছিল। দীক্ষার পূর্বে তিনি শ্বশুরবাড়িতে ধর্ম সম্বন্ধে কোনো উপদেশ না পেলেও বিয়ের পূর্বে শৈশবে পিতৃগৃহে তিনি মায়ের কাছে ব্রত, উপবাস পালনের শিক্ষা পেয়েছিলেন। তাঁর ভাষায়—

> ‘‘এগারো বছর বয়সে আমার দীক্ষা হয়, দীক্ষার পরই আমি পূজা করিতে শিক্ষা করি। বিবাহের পরে এবং দীক্ষার পূর্ব্বে আমি ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোনো বিশেষ উপদেশ পাই নাই; কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে ছেলেবেলায় আমার মা আমায় ব্রত উপবাস ইত্যাদি করাইতেন। মার উপদেশই বেশ ভালো লাগিত।”[৬]

—এভাবে শৈশবে পিতৃগৃহে ব্রত-অনুষ্ঠান পালন করতে গিয়ে সারদাসুন্দরী দেবীর হৃদয়ে আধ্যাত্মিক ভাবনার সূচনা হয়েছিল। আবার দীক্ষার পর তিনি পরম বৈষ্ণব ভক্ত শ্বশুরের কাছে আধ্যাত্মিক চেতনার শিক্ষা পেয়েছিলেন— শ্বশুরই তাঁকে শিখিয়েছিলেন যে, ঈশ্বরের কাছে ধন-সম্পদ চেয়ে প্রার্থনা না করে, বরং পাপ এবং বিপদ থেকে পরিত্রাণের জন্যে প্রার্থনা করতে হয়। শ্বশুর তাঁকে হরিনামের মালা দিয়েছিলেন এবং দু'বেলা জপ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এছাড়া ভাগবতপাঠ শ্রবণ এবং ব্রত-অনুষ্ঠান পালন করার জন্যে শ্বশুর সর্বদাই তাঁকে উৎসাহ দিতেন। এভাবে শ্বশুরের প্রভাবে সারদাসুন্দরীর হৃদয় অল্পবয়সেই আধ্যাত্মিক ভাবনায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

উনিশ শতকে এদেশের নারীরা তাদের মনস্কামনা পূরণ করার জন্য শৈশব থেকেই নানা ধরনের ব্রত-পার্বণ পালন করতো। তবে এসব ব্রত-পার্বণের উদ্দেশ্য যাই থাক না কেন এসব ব্রত

পালনের জন্যে নির্দিষ্ট পূজা পদ্ধতি ছিল। ফলে ছেলেবেলা থেকেই এসব ব্রত পালন করতে গিয়ে এদেশের নারীদের অন্তরে আধ্যাত্মিক ভাবনার সঞ্চার হতো। প্রসন্নময়ী দেবী *পূর্ব্বকথা-য়* বলেছেন, তিনি শৈশবে পিতৃগৃহে বান্ধবীদের সঙ্গে একত্রে *যমপুকুর, পুণ্যিপুকুর* প্রভৃতি ব্রত পালন করতেন। তাঁর ভাষায়—

> ''শৈশবে আমরা সব বালিকা একত্র মিলিয়া কার্ত্তিক মাসে 'যমপুকুর' ও বৈশাখে 'পুণ্যপুকুর' পূজা ও 'নিত্যসুন্দরী' 'ফলদানের' ব্রত ইত্যাদি করিয়া তবে জলগ্রহণ করিতাম।''[৭]

—এসব ব্রত-অনুষ্ঠান পালন করতে গিয়ে প্রসন্নময়ী দেবীর অবচেতন মনে শৈশবেই আধ্যাত্মিক ভাবনার সূচনা হয়েছিল। ইন্দিরা দেবী *আমার খাতা-য়* জানিয়েছেন, তিনিও বাল্যকালে মা ও দিদিমার সঙ্গে জয়মঙ্গলবার ও ইতুপূজা প্রভৃতি ব্রত পালন করতেন। তিনি সকালে সকলের আগে ঘুম থেকে উঠে স্নান করে একান্ত ভক্তি ও নিষ্ঠা সহকারে ঠাকুর পূজা করতেন। তাঁর কথায়—

> ''অতি প্রত্যূষে সকলের আগে উঠিয়া স্নান করিতাম; মালিনী পূজার ফুল দিয়া যাইত; আমি চন্দন ঘসিয়া পূজার আয়োজন করিয়া লইয়া পূজায় বসিতাম। তখন আমার হৃদয় ভক্তিতে পূর্ণ হইত।''[৮]

—এভাবে বাল্যকাল থেকেই বিভিন্ন ব্রত-অনুষ্ঠান ও পূজা করতে গিয়ে ইন্দিরা দেবীর হৃদয় আধ্যাত্মিক চেতনায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। মানকুমারী বসু বাল্যকালেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তাঁর পিতা আনন্দমোহন দত্তের আধ্যাত্মিক ভাবনাকে। পার্থিব বিষয়-কর্মের দরুণ ধর্মের কাজে যাতে ব্যাঘাত না আসে সেজন্য তাঁর পিতা বিষয়-কর্ম পরিত্যাগ করে সর্বদা ধর্মালোচনায় মগ্ন থাকতেন। এ প্রসঙ্গে মানকুমারী বসু *আমার অতীত জীবন* গ্রন্থে লিখেছেন—

> ''যখন আমার জ্ঞানের উদ্রেক হইল তখনই আমি দেখিলাম, আমার বাবা— আমার ঋষিপ্রতিম বাবা— ধর্মাচরণ ও জ্ঞানানুশীলন লইয়াই দিন যাপন করেন। বৈষয়িক কর্মে প্রবৃত্ত হইলে অনেক সময় ন্যায়-ধর্মের সীমা পাছে অতিক্রম করিতে হয়, এই আশঙ্কায় তরুণ বয়সেই বাবা বিষয়-কর্মের প্রতি উদাসীন হইলেন। তখন কর্মচারীদিগের প্রতি বৈষয়িক সমস্ত কার্যের ভার দিয়া তিনি জ্ঞান-ধর্মালোচনায় নিরত থাকিতেন।''[৯]

—আর ধার্মিক পিতার প্রভাবে বাল্যকালেই মানকুমারীর মনে আধ্যাত্মিক ভাবনার সূচনা হয়েছিল।

তাই বাল্যকালে লেখাপড়া শিখে তিনি নিতান্ত খেলাচ্ছলে খাতায় কিছু গদ্য-পদ্য রচনা লিখে রাখতেন, সেসব রচনার মধ্যে একটি পদ্য রচনায় তাঁর ঈশ্বর ভক্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়—

> ''যে খাতার জন্য আমার বুকের ভিতরে এমন মহাপ্রলয় হইতেছিল, তাহার ভিতর রচনার দুইটি ছত্র মাত্র আমার স্মরণ আছে, তাহা এই—
>
> রাখ রাখ সবে ভাই বচন আমার,
> ঈশ্বরের পদে কর কর নমস্কার।''[১০]

উনিশ শতকে এদেশের লোকেরা বিয়ের পূর্বে তাদের মেয়েদের দিয়ে নানা রকম ব্রত-পার্বণ পালন করাতেন— যাতে তাদের মেয়েদের মনস্কামনা পূর্ণ হয় এবং শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে তারা সুগৃহিণী হিসেবে ব্রত-পার্বণ প্রভৃতি পালন করতে পারে। সুদক্ষিণা সেন *জীবন স্মৃতি*-তে বলেছেন, তাঁর মায়ের ছোট মাসি জানকী দেবী তথা সোনাদিদি বিয়ের আগে তাঁকে দিয়ে মাঘমণ্ডল ব্রত, যমপুকুর ব্রত, মঙ্গলচণ্ডী ব্রত প্রভৃতি পালন করাতেন। সুদক্ষিণা সেন এসব ব্রত পালনের উদ্দেশ্য এবং পূজা-পদ্ধতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন। তবে বাল্যকালে বান্ধবীদের সঙ্গে তিনি এসব ব্রত পালন করলেও ক্রমে এসব ব্রত পালনের মতো বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানে তিনি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাই বাড়িতে একদিন ব্রতের আয়োজন করা হলে তিনি এক প্রতিবেশীর বাড়িতে গিয়ে লুকিয়ে ছিলেন— যাতে এসব ব্রত তাঁকে আর পালন করতে না হয়। তাঁর ভাষায়—

> ''বাল্যকালে কোনো কোনো ব্রতে উপবাসও করিয়াছি। সমস্ত দিবস উপবাসে থাকিয়া সন্ধ্যায় ব্রতের পূজা হইয়া গেলে জলগ্রহণ করিয়াছি। একদিন কোনো এক ব্রতের আয়োজন হইতেছে, হঠাৎ আমাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। জানি না কেন ইহার পূর্ব্বেই ওই সকল ব্রতকর্মে আমার আস্থা চলিয়া গিয়াছিল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, ব্রত আর করিব না। ব্রতের সময়ে আমাদের বাটীসংলগ্ন জনৈক প্রতিবেশীর গৃহে একটি মাচানের ওপর চড়িয়া লুকাইয়া রহিলাম।''[১১]

—আসলে সেসময় এদেশের অনেকের মনেই ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব পড়েছিল। ব্রাহ্মরা বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান সর্বস্ব হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতার বিরোধিতা করে নিরাকার একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তখন অনেকেই ব্রাহ্মধর্মের প্রভাবে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়ে ব্রাহ্ম হয়েছিলেন। সুদক্ষিণা সেনের মামা ব্রাহ্মধর্মের অনুরাগী হয়ে নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা করতেন এবং সুদক্ষিণা সেনের মা-ও ক্রমে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন। আর ব্রাহ্মধর্মের

অনুরাগী মা ও মামার নিরাকার ঈশ্বর উপাসনার গভীর প্রভাব পড়েছিল সুদক্ষিণার আধ্যাত্মিক চেতনায়। তাই সুদক্ষিণা সেন বাল্যকালেই আচার-অনুষ্ঠান সর্বস্ব হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস হারিয়ে নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন বলেই আর ব্রত-পার্বণ পালন করতে চাননি। এ প্রসঙ্গে সুদক্ষিণা সেন বলেছেন—

> ''পৌত্তলিকতায় যখন আমার বিশ্বাস নাই, নিরাকার ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের অঙ্কুর দয়াময় ঈশ্বরই যখন আমার শিশুপ্রাণে বপন করিয়াছেন, তখন মিথ্যা অভিনয়ে প্রয়োজন কি? মাতুল কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় স্নানান্তে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন, আমি তাহা দেখিতাম। মাতৃদেবীরও যেন একটু ভাবান্তর হইয়াছে, তাহাও অনুভব করিতাম। মাতৃদেবী প্রকাশ্যে উপাসনা করিতে বসিতে পারিতেন না বটে, কিন্তু কোনোও নির্জন স্থানে বসিয়া ভগবানকে ডাকিতেন। স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, আমাকেও ভগবান সেইদিকেই টানিতেছেন।''[১২]

—এভাবে বাল্যকালেই সুদক্ষিণা সেন মা ও মামার প্রভাবে নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়ে আধ্যাত্মিক ভাবনায় ভাবিত হয়েছিলেন।

শিশুরা যাতে অসময়ে খেলাধূলা করতে বাড়ির বাইরে না বেরোয় সেজন্য এদেশের পিতা-মাতা কিংবা পরিবারের লোকজনেরা শিশুদের নানারকম ভাবে ভীতি প্রদর্শন করতেন। এই ভীতি প্রদর্শনের একটি উল্লেখযোগ্য কৌশল হল— ছেলেধরা দ্বারা শিশু অপহরণ। রাসসুন্দরী দাসীর *আমার জীবন* নামক আত্মজীবনীতে আমরা দেখি, শৈশবে রাসসুন্দরীকে তাঁর মা একদিন এই ছেলেধরার ভয় দেখিয়ে বাইরে যেতে নিষেধ করেছিলেন। আর এই ছেলেধরার ভয় রাসসুন্দরীর মনে একটা ট্রমার সৃষ্টি করেছিল। সেজন্য রাসসুন্দরীর সামনে একদিন এক গোবৈদ্য একটি বড় থলে ঘাড়ে করে উপস্থিত হলে রাসসুন্দরী তাকেই ছেলেধরা মনে করে ভয়ে মৃতপ্রায় হয়েছিলেন। অতঃপর রাসসুন্দরী মায়ের কাছে গিয়ে ভয়ে কাঁদতে থাকলে মা তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, ছেলেধরা নেই এবং ভয় পেলে গৃহদেবতা *দয়ামাধব*-কে স্মরণ করতে; *দয়ামাধব*-ই তাঁকে ভয় থেকে উদ্ধার করবেন। রাসসুন্দরীর কথায়—

> ''তখন আমার মায়ের কাছে গিয়া আমি কাঁদিতে লাগিলাম। আমার মা আমাকে কোলে লইয়া সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, তোমার এত ভয় কেন? ভয় নাই, কীসের ভয়, ছেলে-ধরা নাই, ও সকল মিছা কথা, আমাদের দয়ামাধব আছেন, ভয় কী?

তোমার যখন ভয় হইবে, তখন তুমি সেই দয়ামাধবকে ডাকিও, দয়ামাধবকে ডাকিলে তোমার আর ভয় থাকিবে না। মার ওই কথাতে আমার মনে অনেক সাহস হইল।”[১৩]

—এভাবে রাসসুন্দরীর মনে শৈশব থেকেই ত্রাণকর্তা হিসেবে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরতার একটা ভাবনা তৈরি হয়ে যায়। ভক্তের কাছে ঈশ্বর হলেন এক অতীন্দ্রিয় পরমসত্তা— যিনি অসীম, অনন্ত, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। ঈশ্বর এই জগতের সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি এই জগতকে তথা এই জগতের সকল জীবকে নিয়ন্ত্রণ করেন। ঈশ্বরের এই স্বরূপ সম্পর্কে শৈশবেই রাসসুন্দরীকে অবহিত করেছিলেন তাঁর মা। এ প্রসঙ্গে রাসসুন্দরী দাসী লিখেছেন—

‘‘মা বলিলেন, তিনি পরমেশ্বর, তিনি সর্বস্থানেই আছেন, এজন্য শুনিতে পান। তিনি সকলের কথাই শুনেন। সেই পরমেশ্বর আমাদিগের সকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাকে যে যেখানে থাকিয়া ডাকে, তাহাই তিনি শুনেন। বড়ো করিয়া ডাকিলেও তিনি শুনেন, ছোটো করিয়া ডাকিলেও শুনেন, মনে মনে ডাকিলেও শুনিয়া থাকেন; এজন্য তিনি মানুষ নহেন, পরমেশ্বর। ... ওই এক পরমেশ্বর সকলেরই, সকল লোকেই তাঁহাকে ডাকে, তিনি আদি কর্তা। এই পৃথিবীতে যত বস্তু আছে, তিনি সকল সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি সকলকেই ভালোবাসেন, তিনি সকলেরই পরমেশ্বর।”[১৪]

—এভাবে শৈশবেই গৃহদেবতা *দয়ামাধবের* মধ্য দিয়ে রাসসুন্দরী দাসী সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সকলের ত্রাণকর্তা ঈশ্বর সম্পর্কে মনে মনে একটা ধারণা করেছিলেন এবং তখন থেকেই ঈশ্বরের প্রতি তাঁর হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল।

একেশ্বরবাদীদের মতে ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়— তিনি নিরাকার। তবে সাধারণ মানুষের পক্ষে নিরাকার ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। সেজন্যই অবতারতত্ত্ব বা সাকার পূজা-পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে। আর ঈশ্বরের এই সাকার রূপের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ উপলব্ধি করতে পারে ঈশ্বর কোনো দূরবর্তী সত্তা নন, তিনি এক প্রাণবন্ত সত্তা। এভাবে ঈশ্বরের সাকার রূপের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পারে। কৈলাসবাসিনী দেবী *ডায়েরী* গ্রন্থে বলেছেন, পণ্ডিত ব্যক্তিরা নিরাকার ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করলেও তাঁরা জানতেন সাধারণ মানুষের পক্ষে এই পরম প্রেমময় ও আনন্দময় নিরাকার ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি

করা সম্ভব হবে না। সেজন্য তাঁরা সাধারণ মানুষের হৃদয়ে ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা তৈরির জন্যে নিরাকার পরম ঐশ্বর্যময় ঈশ্বরকে সাকার রূপ দিয়েছেন— নানা রকম দেবতার মূর্তি পূজা প্রচলনের মধ্য দিয়ে। কৈলাসবাসিনী দেবীর ভাষায়—

> ''বিজ্ঞ লোকে ঠিক করে নিয়ম নির্ধার্য্য করেছেন। আর তাঁরা জানতেন এক-মেবাদ্বিতীয় ওঁ জেনেও পুতুল পূজার সৃজন করেন, তার কারণ এই, নির্বোধ বানর মানুষ অনেক আছেন তারা ক্রমে নাস্তিক হইতে নাগিল। তারা বলিতো জাঁর হাত নাই পা নাই নিরাকার তিনি আমাদের কি করিবেন, এই শকলে বুযিতে নাগিল। তাইতে নানান মূর্ত্তির দেবতা সৃজন হইল, পূজাদির বিধান হইল।''[১৫]

কৈলাসবাসিনী দেবী বলেছেন, যথার্থ ধর্ম হল ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাস রেখে তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী সর্বদা সৎপথে চলা— তা ঈশ্বরের সাকার কিংবা নিরাকার যেকোনো উপাসনার দ্বারাই সম্ভব।

ভক্তের হৃদয় সর্বদা ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করার জন্যে ব্যাকুল থাকে। তবে ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান হলেও তিনি অসীম ও নিরাকার হওয়ায় সাধারণ ভক্তদের পক্ষে তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সাধারণ ভক্তরা ঈশ্বরের স্বরূপকে জানার জন্য অনেক সময় ধর্মগ্রন্থ বা ধর্মতত্ত্বের বই পাঠ করে থাকে। শৈশবে রাসসুন্দরী দাসী মায়ের কাছে ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা পেয়েছিলেন এবং সেই ধারণা থেকেই তিনি পরবর্তীকালে ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। এই ব্যাকুলতা থেকেই একদিন তিনি স্বপ্নে দেখেছেন ঈশ্বর মহিমা তথা চৈতন্য মহিমা বিষয়ক *শ্রীচৈতন্যভাগবত* গ্রন্থটি তিনি পাঠ করেছেন। অথচ সেসময় তিনি *শ্রীচৈতন্যভাগবত* গ্রন্থটি দেখেননি এবং সেসময় তিনি পড়তে লিখতেও জানতেন না। তবে স্বপ্নে যেহেতু তিনি চৈতন্য মহিমা বিষয়ক বইটি পাঠ করতে পেরেছেন সেহেতু তিনি মনে করেছেন তাঁর জীবন সার্থক হয়েছে। আর এই ব্যাকুলতা থেকেই তিনি পরবর্তীকালে নানা বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করে সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় পড়তে শিখে বৃন্দাবন দাসের *শ্রীচৈতন্যভাগবত* গ্রন্থটি পাঠ করেছিলেন। রাসসুন্দরী দাসীর হৃদয় আধ্যাত্মিক ভাবনায় পরিপূর্ণ ছিল। তাই *আমার জীবন* গ্রন্থে তিনি ঈশ্বরভক্তি বিষয়ক কয়েকটি কবিতাও সংযোজন করেছেন। এরকম একটি কবিতাতেও তাঁর ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধির ব্যাকুলতা প্রকাশিত হয়েছে—

> ''তুমি প্রভু বিশ্বময়, তোমাতে প্রলয় লয়

শুদ্ধ তত্ত্ব কে জানে তোমার।

... ...

চরাচর ত্রিসংসারে, কে তোমা জানিতে পারে,
তুমি নাহি জানালে আপনি!
আমি কোন্ শক্তি ধরি, তোমাকে জানিতে পারি,
তাহে ছার অবলা রমণী।।
সত্ত্বরূপে অহরহ, সর্বস্থলে তুমি রহ
এই মনে ভরসা আমার।"[১৬]

এদেশের পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারীদের সাংসারিক কর্ম ও সন্তান উৎপাদন-পালন ছাড়াও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের বিধান দিয়েছে স্বামী ও পরিবারের মঙ্গল কামনায়, পুত্র কামনায় এবং স্বামীর ধন-সম্পদ সমৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষায়। তাই উনিশ শতকেও এদেশের নারীদের পিতৃগৃহে রান্না শেখানো ছাড়াও পূজা-অর্চনা, ব্রত-অনুষ্ঠান করতে হতো। এভাবে এদেশের নারীদের বেশিরভাগ সময় কাটতো ঠাকুর ঘরে— পূজা-অর্চনা করে। আর পূজা-পার্বণ, ব্রত-অনুষ্ঠান করতে গিয়ে শৈশবেই তাদের মনে আধ্যাত্মিক ভাবনার প্রভাব পড়তো। তাই এদেশের নারীদের সাংসারিক কাজকর্মের পাশাপাশি দেবতার পূজা-অর্চনা করাও একটা বড়ো কাজ ছিল। রাসসুন্দরী দাসী শৈশবে মায়ের কাছে ঈশ্বর তথা *দয়ামাধবে*-র স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা পেয়েছিলেন এবং শ্বশরবাড়িতে গিয়ে তিনি সেই গৃহদেবতা *দয়ামাধব*-কে পেলেন *মদনগোপাল* হিসেবে। শ্বশুরবাড়িতে তাঁকে সংসারের যাবতীয় কাজকর্মের পাশাপাশি গৃহদেবতা *মদনগোপালে*-র সেবায় প্রতিদিন অন্নব্যঞ্জন ভোগও দিতে হতো। এ প্রসঙ্গে রাসসুন্দরী দাসী *আমার জীবন* গ্রন্থে লিখেছেন—

> ''পরে অল্প দিবস মধ্যেই আমার শাশুড়ি ঠাকুরানি সান্নিপাতিকের পীড়ায় দৃষ্টিহীন হইলেন, আর কোনো কাজ করিতে পারেন না। তখন তাঁহার নিজের প্রয়োজনীয় কাজ পর্যন্ত আমাকে করিতে হইত। অধিকন্তু ওই সংসারের সমুদয় কাজের ভারও আমার উপর পড়িল। তখন আমার অতিশয় চিন্তা উপস্থিত হইল, আমি কী করিব ভাবিতে লাগিলাম, এখানে আসা পর্যন্ত আমাকে কোনো কাজ করিতে দেন নাই। বিশেষত ওই সংসারটি বড়ো কম নহে, দস্তুর মতোই আছে। বাটীতে বিগ্রহ স্থাপিত আছেন, তাঁহার সেবাতে অন্নব্যঞ্জন ভোগ হয়।"[১৭]

—প্রসন্নময়ী দেবী *পূর্ব্বকথা-য়* বলেছেন, সেকালে এদেশে ধনী থেকে দরিদ্র— সকল বাড়ির বউদের স্বামী-পুত্র-আত্মীয়-স্বজনদের জন্যে রান্নার পাশাপাশি দেবসেবা, ব্রত-পার্বণ প্রভৃতি করতে হতো। প্রসন্নময়ী দেবীর কথায়—

> ''যত বড়োই ধনী জমিদার গৃহিণী হউক না কেন, তাঁহাকে স্বামী পুত্র আত্মীয়স্বজনের জন্য দুই বেলা রন্ধন করিতে হইত। .... প্রত্যহ দেবসেবা, বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ, ব্রত, নিয়ম, ব্রাহ্মণ ভোজন লাগিয়াই থাকিত।''[১৮]

ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ তথা পুণ্যস্থান দর্শন করে অনেকে অশান্ত মনকে শান্ত করার জন্য তীর্থস্থান ভ্রমণ করে থাকে। আর এই তীর্থভ্রমণ মানুষের ধর্মীয় চেতনারই বহিঃপ্রকাশ। স্বামীর মৃত্যুর এক বছর পরে সারদাসুন্দরীর বড়ো মেয়ে এবং শাশুড়ির মৃত্যু হয়। এভাবে একের পর এক মৃত্যুশোকে সারদাসুন্দরীর মন অশান্ত হয়ে উঠলে তিনি ঈশ্বরের সান্নিধ্যে মনকে শান্ত ও সংযত করার জন্যে তীর্থভ্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এছাড়া তাঁর হৃদয় আধ্যাত্মিক ভাবনায় পরিপূর্ণ থাকায় তীর্থভ্রমণের মাধ্যমে পরম প্রেমময় ও আনন্দময় ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করার বাসনা তাঁর হৃদয়ে আগে থেকেই প্রবল ছিল। এ প্রসঙ্গে তিনি *আত্মকথা-য়* বলেছেন—

> ''আমি দশ বৎসর বয়সে এই বাড়িতে আসিয়াছি এবং এগারো বৎসর হইতে ঘর করিতে আরম্ভ করিয়াছি, এই এগারো বৎসরেই আমি হরিনামের মালা গ্রহণ করি। সেই পর্যন্ত এই বাড়িতে কখনও খারাপ কাজ দেখি নাই, সর্বদাই সৎকর্ম্মে লিপ্ত থাকিতাম। ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম ধর্ম্ম একটা বাই হইল, তাহা হইতে শেষে তীর্থ দর্শনের একটা খুব ইচ্ছা দাঁড়াইল।''[১৯]

—সেজন্যে বিধবা হওয়ার পর সাড়ে ছাব্বিশ বছর বয়স থেকে চুয়াল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি শ্রীক্ষেত্র, কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, মথুরা, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি তীর্থস্থানে ভ্রমণ করেছেন ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করে মানব জীবনকে সার্থক করার জন্যে। কৈলাসবাসিনী দেবীর হৃদয়েও তীর্থভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা প্রবল ছিল। তাই তাঁর বোন কাশী যাবেন বলে মনস্থির করলে তিনিও বোনের সঙ্গে কাশী ভ্রমণ করে এসেছিলেন। কৈলাসবাসিনী দেবী *ডায়েরী* গ্রন্থে তাঁর সেই তীর্থভ্রমণের ব্যাকুলতার কথা প্রকাশ করতে গিয়ে লিখেছেন—

> ''একদিন আমার ভগ্নি বলেন আমরা কাশি জাবো। আমি বলিলাম শেখানে কদিন থাকিবে। তিনি বল্লেন ১০ কিম্বা ১২ দিন। তাহাতে আমি বলিলাম আমার বড়

জেতে ইচ্ছা করে, আমি তো বেশি দিন থাকিতে পারিব না, এই শঙ্গে হলে ভাল হয়।”[২০]

—আবার ইন্দিরা দেবীও মনে করতেন তীর্থস্থান ভ্রমণের মধ্য দিয়ে পুণ্য সঞ্চয় করা যায়। তাই তিনি পুণ্যস্থান দর্শন করে পুণ্য সঞ্চয়ের জন্যে বিভিন্ন তীর্থস্থান ভ্রমণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইন্দিরা দেবী *আমার খাতা-য়* বলেছেন, তিনি ষোলো দিন ধরে মধুপুর, বৈদ্যনাথ, কাশী, হরিদ্বার, মথুরা প্রভৃতি তীর্থস্থান ভ্রমণ করেছিলেন।

উনিশ শতকে এদেশের নারীরা পার্থিব দুঃখ-কষ্ট থেকে পরিত্রাণ লাভ করে মুক্তি প্রত্যাশায় সকালে ঘুম থেকে উঠে এবং রাতে ঘুমোনোর আগে পুণ্যস্থানের নাম ও ঈশ্বরের নাম জপ করতো—সকল কাজে ঈশ্বরকে স্মরণ করতো। এরকমই ছিল সেকালের অনেক নারীর আধ্যাত্মিক ভাবনা। প্রসন্নময়ী দেবীর মধ্যেও আমরা এরকম আধ্যাত্মিক ভাবনার প্রকাশ লক্ষ করি। তাঁর সমস্ত দিন এবং সমস্ত কাজ ঈশ্বরকে স্মরণ করার মধ্য দিয়েই কেটে যেতো। এ প্রসঙ্গে প্রসন্নময়ী দেবী *পূর্ব্বকথা-য়* লিখেছেন—

> ‘‘তখন আবার শয্যার উপর যুক্তকরে বসিয়া দুর্গা কালী শিব রাধাকৃষ্ণ এবং প্রধান প্রধান তীর্থ গয়া কাশী ও নদ নদীর নামে গঙ্গা যমুনা ব্রহ্মপুত্র ইত্যাদি বলিয়া শয়ন করিতাম। প্রভাত হইতে রাত্রি পর্যন্ত যাহাই করি না কেন, সকল কার্যেই ভগবানকে স্মরণ করিতে হইত। প্রভাতে জীবন আরম্ভ, এবং নিশীথে কার্য শেষ তাঁহার নামেই করিবার নিয়ম ছিল।”[২১]

পূজা-অনুষ্ঠান, ব্রাহ্মণ ভোজন করানো প্রভৃতির মধ্য দিয়ে মানুষের আধ্যাত্মিক ভাবনার প্রকাশ ঘটে। উনিশ শতকে এদেশের অধিকাংশ গৃহবধূর পূজা-আহ্নিক-উপবাস ইত্যাদি নিত্যকর্ম ছিল। এছাড়া পুণ্য অর্জনের জন্যে তারা কখনো কখনো ব্রাহ্মণ ভোজনও করাতো। এসবই ছিল তাদের আধ্যাত্মিক চেতনার প্রকাশ। কৈলাসবাসিনী দেবীর গভীর ঈশ্বরভক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর *ডায়েরী* গ্রন্থটির সর্বত্র। তাঁর এই গভীর ঈশ্বরভক্তির তথা ধর্মীয় চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে পুণ্য অর্জনের মানসিকতায় এবং প্রতিদিন ভাগবত পাঠ শ্রবণ করার মধ্য দিয়ে। তিনি লিখেছেন—

> ‘‘তার পরে কার্ত্তিক মাশের সংক্রান্তির দিন আমার স্বামি মাকে কথা দেওয়ান। তাতে খরচ হয় ১৫০০ টাকা। এই দেড় হাজার টাকাতে কথা হয়, বামন খাওয়ান

হয় বেশ ভালরূপে, তাতে খুব শুখ্যেতি হয়েছেল। আমি আলাদা বাড়িতে ছিলাম, তবু রোজ কথা শুনিতে জাইতাম।"[২২]

—প্রসন্নময়ী দেবী *পূর্ব্বকথা*-য় বলেছেন, তাঁর জেঠিমা কুলসুন্দরী দেবীর হৃদয়ও এরকম আধ্যাত্মিক চেতনায় পরিপূর্ণ ছিল। কুলসুন্দরী দেবীর দৈনন্দিন জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল ভক্তি-নিষ্ঠার সঙ্গে পূজা-আহ্নিক করা। তিনি পুণ্য অর্জনের জন্যে ব্রাহ্মণ ভোজন করানোর পূর্বে জল পর্যন্ত গ্রহণ করতেন না— ধর্ম-কর্ম বিষয়ে এরকমই নিষ্ঠা ছিল তাঁর।

উনিশ শতকে আমরা দেখি এদেশের নারীরা পারিবারিক সূত্রে যে দেব-দেবীতে বিশ্বাস করতো সন্তানদের নামকরণও সাধারণত তারা সেই দেব-দেবীর নাম অনুসারেই করতো। সেকালের নারীদের এরকম ইষ্ট দেব-দেবীর নাম অনুসারে সন্তানদের নামকরণের মধ্যেও রয়েছে আধ্যাত্মিক ভাবনা। কেননা তারা যখন সন্তানদের কিছু বলতে কিংবা সন্তানদের কাছে ডাকার প্রয়োজনে সন্তানদের নাম উচ্চারণ করবে তখন একই সঙ্গে ইষ্ট দেব-দেবীর নাম উচ্চারণে পুণ্য অর্জনের সৌভাগ্যও তারা পেয়ে যাবে। নিস্তারিণী দেবীর *সেকেলে কথা*-য় এদেশের নারীদের ইষ্ট দেব-দেবীর নামের অনুসরণে সন্তানদের নামকরণের প্রবণতা লক্ষ করি। নিস্তারিণী দেবী বলেছেন, বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি ভক্তি থাকায় তাঁর বিমাতা পুত্রদের নামকরণ করেছেন ইষ্ট দেবতা গোপালের নামের অনুসরণে। আবার তাঁর মা শাক্তের মেয়ে হওয়ায় পুত্রদের নামকরণ করেছেন ইষ্ট দেবী দুর্গার নামের অনুসরণে। নিস্তারিণী দেবীর ভাষায়—

> ''আমার বিমাতার বৈষ্ণব মন্ত্র; তিনি গোপাল নাম ভালোবাসিতেন বলিয়া দুই ছেলের লবগোপাল ও কুশগোপাল নাম রাখেন। আমার মা ঘোর শাক্তের মেয়ে; সেদিনও আমার মামার বাড়ি মহিশ বলি হইয়াছে। তিনি দুর্গার নাম ভালোবাসিতেন বলিয়া তাঁহার পুত্রদের নাম দুর্গার নাম হইতে লওয়া হইত এজন্য আমার বড়োদাদার নাম দেবীচরণ, মেজ ভায়ের কালীচরণ, ছোটো তারিণীচরণ। ... তখন দেবদেবীদের নামেই নামকরণ করা হইত।"[২৩]

—আবার সেকালে এদেশের অনেক নারী পুত্র কামনায় কখনো একান্ত ভক্তি-নিষ্ঠা সহকারে ইষ্ট দেব-দেবীর পূজা করতো, আবার কখনো ইষ্ট দেব-দেবীর কাছে মানত করতো। যেমন শরৎকুমারী দেব *আমার সংসার* গ্রন্থে বলেছেন, কন্যা ছাড়া একটিও পুত্রসন্তান না থাকায় তাঁর শাশুড়ি পুত্র কামনায় অনেক যাগযজ্ঞ করে দেবতার কাছে মানত করেছিলেন। এরপর শরৎকুমারীর শাশুড়ির

পুত্রসন্তান সত্যপ্রিয়ের জন্ম হয়েছিল। আর এভাবে এদেশের অনেক নারী মানত করে পুত্রসন্তান জন্মালে সেই পুত্রকে তারা ইষ্ট দেব-দেবীর আশীর্বাদ ধন্য বলে মনে করে তার নামকরণ ইষ্ট দেব-দেবীর নামের অনুসরণেই করতো। এ প্রসঙ্গে কামিনী রায় *শ্রাদ্ধিকী* গ্রন্থে বলেছেন, পিতা চণ্ডীচরণ সেনের জন্মের দু'বছর আগে থেকেই পিতামহী গৌরী দেবী দীর্ঘায়ু পুত্র কামনায় একান্ত ভক্তি ও নিষ্ঠা সহকারে প্রতিদিন চণ্ডীপাঠ শ্রবণ করতেন। তাই গৌরী দেবীর যখন পুত্রসন্তান হয় তখন সেই পুত্রকে দেবী চণ্ডীর আশীর্বাদ ধন্য বলে মনে করে আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশিনীরা দেবী চণ্ডীর নামের অনুসরণেই পুত্রের নামকরণ করতে বলেছিলেন গৌরী দেবীকে। তাই গৌরী দেবীর পুত্রের নামকরণ করা হয়েছিল চণ্ডীচরণ। কামিনী রায়ের কথায়—

> ''পিতৃদেব জন্মিবার দুই বৎসর পূর্ব হইতে পিতামহী দেবী দীর্ঘায়ু পুত্র কামনা করিয়া, প্রত্যহ চণ্ডীপাঠ শ্রবণ করিতেন। তাহাতেই এই পুত্র জন্মিবামাত্র আত্মীয় স্বজন ও গ্রামের স্ত্রীলোকেরা বলিলেন, চণ্ডীপাঠ শ্রবণের পুণ্যফলে আপনি পুত্র সন্তান লাভ করিয়াছেন, অতএব পুত্রের নাম চণ্ডীচরণ রাখিবেন। তদনুসারে সদ্যপ্রসূত বালক চণ্ডীচরণ নাম প্রাপ্ত হইলেন।''[২৪]

—আবার কামিনী রায়ের শাশুড়ি দীর্ঘজীবী পুত্র কামনায় কাশীধামে গিয়ে দেবতা কেদারনাথের কাছে মানত করেছিলেন। এরপর কামিনী রায়ের স্বামী জন্মগ্রহণ করলে তাঁর শাশুড়ি পুত্রকে দেবতা কেদারনাথের আশীর্বাদ ধন্য বলে মনে করে পুত্রের নামকরণ করেছিলেন কেদারনাথ। এভাবে পুত্র কামনায় এবং পুত্রের নামকরণের মধ্য দিয়ে সেকালের এদেশের নারীদের আধ্যাত্মিক ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়।

মানুষের ধর্মচেতনার গুণাবলীর মধ্যে একটি গুণ হল দয়া। পরম করুণাময় ঈশ্বর জগতের সকল জীবকেই করুণা তথা দয়া করে থাকেন এবং তিনি সকল জীবের হৃদয়েই বাস করে থাকেন। তবে সকলে নিজের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করতে পারে না, যারা পারে তারাই ধার্মিক। আর ধার্মিক ব্যক্তিরা নিজেদের হৃদয়ে স্থিত করুণাময় ঈশ্বরের করুণাকে আত্মস্থ করে নিজেরাও হয়ে ওঠে করুণাময় তথা দয়াময়। তাই ধার্মিক ব্যক্তিদের একটি মহৎ গুণ হল দয়া এবং দয়াই হল ধর্ম। সেজন্যই তো স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন— 'জীবে প্রেম করে যেই জন/ সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'। সকলের হৃদয়ে যেহেতু ঈশ্বর বাস করেন সেহেতু সকলকে দয়া করলে তথা ভালোবাসলে ঈশ্বরকেও ভালোবাসা হয়— ঈশ্বরের সেবা করা হয়। এ প্রসঙ্গে ইন্দিরা দেবী *আমার খাতা*-য়

বলেছেন— পরম করুণাময় ঈশ্বরের দান হল দয়া এবং দয়ার মধ্য দিয়েই আমরা ধর্মকে লাভ করি। ধর্ম যেহেতু আমাদের স্বর্গসুখ ভোগ করায় সেহেতু সকলের প্রতি দয়ার মধ্য দিয়ে আমরা স্বর্গের পথ প্রশস্ত করতে পারি। তাঁর ভাষায়—

> ''ঈশ্বরের অমূল্য দান দয়া, তাহা যদি আমরা রত্ন ভাবিয়া কণ্ঠে স্থান দিই তাহা হইলে অনায়াসে আমরা ধর্মকে লাভ করিব, কারণ দুইটি এক সূত্রে গ্রথিত জিনিস। ... ধর্ম আমাদের স্বর্গসুখ ভোগ করায় ও আমাদের জীবন মরণের সঙ্গী হইয়া থাকে ও মৃত্যুকালে পরলোকের অচেনা পথের পথ প্রদর্শক হইয়া আমাদের পরলোকে লইয়া যায়— এই দয়াবৃত্তিকে অনুশীলন দ্বারা আমরা স্বর্গের দ্বারকে মুক্ত করিয়া থাকি।''[২৫]

— এভাবে দয়ার মাধ্যমে প্রাপ্য ধর্ম আমাদের পাপের হাত থেকে রক্ষা করে ঈশ্বরের সন্নিকটে নিয়ে যায়। কাজেই ধর্মই হল ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের একমাত্র পথ। এরকম আধ্যাত্মিক ভাবনায় ভাবিত ছিলেন ইন্দিরা দেবী।

ভক্তের দৃষ্টিতে ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণাবলীর মধ্যে একটি গুণ হল তিনি সর্বজ্ঞ। তিনি এই বিশ্বসংসার সৃষ্টি করেছেন— আমাদের পদতলের ধূলি থেকে আকাশের নক্ষত্র পর্যন্ত সবকিছুই ঈশ্বরের সৃষ্টি। এজগতের সবকিছুর মতো ঈশ্বর সকল মানুষের বুদ্ধি, মন ও হৃদয়ে বিরাজমান। তাই তাঁর কাছে প্রত্যেক মানুষের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিন্তা-ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-দুঃখ— কোনো কিছুই অজানা থাকে না। তিনি অন্তর্যামী এবং মানুষের সকল চিন্তা ও প্রচেষ্টার নিয়ন্ত্রক। রাসসুন্দরী দাসী এই আধ্যাত্মিক ভাবনায় *আমার জীবন* গ্রন্থে বলেছেন, তিনি কখনো সচেতনভাবে কোনো নিন্দিত কর্ম করেননি, তবে অসচেতনভাবে তিনি যদি কোনো নিন্দিত কর্ম করে থাকেন তাহলে ঈশ্বর যেন তাঁর সেই ভুল ধরিয়ে দেন। রাসসুন্দরী দাসী এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> ''হে নাথ পতিতপাবন! হে দয়াময় দীনবন্ধু! তুমি তো আমার মনেই আছ। আমার মনের মধ্যে যখন যে প্রকার ভাব উপস্থিত হয়, তোমার অগোচর তো কিছুই নাই। তাহা সকলই তুমি জানিতেছ। ...আমি যে প্রবঞ্চনা করিয়া কোনো কর্ম করিব কিংবা কথা বলিব, এমন চেষ্টা আমার কখনোই নাই। তবে যদি কোনো কারণে মনের ভ্রমক্রমে হয়, তাহা তুমি ভালো করিয়া দাও; আমার মন যেন কখনও তোমার নিয়মের বিরুদ্ধে কর্ম না করে। হে পিতঃ পরমেশ্বর! আমার

মনের ভাবটি যখন যেমন হইয়া উঠে, তাহা সকলই তুমি জানিতেছ, অধিক আর কী বলিব।”[২৬]

—আবার ইন্দিরা দেবীর *আমার খাতা* গ্রন্থের আধ্যাত্মিক ভাবনা সমৃদ্ধ একটি কবিতাতেও বিশ্বচরাচরের সর্বত্র বিরাজমান ঈশ্বর যে অন্তর্যামী এই ভাবনার প্রকাশ লক্ষ করা যায়—

‘‘হে মানব, পাপ করি কোথা লুকাইবে?
জগতে তাঁহার চক্ষু দেখনা ভাবিয়ে!
অন্ধকার গিরিগুহা খনির ভিতর
যেখানে যাইবে তুমি সেখানে ঈশ্বর।
পাপ করি মনে মনে রাখ লুকাইয়া
মনেতে আছেন তিনি লবেন জানিয়া।
তিনি হন আমাদের হৃদয়ের স্বামী
আমাদের আত্মা তাঁর হয় অনুগামী।”[২৭]

—এর মধ্য দিয়ে সেকালের এদেশের নারীদের আধ্যাত্মিক ভাবনার আরেকটি দিক উঠে এসেছে।

ভয় থেকে ভক্তি— একটি প্রাচীন ও বহুপ্রচলিত মতবাদ। তবে অনেকে মনে করেন যে, আদিম যুগে ভয় থেকে নয়, বরং ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তার উপলব্ধি থেকেই ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের এই আত্মীয়তার দৃঢ় বন্ধন আধুনিক কালের উন্নত ধর্মচেতনায়ও লক্ষ করা যায়। সেজন্য আজও আমরা ঈশ্বরকে পিতা, মাতা, প্রিয়তম, সখা প্রভৃতি বলে সম্বোধন করতে পারি— ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা নিবেদন করতে পারি এবং আমাদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার কথা নির্দ্বিধায় ঈশ্বরকে জানাতে পারি। ঈশ্বরের প্রতি রাসসুন্দরীর আশৈশব আকর্ষণ ছিল এবং প্রেম ও ভালোবাসার দ্বারা তিনি ঈশ্বরকে একান্ত আপনজন করে নিতে পেরেছিলেন। সেজন্য তিনি ঈশ্বরকে ‘পিতা’ বলে সম্বোধন করে তাঁর দীর্ঘ সুস্থ জীবন দানের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন— ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালোবাসা নিবেদন করেছেন। এ প্রসঙ্গে রাসসুন্দরী দাসী *আমার জীবন* গ্রন্থে বলেছেন—

‘‘সেই পরম পিতা বিশ্বব্যাপী বিশ্বপালক সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়কর্তার মনোহর দর্শন প্রতীক্ষাতে এই হতভাগ্য নরাধম রাসসুন্দরীর প্রতি সদয় হইয়া অষ্টাশি বৎসর কাল নিরাপদে জীবিত রাখিয়াছেন। হে নাথ দয়াময়! ধন্য, ধন্য, তোমার ঠাকুরালি,

ধন্য ! তোমার নামামৃত আমার শ্রবণে প্রবিষ্ট হইয়া আমার মানবদেহ সফল হইল। আমি কৃতার্থ হইলাম।”[২৮]

—এভাবে সেকালের অনেক নারীই শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালোবাসায় ঈশ্বরকে একান্ত আপনজন করে নিয়েছিলেন।

সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী মানুষরা ভালো কিছু অর্জন করলে কিংবা সৃষ্টি করলে তা ঈশ্বরের অনুগ্রহ বলে মনে করে কৃতজ্ঞতাবশত ঈশ্বরকে কখনো ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে, কখনো বা ঈশ্বরকে কোনো জিনিস উৎসর্গ করে থাকে। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে মানুষের কৃতজ্ঞতার সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন, কোনো কিছু উৎসর্গ প্রভৃতি। বিনোদিনী দাসী *আমার কথা*-য় বলেছেন, ঈশ্বরের কৃপাতেই তিনি তাঁর জীবনের কাহিনি লিখতে পেরেছেন। তাই ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত তিনি তাঁর *আমার কথা* গ্রন্থটি ঈশ্বরকেই উৎসর্গ করেছেন। আর ভক্তি-শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় তিনি ঈশ্বরকে একান্ত আপনজন করে নিতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর বিশ্বাস ছিল ঈশ্বর তাঁর এই উপহার অবশ্যই গ্রহণ করবেন। তাঁর ভাষায়—

> ‘‘সেই জন্যই আমার স্বর্গীয় প্রাণময় প্রীতির দেবতার চরণে ‘আমার কথা’ উৎসর্গ করিলাম ! তাঁহার জিনিস আবার তাঁহাকেই দিলাম ! তিনি যেখানেই থাকুন প্রাণের এই আকুলিত আকাঙ্ক্ষা, তাঁহার পবিত্র আত্মাতে স্পর্শ করিবেই ! কেননা তিনি আমার নিকট সত্যে বদ্ধ, সত্যবাদীর সত্য কখনও ভঙ্গ হয় না ! বিশেষত যে প্রাতঃস্মরণীয় উন্নতবংশে তাঁহার জন্ম, সে বংশের বংশধর কখনও মিথ্যাবাদী হইতে পারেন না ! ইহা ত্রিজগতে বিখ্যাত।”[২৯]

—এভাবে আধ্যাত্মিক ভাবনা মানুষকে বিশ্বাস করতে শেখায়। আর বেঁচে থাকার জন্য এই বিশ্বাসের গুরুত্ব কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। তাই তো রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন— ‘মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ’।

ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তদের আত্মীয়তার সম্পর্ক বলেই ভক্তরা ঈশ্বরের কাছে অনায়াসেই তাদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার কথা বলতে পারে। ভক্তরা বিপদের সময় সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে পারে বিপদ থেকে তাদের উদ্ধার করার জন্যে। আবার ভক্তদের কোনো মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলে কিংবা কোনো কারণে তারা আনন্দিত হলে তা ঈশ্বরের অনুগ্রহ মনে করে তারা ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতেও ভোলে না। কৈলাসবাসিনী দেবীর মধ্যে এরকম

ভক্তিমিশ্রিত আধ্যাত্মিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে ঈশ্বরকে স্মরণ করেছেন, এমনকি তিনি *ডায়েরী* গ্রন্থটি শুরু করেছেন *শ্রীশ্রীজগদিশ্বর-কে* স্মরণ করে। তিনি বিপদের দিনে, এমনকি সুখের দিনেও এই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে স্মরণ করেছেন। যেমন, একবার আশ্বিন মাসে ছোট মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে পদ্মা নদীতে নৌকা করে যাওয়ার সময় কৈলাসবাসিনী দেবী বিপদে পড়েছিলেন এবং ঈশ্বরকে স্মরণ করে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রেখে সে যাত্রায় তিনি ভয়ঙ্কর ঝড় থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। আবার কৈলাসবাসিনী দেবী স্বামীর কর্মসূত্রে স্বামীর সঙ্গে দীর্ঘদিন প্রবাস জীবন কাটিয়ে কলকাতা ফিরে যেতে চাইলেও স্বামীর বদলির নির্দেশ না আসার ফলে তাঁদের কলকাতায় যাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। পরবর্তীকালে যখন স্বামীর কলকাতায় বদলির সংবাদ আসে তখন সেই আনন্দ সংবাদকে তিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহ মনে করে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতে ভোলেননি। তিনি লিখেছেন—

> ''৪ আশাড় আজ— আমরা দুই জোনে বসে আচি বাড়ির ভিতরের বাগানে। এমন সময় কুমুদ একখানি কাগজ এনে দিলে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কি। বাবু বলেন জাহা তুমি নিত্য প্রার্থনা করো তাই। বলে খুব অল্লাদিত হইলেন। আমিও পরম আল্লাদিত হইলাম। জগদিশ্বরকে কোটি কোটি ধন্যবাদ দিলুম। তাহাতে সেদিন আমার বড় আমোদে গেল।''[৩০]

—এভাবে কৈলাসবাসিনী দেবীর ধর্মচেতনায় ঈশ্বর সুখে-দুঃখে সর্বদা তাঁর সহচরী হয়ে উঠেছিলেন। সুদক্ষিণা সেনও মনে করতেন ঈশ্বরের ইচ্ছেতেই সবকিছু ঘটছে। তাই তিনিও সুখে-দুঃখে সর্বদা ঈশ্বরকে স্মরণ করেছেন। সেজন্যে তিনি যখন সপরিবারে ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের জন্যে জলপথে নৌকো করে বিনা বাধায় কলকাতায় পৌঁছেছিলেন তখন জলপথে কোনো বাধা-বিপদ না আসাকে তিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহ মনে করে ঈশ্বরকে স্মরণ করে প্রণাম করেছেন। এ প্রসঙ্গে সুদক্ষিণা সেন *জীবন স্মৃতি*-তে বলেছেন—

> ''ক্রমে আমরা কলকাতায় 'বেলেঘাটা'র খালে আসিয়া প্রবেশ করিলাম। দয়াময়, তোমায় প্রণাম করি। আমাদের ছোটো নৌকাখানি কত বাধা বিঘ্ন ও বিপদের পথ অতিক্রম করিয়া তোমারই কৃপায় গন্তব্যস্থানে আসিয়া পৌঁছিল।''[৩১]

—আবার তাঁর দীর্ঘজীবনে একের পর এক প্রিয়জনদের মৃত্যুশোকে তিনি সাময়িকভাবে কাতর হলেও তা ঈশ্বরের ইচ্ছেতেই হয়েছে ভেবে নিজেকে সংযত রেখেছেন। আর এভাবে জীবনসায়াহ্নে

পৌঁছে তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন যে, এসব সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর তাঁকে আজও যে উদ্দেশ্যে চালিত করছে ঈশ্বরের সেই উদ্দেশ্য যেন পূর্ণতা পায়। তাঁর ভাষায়—

> ''আজ আমি এই সংসারে দীর্ঘ পথ বাহিয়া একাকিনী চলিয়াছি, পথে চেনা নূতন যাত্রী অনেক সঙ্গ লইয়াছে; কিন্তু পথের শেষ যে কবে খুঁজিয়া পাইব তাহাই ভাবিতেছি। হে ভগবান! এই সকল দুঃখ সুখের অন্তরালে তোমার শুভ ইচ্ছা যাহা আমায় পরিচালিত করিতেছে, যেন এই জীবনেই তাহার সফলতার পূর্ণ পরিণতি হয়।''[৩২]

—এভাবে সুদক্ষিণা সেন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে— সুখের দিনে, দুঃখের দিনে ঈশ্বরকে স্মরণ করতে ভোলেননি। ইন্দিরা দেবীও মনে করতেন ঈশ্বর আমাদের সারাজীবনের নিত্যসঙ্গী— আমাদের জীবনের সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ সকল ক্ষেত্রেই ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে থাকেন। এ প্রসঙ্গে ইন্দিরা দেবী *আমার খাতা*-য় লিখেছেন—

> ''অনন্তস্বরূপ ঈশ্বরকে আমরা সহস্ররূপে অন্তরে বাহিরে বিরাজিত দেখি। তিনি সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে আমাদের নিত্যসঙ্গী হইয়া রহিয়াছেন; তাঁহা অপেক্ষা প্রিয়তর আর কাহাকে পাইব? তিনি যেন আমাদের বিপদ সম্পদের সঙ্গী হইয়া রহিয়াছেন, সেইরূপ তিনি আমাদের জীবন মরণেরও সঙ্গী।''[৩৩]

ভক্তের ধারণা,ঈশ্বরের ইচ্ছেতেই এ জগতে সকল কার্য সম্পন্ন হয় এবং মানুষের যেকোনো ভালো কাজের পশ্চাতে থাকে ঈশ্বরের অনুগ্রহ। তাই সাধারণ ভক্ত কোনো ভালো কাজ সম্পন্ন করলে, তা ঈশ্বরের অনুগ্রহ তথা ঈশ্বরের ইচ্ছেতেই সম্পন্ন হয়েছে বলে মনে করে। শরৎকুমারী দেব এরূপ আধ্যাত্মিক ভাবনায় বিশ্বাসী ছিলেন। সকল ক্ষেত্রেই ঈশ্বরের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ বিশ্বাস। কন্যা নির্মলার দ্বিতীয় শিশু কন্যাটি কলেরা রোগে মারা গেলে তিনি এই ভেবে নিজেকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে, ঈশ্বরের কৃপায় নির্মলার কলেরা রোগে মৃত শিশু কন্যাটির জন্মের সময় থেকেই নির্মলা রোগে শয্যাশায়ী থাকায়, কন্যার সঙ্গে নির্মলার তেমন ঘনিষ্ঠতা না হওয়ায় কন্যার মৃত্যুশোক নির্মলার কাছে মর্মান্তিক হয়নি। আবার সারাজীবন ধরে শরৎকুমারী দেব একের পর এক প্রিয়জনদের মৃত্যুতে নিজেকে সংযত রেখেছেন এই ভেবে যে— জাগতিক সকল ঘটনাই ঈশ্বরের ইচ্ছেতেই হয়। বিনোদিনী দাসীর আধ্যাত্মিক ভাবনাও এরকম ছিল। তিনি *আমার কথা-য়* বলেছেন যে, তিনি *গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে হেমলতা* নাটকে হেমলতা চরিত্রে সফল অভিনয় করলে সকলে

তাঁর প্রশংসা করেছিলেন। তাই তাঁর মনে হয়েছিল যে, ঈশ্বরের ইচ্ছেতেই কিংবা অনুগ্রহেই নিতান্ত বালিকা বয়সেই তিনি এমন সুন্দর অভিনয় করতে সফল হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি *স্টার থিয়েটারে* গিরিশচন্দ্র ঘোষের *চৈতন্যলীলা* নাটকের চৈতন্য চরিত্র অভিনয়ে সফলতা পাওয়ার জন্যে ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছিলেন এবং চৈতন্য চরিত্রে অভিনয়ের পরে যখন তিনি সকলের প্রশংসা পেয়েছিলেন তখন তাঁর মনে হয়েছিল ঈশ্বরের ইচ্ছেতেই কিংবা অনুগ্রহেই তিনি সাফল্য পেয়েছিলেন। তাঁর ভাষায়—

> ''পরে জানিলাম, আমি যে তাঁর অভয় পদে স্মরণ লইয়াছিলাম তাহা বোধহয় ব্যর্থ হয় নাই। কেননা তাঁর যে দয়ার পাত্রী হইয়াছিলাম তাহা বহুসংখ্যক সুধীবৃন্দের মুখেই ব্যক্ত হইতে লাগিল। আমিও মনে মনে বুঝিতে পারিলাম যে ভগবান আমায় কৃপা করিতেছেন।''[৩৪]

—আবার বিনোদিনী দাসী জানতেন, মানুষের মধ্যে অহম্ বোধ এলে ইশ্বর বিরূপ হন। তাই তিনি একের পর এক নাটকে সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করে সকলের প্রশংসা পেলেও তা নিয়ে তাঁর মনে কখনো অহংকার সৃষ্টি হয়নি। আর এক্ষেত্রে তাঁর মনে হয়েছে করুণাময় ঈশ্বর তাঁকে অহম্ বোধ থেকে রক্ষা করেছেন। এভাবে জীবনের প্রতিটি সফল কার্যকে তিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহ বলেই মনে করেছিলেন।

মানব সংসারে সুখ, স্বস্তি, স্বাচ্ছন্দ্যের পাশাপাশি রয়েছে দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা। ইশ্বরকে বলা হয় করুণাময়— সকল জীবের প্রতি রয়েছে তাঁর অসীম করুণা। কিন্তু জাগতিক দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা দেখে সাধারণ মানুষের মনে সন্দেহ জাগে ঈশ্বরের করুণাময়তায়। যেমন, কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত *ঘুমের ঘোরে* কবিতায় লিখেছেন—

> ''ঈশা, মূশা আর বুদ্ধ,
> কন্‌ফুসিয়াস মহম্মদ বা কৃষ্ণ নিমাই সুদ্ধ,
> সবাই বলেছে, পাঠালেন মোরে নিজে তিনি ভগবান;
> তোমাদের তরে প্রাণ কাঁদে তাঁর— তোমাদেরি তিনি চান;
> উপায় পেয়েছি মুখ্য,—
> রবে না নরের জরা ব্যাধি শোক পাপ তাপ আদি দুঃখ;
> যেমন জগৎ তেমনি রহিল, নড়িল না একচুল;

ভগবান চান আমাদের শুভ— একথা হইল ভুল!”[৩৫]

— তবে পার্থিব দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা তথা অমঙ্গল দেখে অনেকে ঈশ্বরের করুণাময়তায় সন্দেহ করলেও যারা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসী তারা উপলব্ধি করে— এই আপাত অমঙ্গলের মধ্যে রয়েছে জীবের প্রতি ঈশ্বরের মঙ্গল ভাবনা। জগতে দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে সংগ্রাম করে মানুষ যাতে তার মনুষ্যত্বকে বিকশিত করতে পারে এবং মানুষ জীবনকে সার্থক করে তুলতে পারে সেজন্য ঈশ্বর নিজেই দুঃখ-কষ্ট তথা নানারকম অমঙ্গলের সৃষ্টি করে থাকেন। করুণাময় ঈশ্বর সম্পর্কে এরূপ ভাবনার ফলেই রাসসুন্দরী দাসী গভীর দুঃখের দিনেও নিজেকে সংযত রাখতে পেরেছিলেন। এ প্রসঙ্গে চিত্রা দেব বলেছেন—

> ‘‘শৈশব থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ঈশ্বরকেই একমাত্র শরণ্য হিসেবে গ্রহণ করায় রাসসুন্দরীর জীবন প্রসন্ন প্রশান্তির মধ্যেই কেটেছিল। বাপের বাড়িতে ছিলেন তাঁর গৃহদেবতা দয়ামাধব, শ্বশুরবাড়িতে মদনগোপাল— যত কিছু আবেদন-নিবেদন রাসসুন্দরী এঁদেরই জানাতেন। কোন অভিযোগ ছিল না, পরমেশ্বরের বিধানকেই তিনি সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।”[৩৬]

—তাই সন্তানদের ও স্বামীর মৃত্যুতে রাসসুন্দরী দাসী সাময়িক দুঃখ-কষ্ট পেলেও নিজেকে সংযত রেখেছেন এবং নিজের জীবনকে নিরর্থক মনে করেননি। কেননা তিনি জানতেন রোগ, শোক, দুঃখ প্রভৃতি প্রাকৃতিক অমঙ্গল ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং এগুলি ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য সাধন করে। রোগ, শোক, দুঃখ প্রভৃতি মানুষের ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে তাকে ধীর ও সাহসী করে তোলে— এগুলি মানুষের চরিত্র গঠনে সাহায্য করে এবং মানুষকে আধ্যাত্মিক আদর্শলাভ করতে সাহায্য করে। রাসসুন্দরী দাসী ঈশ্বরের এই উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই *আমার জীবন* গ্রন্থে নিজের জীবনের কথা বলতে গিয়ে স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি অনায়াসেই বলতে পেরেছিলেন—

> ‘‘যাহা হউক, আমি তাহাতে দুঃখিত নহি, পরমেশ্বর আমাকে যখন যে অবস্থায় রাখেন, সেই উত্তম।”[৩৭]

—লীলাবতী মিত্রও ছিলেন ঈশ্বরের মঙ্গলময় সত্তায় বিশ্বাসী। তাই তিনি *জীবনকথা*-য় বলেছেন, দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আমাদের আত্মনির্ভরতার শিক্ষা দেন; আমাদের চরিত্র গঠনের শিক্ষা দেন। তাঁর ভাষায়—

> ‘‘ভাবিয়া দেখিলে দুঃখের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকৃত মঙ্গলময়ী ইচ্ছা বর্তমান আছে,

ইহা বুঝা যায়। যখন দেখি যে, শারীরিক দুঃখে, মানসিক কষ্টে জগৎ অন্ধকার, সহ্য আর করিতে পারি না, মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যাইতেছে, পঞ্জর ভেদ হইতেছে। বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, আপন পর বিস্মৃত হইয়া যাইতেছে, সে সময় যদি অল্পক্ষণ চিত্তকে নিবিষ্ট করিয়া দুঃখের কথা ভাবি, দুঃখ আমাদের কী মঙ্গল করিতেছে, তখন দেখি, দুঃখই আমাদের আত্মনির্ভর শিক্ষা দিতেছে। আত্মা অনন্তকাল পরমাত্মার চরণে নির্ভর করিয়া থাকিবে, সেই নির্ভয় দুঃখ দ্বারা আমাদিগকে তিনি শিক্ষা দিতেছেন।''[৩৮]

—আমোদিনী দাশগুপ্তও পার্থিব দুঃখ-কষ্টের মূলে ঈশ্বরের মঙ্গল ভাবনাকেই উপলব্ধি করেছেন। তাই তাঁরও মনে হয়েছে দুঃখের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর তাঁকে আত্মনির্ভরতার শিক্ষা দিয়েছেন। স্বামীর এক ছাত্রের সঙ্গে তাঁর অবৈধ সম্পর্কের মিথ্যা অপবাদে বিশ্বাস করে স্বামী তাঁর সঙ্গে কথা বলাও বন্ধ করে দিলে তাঁর জীবন যন্ত্রণাময় হয়ে উঠেছিল। তবে তিনিও স্বামীর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেননি, বরং নিজস্ব একটা শান্তির জগৎ তৈরি করে নিয়েছিলেন সুখ-কল্পনার মধ্য দিয়ে। আর দুঃখের দিনে তাঁর এই সুখ-কল্পনার শক্তিকে তিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহ বলে মনে করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে আমোদিনী দাশগুপ্ত *আমার জীবন-কাহিনি* গ্রন্থে বলেছেন—

''লোকে বলে অগতির গতি স্বয়ং ভগবান। সে কথা ঠিক। এই সময় ভগবানের কৃপায় আমার কল্পনা করিবার একটা শক্তি জন্মিল। নিষ্কর্মা থাকিলে কল্পনা দেবীকে নিয়া বসিতাম। সে যে কী সুন্দর তাহা আর কী বলিব? এই কল্পনা দেবীর প্রসাদে আমার সকল অশান্তি দূর হইল।''[৩৯]

ভক্তরা ঈশ্বরকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে চায়। ভক্তের কাছে ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, করুণাময়। তিনি সকল জীবকে করুণা করে তাঁর আনন্দের অংশ দান করেন বলেই এই বিশ্বসংসার প্রেমময় ও আনন্দময় হয়ে উঠেছে। তাই দুঃখ ও বিপদের দিনে এবং পাপবোধ থেকে মুক্তি প্রত্যাশায় ঈশ্বরই একমাত্র আশ্রয় হওয়ায় ভগবৎ পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ ভিন্ন মানুষের মুক্তি নেই। এ প্রসঙ্গে কল্যাণচন্দ্র গুপ্ত ও অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন—

'' দুঃখ ও বিপদের দিনে মানুষ যখন নিজেকে একান্ত অসহায় বলে মনে করে, অথবা, পাপকার্য করার অনুশোচনায় যখন তার মন পীড়িত হয়, তখন সে এক অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তির আশ্রয় নিতে চায়, এক পরম পবিত্র পুরুষের সঙ্গে

নিজেকে যুক্ত করে সকল রকম ক্ষুদ্রতা, নীচতা ও মালিন্য থেকে মুক্তি পেতে চায়।"[৪০]

—ভক্তিমার্গের এই ভাবনাকে আত্মস্থ করে অনেক মানুষই ঈশ্বরের চরণে নিজেকে সমর্পণ করে মুক্তি প্রত্যাশা করেছেন। রাসসুন্দরী দাসীর মধ্যেও ভক্তিমার্গের এই ভাবনা আমরা লক্ষ করি। তিনি বার্ধক্যে দুঃখ, কষ্ট, পাপ থেকে পরিত্রাণের জন্যে ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের চরণে স্থান পেতে চেয়েছেন, ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি *আমার জীবন* গ্রন্থে লিখেছেন—

"হে পিতঃ করুণাময়! হে বিশ্বব্যাপী জগৎপালক! হে পরমেশ্বর! হে অনাথ নাথ! তোমার এ অনাথা তনয়াকে পাপ তাপ হইতে পরিত্রাণ করো, হে দয়ার সাগর ! হে পতিতপাবন দীনবন্ধু! এ অধীনী কন্যার প্রতি কিঞ্চিৎ করুণা প্রকাশ করো। হে দুর্বলের বল! হে সর্বশক্তিমান! হে নির্ধনের ধন! হে বিপত্তরণি! তোমার এ দুর্বল সন্তানকে ভবতরঙ্গ হইতে পার করো। তোমা ছাড়া থাকিতে পারি না।"[৪১]

—এই পার্থিব দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি প্রত্যাশায় ঈশ্বরের চরণে জীবন উৎসর্গ করার আধ্যাত্মিক ভাবনাটি চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে ইন্দিরা দেবীর *আমার খাতা* গ্রন্থের আধ্যাত্মিক ভাবনা সমৃদ্ধ একটি কবিতায়—

"দয়াময় নাম ভাবরে রটরে মন রসনা
অনায়াসে এড়াইবে এ ভব যন্ত্রণা
মিছে সংসারে মজে ভোগ এ লাঞ্ছনা
প্রাণ মন করি তাঁরে সমর্পণ
তাঁর কাজ করি চল না।"[৪২]

—সেকালের অনেক নারীর মতো সারদাসুন্দরী দেবীও বিশ্বাস করতেন যে, ভগবৎ পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ ভিন্ন জীবের মুক্তি নেই। তবে সারদাসুন্দরী দেবীর ঈশ্বরভাবনা সেকালে এদেশের অধিকাংশ হিন্দু নারীর তুলনায় পৃথক ছিল। কেননা সেকালে এদেশের অধিকাংশ হিন্দু নারী যেখানে সাকার ঈশ্বরের উপাসনা করেছেন সেখানে তিনি নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা করেছেন। যদিও তিনি প্রথম জীবনে শ্বশুরবাড়িতে বৈষ্ণবধর্ম মতে দীক্ষা নিয়েছিলেন তবুও পরবর্তীকালে ব্রাহ্ম পুত্র কেশবচন্দ্র সেনের প্রভাবে তিনি নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। তাই তিনি এই নিরাকার

ঈশ্বরের চরণে নিজেকে সমর্পণ করে মুক্তি প্রত্যাশা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি *আত্মকথা*-য় বলেছেন—

> ''আমার প্রাণের বিশ্বাস এই যে, এক ঈশ্বর এবং তাঁহার উপাসনা ভিন্ন আমার মুক্তি নাই। মানুষ যে সাকার উপাসনার দ্বারা মুক্তি পায় না, এই কথা আমি ঠিক বলিতে পারি না। নিরাকারের দ্বারা মানুষের মুক্তি হয়— ইহা আমি জানি এবং আমার নিজের মুক্তিও নিরাকারের উপর নির্ভর করিতেছে। আমি যে মুক্তি পাব এই আশা করি; শুধু তাঁর পাদপদ্মে থাকিব— এই মাত্র ইচ্ছা।''[৪৩]

—বিনোদিনী দাসীর মধ্যেও এরকম আধ্যাত্মিক ভাবনার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়। বিনোদিনী দাসী *আমার কথা*-য় বলেছেন, সকল মানুষের মধ্যে ঈশ্বর বিরাজমান হলেও তিনি অবাঙ্‌মনসগোচর হওয়ায় সাধারণ মানুষের পক্ষে তাঁর স্বরূপ ধারণা করা সম্ভব নয়। তাই বিনোদিনী ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার আশা করেননি। তবে ঈশ্বর করুণাময় হওয়ায় এবং জগতের সকল জীবের প্রতি ঈশ্বরের সমান করুণা থাকায় বিনোদিনী তাঁর বারাঙ্গনা জীবনের পাপ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় ঈশ্বরের চরণে স্থান পেতে চেয়েছেন। আবার শরৎকুমারী দেবেরও ঈশ্বরের প্রতি গভীর বিশ্বাস থাকায় শেষজীবনে তিনি পার্থিব দুঃখ-কষ্ট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মানব জীবন সার্থক করার প্রার্থনা জানিয়েছেন ঈশ্বরের কাছে । এ প্রসঙ্গে শরৎকুমারী দেব *আমার সংসার* গ্রন্থে লিখেছেন—

> ''হা ঠাকুর! এ হৃদয়মরু তো দীর্ণ বিদীর্ণ করে হল কর্ষণ করিতেছে! কবে শস্যবীজ বপন করিবে দেব! কবে এত দুঃখ ওই মহাসন বক্ষে ধরে সার্থক হবে? সেই মাহেন্দ্রক্ষণ যে এসেছে, এস তবে প্রভু! ধন্য কর, ধন্য কর। দুঃখের পাত্রে তোমার অমৃত ঢেলে দাও, চরিতার্থ হই। হে সকল সম্পদের চরম সম্পদ ! তোমাতেই আমায় ঐশ্বর্যশালী কর।''[৪৪]

—নিস্তারিণী দেবীও এরকম আধ্যাত্মিক ভাবনায় ভাবিত ছিলেন। নিস্তারিণী দেবীর *সেকেলে কথা* থেকে আমরা জানতে পারি, কৌলীন্যপ্রথা জনিত কারণে নিস্তারিণী দেবীর জীবন ছিল দুঃখময়-যন্ত্রণাময়। কুলীন কন্যা হওয়ায় তাঁর বিয়ে দেওয়া হয়েছিল এক বিবাহব্যবসায়ী কুলীন পাত্রের সঙ্গে এবং কুলীন পাত্ররা তাদের বিবাহিত স্ত্রীদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব না নেওয়ায় সেকালের কুলীন কন্যাদের মতো নিস্তারিণী দেবীকেও বিয়ের পরে বাপের বাড়িতেই থাকতে

হতো। অল্পবয়সেই নিস্তারিণী দেবী নিঃসন্তান অবস্থায় বিধবা হয়েছিলেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই সারাজীবন তাঁকে অপরের গলগ্রহ হয়ে অপমান, বঞ্চনা সহ্য করে বেঁচে থাকতে হয়েছে। তাঁর দুঃখ-যন্ত্রণার কেউ সমব্যথী ছিলেন না— তাঁর দুঃখ-যন্ত্রণা-বঞ্চনার কথা শোনার কেউ ছিলেন না। এমতাবস্থায় একমাত্র অনাথের নাথ ঈশ্বরই ছিলেন তাঁর একমাত্র নির্ভরতার আশ্রয় তথা পরিত্রাতা। তাই তিনি শেষজীবনে আর কারো গলগ্রহ হয়ে না থেকে সমস্ত দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি প্রত্যাশায় ভগবৎ পাদপদ্মে আশ্রয় লাভের জন্যে তীর্থস্থান কাশীতে চলে গিয়েছিলেন। লীলাবতী মিত্রের হৃদয়ও এরকম আধ্যাত্মিক চেতনায় পরিপূর্ণ ছিল। তাঁর *জীবনকথা* গ্রন্থের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে আধ্যাত্মিক ভাবনা। তিনিও ঈশ্বরকে একমাত্র রক্ষাকর্তা হিসেবে বিবেচনা করে ঈশ্বরের চরণে আত্মসমর্পণ করে পার্থিব দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি প্রার্থনা করেছেন। তাঁর ভাষায়—

> ‘‘সাধুদের নিকট শুনিতাম, তোমাতে নির্ভর করিতে হয়, সর্বস্ব তোমাতে সঁপিয়া দিতে হয়। যেমন কর্ণে শুনিতাম তেমনি মুখে বলিতাম মনে করিতাম সব দেওয়া, সব নির্ভর হয়ে গেল। কিন্তু আজ দেখি শুধু কথায় হয় না, সত্য সত্যই ঈশ্বরকে একমাত্র রক্ষাকর্তা বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া সব দিতে হয়।’’[৪৫]

—মানকুমারী বসুর হৃদয়ও ছিল আধ্যাত্মিক ভাবনায় পরিপূর্ণ। তিনি বিপদ থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্যে সর্বদা ঈশ্বরকে স্মরণ করতেন। কিন্তু তাঁর স্বামী মরণোন্মুখ হলে তিনি ঈশ্বরকে স্মরণ করলেও স্বামীর জীবন রক্ষা হয়নি বলে তিনি পরম করুণাময় ঈশ্বরের করুণায় সাময়িকভাবে আস্থা হারিয়েছিলেন। কিন্তু ক্রমে তিনি বুঝতে পারেন এ জগতের যাবতীয় ঘটনা ঈশ্বরের অভিপ্রায়েই ঘটে থাকে। তাই তিনি আবার ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রেখে কবিতাচর্চার মধ্য দিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করেছিলেন এবং উপলব্ধি করেছিলেন ঈশ্বর যেকাজে আমাদের পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন সেই কাজেই আমাদের জীবন উৎসর্গ করা উচিত। এ প্রসঙ্গে মানকুমারী বসু *আমার অতীত জীবন* গ্রন্থে বলেছেন—

> ‘‘ভগবান এ অধম সন্তানকে যে বিদ্যানুরাগ ও একটু কবিত্বশক্তি দিয়াছিলেন, তাহাই অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।
>
> ক্রমে মনে বুঝিলাম, জগতে থাকিতে হইলে বিশ্ববিধাতার কাজে আত্মোৎসর্গ করা উচিত।’’[৪৬]

—আর এভাবে ঈশ্বরের কাজে আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়েও মানুষ পার্থিব দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি

পেয়ে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে পারে।

অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদের প্রতিষ্ঠাতা শঙ্করাচার্যের মতে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য আর এ জগৎ মিথ্যা ও মায়াময় এবং জীবমাত্রই ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কোন কিছুর সত্তা স্বীকার করেননি। বস্তুত এই মায়ার জগতে আবদ্ধ হয়ে মানুষ ব্রহ্ম তথা ঈশ্বরের কথা ভুলে গিয়ে সংসার-বিষয়কর্মে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং তাকেই প্রত্যক্ষ সত্য বলে মনে করে। তাইতো সামান্য ধন-সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে মানুষে মানুষে এত দ্বন্দ্ব। তাই এই পৃথিবীতে মানুষ রোগ, শোক, দুঃখ ভোগ করে। কিন্তু মানুষ জীবনের বিশেষ মুহূর্তে অনুভব করে *'বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী'*, এ পৃথিবীতে কেউ কারো নয়, সন্তান-ধন-সম্পত্তি সবকিছুই মায়া এবং ব্রহ্ম তথা ঈশ্বরই একমাত্র সত্য। আর সেই ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়েই জীবন সার্থক হয়ে ওঠে। রাসসুন্দরী দাসী বার্ধক্যে এই দার্শনিক ভাবনায় উপনীত হয়েছিলেন। তাঁর কাছে মনে হয়েছিল মৃত্যুকালে ধন-সম্পত্তি, পরিবার-পরিজন কেউ সঙ্গে যাবে না, অন্তিমকালে একমাত্র ঈশ্বরই সহায় হবেন। *আমার জীবন* গ্রন্থের একটি কবিতায় রাসসুন্দরী দাসীর এই দার্শনিক ভাবনার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়—

> ''এই মিছা ধন জন, করিছ যতন, সকলি পড়িয়া রবে।
> ভেবে দেখ মন, একাই এসেছ, একাই যাইতে হবে।।
> এ যে নিজ পরিবার করে আপনার, পালিছ জনম হ'তে।
> শমন ভবন গমনকালে কেহত যাবে না সাথে।।
> এই মিছা ধন জন, পরের কারণ, যতন করিয়া মর।
> যদি পেয়েছ দুর্লভ মানব জনম তাহার কর্ম কর।।
> ... ...
> শমন ভবন গমন কালে কেবল গোবিন্দ সারথী।।
> ধন জন পুত্র কন্যা সব অকারণ।
> মরণ সময় কেবল আছেন শ্রীমধুসূদন।।''[৪৭]

— আর এই জীবন-অভিজ্ঞতা তথা দর্শনের জন্যেই মৃত্যুভয় রাসসুন্দরীকে বিচলিত করেনি, বরং মৃত্যুর পর ভগবৎ পাদপদ্মে স্থান পাবেন বলে তিনি মুক্তির আস্বাদ পেয়েছেন।

বৈষ্ণবীয় রসশাস্ত্রে পঞ্চরসের প্রথম রস হল শান্তরস। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ভগবদ্‌ভক্তি

প্রকাশের একটি বিশেষ ধারণাকেই শান্তরসের উপাসনা রূপে গ্রহণ করে থাকেন। ভক্ত যখন ঈশ্বরকে নিত্যবস্তু তথা একমাত্র সত্য বলে মনে করে বিষয়-বাসনা ত্যাগ করে ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে তখনই শান্তরসের উপাসনা হয়। ভক্তের হৃদয়ে শান্তরসের উদ্ভব হলে ভক্ত আনন্দের সংবাদেও যেমন আনন্দিত হয় না, তেমনি দুঃখের সংবাদেও দুঃখিত হয় না। সারদাসুন্দরী দেবী বিয়ের পর দেখেছেন তাঁর বৈষ্ণব শ্বশুর পুত্রের মৃত্যুতেও কাতর হননি। কেননা তাঁর শ্বশুর বিষয়-বাসনা ত্যাগ করে সর্বদা পরমার্থ চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। পূর্বেই বলেছি শ্বশুরের কাছেই সারদাসুন্দরী দেবী প্রথম জীবনে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেও পরবর্তীকালে তিনি পুত্র কেশবচন্দ্র সেনের প্রভাবে নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়েছিলেন। তবে বার্ধক্যে সারদাসুন্দরীর হৃদয়ে আবার পরম বৈষ্ণব ভক্ত শ্বশুরের মতো শান্তরসের উদ্ভব হয়েছিল। আসলে তাঁর অবচেতন মনে শ্বশুরের ভক্তি, নিষ্ঠা এবং পরমার্থ চিন্তার গভীর প্রভাব পড়েছিল, আর তার প্রকাশ ঘটেছে শেষজীবনে তাঁর শান্তরসের উপাসনার মধ্য দিয়ে। তাই সারদাসুন্দরী দেবী তাঁর জীবনের কথা বলতে গিয়ে *আত্মকথা* গ্রন্থে বলেছেন, জীবনসায়াহ্নে উপনীত হয়ে তিনি তাঁর বৃহৎ পরিবারের প্রতিনিয়ত সুখ-দুঃখের সংবাদে পূর্বের মতো এখন আর আনন্দিত হন না কিংবা কাতর হন না। কেননা তিনি বিষয়-বাসনা ত্যাগ করে ঈশ্বরকে একমাত্র সত্য বলে মনে করে ঈশ্বরের চরণে আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং এই মানব-সংসারের সুখ-দুঃখকে তিনি ঈশ্বরের লীলা বলে মনে করেছিলেন। তাঁর কথায়—

> ‘‘এই বৃহৎ পরিবারে প্রতিদিন কোনো স্থানে শোক দুঃখ, কোনো স্থানে বা আনন্দোৎসব হইতেছে। এই সমস্ত শোক দুঃখ, আনন্দোৎসবের খবর প্রায় রোজই আমার নিকট আসিতেছে। ভগবান আমাকে একেবারে আনন্দে কিংবা একেবারে দুঃখে থাকিতে দিতেছেন না। সুখে এবং দুঃখে তিনি আমায় পোড়াইতে পোড়াইতে সুখ দুঃখের বাহিরে লইয়া যাইতেছেন। আমার এক অংশ যেমন রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী, আর এক অংশ গৃহশূন্য, অর্থহীন, প্রায় পথের ভিখারি, সুতরাং সুখসংবাদেও আমি উতলা হইনা এবং দুঃখের সংবাদেও আমাকে কাতর করিতে পারে না। এই সমস্ত লীলাময় হরির খেলা মনে করি, এখন আমি এই প্রকাণ্ড পরিবারের মধ্যে বসিয়া, ভাই, এক চোকে হাসি আর এক চোকে কাঁদি।’’[৪৮]

—এভাবে সারদাসুন্দরী দেবী কখনো সাকার থেকে নিরাকার ঈশ্বর সাধনায় বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন,

আবার কখনো বৈষ্ণবীয় প্রভাবে তাঁর হৃদয় প্লাবিত হয়েছিল শান্তরসে। তাঁর এই আধ্যাত্মিক ভাবনাই তাঁর জীবনদর্শন হয়ে উঠেছে।

আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলিতে উনিশ শতকের এদেশের অধিকাংশ নারীর এবং লেখিকাদের আধ্যাত্মিক ভাবনার পরিচয় আমরা পেলাম। বস্তুত উনিশ শতকের যুক্তিবাদের দিনগুলিতেও এদেশের নারীদের হৃদয় কেন এবং কতটা আধ্যাত্মিক ভাবনায় পরিপূর্ণ ছিল, তা আমাদের বিশ্লেষণে উঠে এসেছে। মানব জীবনে এই আধ্যাত্মিক ভাবনারও গুরুত্ব আছে। আধ্যাত্মিক ভাবনার মূলে আছে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস। আবার ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসই মানুষের মনে বিশ্বাস করার মানসিকতা তৈরি করে দেয়, আর ঈশ্বরের প্রতি কোনো মানুষের বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ ঘটে অপর মানুষকে বিশ্বাস করার মধ্য দিয়ে। কেননা আধ্যাত্মিক ভাবনা অনুযায়ী এই বিশ্বসংসারে সকল জীব তথা মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্টি— কাজেই ঈশ্বরকে বিশ্বাস করলে তাঁর সৃষ্টিকে তথা মানুষকেও বিশ্বাস করতে হয়। আর এই বিশ্বাসই মানুষের বেঁচে থাকার পাথেয়— যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কাল থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় বিনষ্ট হয়ে গেছে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে এই আধ্যাত্মিক ভাবনারও একটি স্বতন্ত্র মূল্য আছে মানব জীবনে। আবার প্রতিটি মানুষ যখন উপলব্ধি করবে সকলেই পরমপুরুষ ঈশ্বরের সন্তান তখন মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূরীভূত হয়ে পারস্পরিক মিলনের যোগসূত্রটি দৃঢ় হবে— এই বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক ভাবনার দ্বারাই সম্ভব। বর্তমান সময়ে একজন মানুষের প্রতি অপর মানুষের, এক রাষ্ট্রের প্রতি অপর রাষ্ট্রের ঘৃণা, বিদ্বেষ, হিংসা দেখে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি এই বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের গুরুত্ব। আধ্যাত্মিক ভাবনা মানুষকে নীতিপরায়ণ, কর্তব্যপরায়ণ, উদার ও আত্মনির্ভরতার শিক্ষা দেয়। এভাবে আধ্যাত্মিক ভাবনা মানুষকে পরিপূর্ণ জীবন দান করে। সেজন্য আদিম যুগের তুলনায় বর্তমান যুগে আধ্যাত্মিক ভাবনার ভূমিকা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলিতে আধ্যাত্মিক ভাবনার যে পরিচয় আমাদের অন্বেষণে উঠে এসেছে, তার গুরুত্ব মানব জীবনে অনস্বীকার্য।

তথ্যসূত্র:

১. এডোয়ার্ডস্ ডি মায়াল : ধর্ম-দর্শন,অনুবাদ-সুশীল কুমার চক্রবর্ত্তী,পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, অক্টোবর ১৯৭৭, পৃ. ০৩

২. প্রাগুক্ত : পৃ. ৪৭

৩. প্রাগুক্ত : পৃ. ৪৯

৪. দেব চিত্রা : অন্তঃপুরের আত্মকথা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা:লি:, কলকাতা, অষ্টম মুদ্রণ: অক্টোবর ২০১৪, পৃ. ৮৬, ৮৭।

৫. চক্রবর্তী সম্বুদ্ধ : অন্দরে অন্তরে ঃ উনিশ শতকে বাঙালি ভদ্রমহিলা, স্ত্রী, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ: ২০১০, পৃ. ২০০

৬. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১৫২

৭. প্রাগুক্ত : পৃ. ২৩২

৮. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, চতুর্থ খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ১৮১

৯. প্রাগুক্ত : পৃ. ২২৩, ২২৪

১০. প্রাগুক্ত : পৃ. ২২৬

১১. প্রাগুক্ত : পৃ. ৫২, ৫৩

১২. প্রাগুক্ত : পৃ. ৫৩

১৩. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৭৮

১৪. প্রাগুক্ত : পৃ. ৮১, ৮২

১৫. প্রাগুক্ত : পৃ. ২১০

১৬. প্রাগুক্ত : পৃ. ৯৬

১৭. প্রাগুক্ত : পৃ. ৯০

১৮. প্রাগুক্ত : পৃ. ২৭৩

১৯. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৬০

২০. প্রাগুক্ত : পৃ. ২০৮

২১. প্রাগুক্ত : পৃ. ২৭৬

২২. প্রাগুক্ত : পৃ. ২০১

২৩. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, তৃতীয় খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৬৩

২৪. প্রাগুক্ত : পৃ. ১১৯

২৫. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, চতুর্থ খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ২০১, ২০২

২৬. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১০৩

২৭. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, চতুর্থ খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ১৮৪

২৮. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১২৮

২৯. প্রাগুক্ত : পৃ. ২৯৪

৩০. প্রাগুক্ত : পৃ. ২০০

৩১. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, চতুর্থ খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৭৩

৩২. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৩৮

৩৩. প্রাগুক্ত : পৃ. ২০২

৩৪. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৩২৭

৩৫. সেন সুনীলকান্তি (সম্পাদনা): যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কাব্যসংগ্রহ, ভারবি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ৪৯

৩৬. দেব চিত্রা : অন্তঃপুরের আত্মকথা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা:লি:, কলকাতা, অষ্টম মুদ্রণ: অক্টোবর ২০১৪, পৃ. ০৬

৩৭. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১১৩

৩৮. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, চতুর্থ খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ২৮০, ২৮১

৩৯. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, পঞ্চম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৪৮

৪০. গুপ্ত কল্যাণচন্দ্র ও বন্দ্যোপাধ্যায় অমিতাভ : ধর্ম-দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ: জুন ১৯৮১, পৃ. ১৬৮

৪১. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১১৪

৪২. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, চতুর্থ খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ২১৬

৪৩. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১৬০

৪৪. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, চতুর্থ খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ১৭০

৪৫. প্রাগুক্ত : পৃ. ২৪৭

৪৬. প্রাগুক্ত : পৃ. ২৩২

৪৭. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১৪৬,১৪৮

৪৮. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৮২

সপ্তম অধ্যায়

নারীর আত্মকথায় উনিশ শতক : ভাষা ব্যবহার প্রসঙ্গ

ভাষাবিজ্ঞানীদের প্রদত্ত সংজ্ঞাগুলি থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত অর্থযুক্ত বহুজনবোধ্য ধ্বনিসমষ্টির তথা শব্দের সাহায্যে মানুষ যখন পরস্পরের সঙ্গে ভাববিনিময় করে তখন তাকে ভাষা বলা হয়। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি মানুষ ভাষা ব্যবহার করে মনের ভাবকে প্রকাশ করার জন্য। আবার মানুষের এই ভাষা ব্যবহারে সমাজ ও সংস্কৃতির একটা বড় ভূমিকা থাকে। কেননা মানুষ সমাজবদ্ধ জীব এবং মানুষের সামাজিক পরিচয়ের ওপরে তার ভাষা ব্যবহার নির্ভর করে। অর্থাৎ মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থান, তার লিঙ্গ-বয়স-ধর্ম-শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রভৃতি পরোক্ষভাবে তার ভাষা ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই একই ভাব বা বিষয়কে বোঝাতে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ একই রকম ভাষা ব্যবহার করে না। আবার অনেক সময় উপলক্ষ ভেদে একজন মানুষ বিভিন্ন ধরনের ভাষা ব্যবহার করে থাকে। এ প্রসঙ্গে সুচরিতা বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন—

> ''... ভদ্র শিক্ষিত কোনো ব্যক্তি ক্ষেত্রবিশেষে ইতরভাষা ব্যবহার করেন, আর একারণেই সমাজভাষাবিজ্ঞানে গুরুত্ব পায় উপলক্ষ। ইংলণ্ডের ভাষাবিজ্ঞানীরা উপলক্ষ অনুযায়ী পরিবর্তিত ভাষাভঙ্গির নাম দিয়েছেন Register-language according to use। একারণেই ক্লাসে পড়ানোর ভাষা, সভায় বক্তৃতাদানের ভাষা, ঝগড়ার ভাষা, প্রেমের ভাষা, আদালতের ভাষা, রাজনীতির ভাষা, সাংবাদিকতার ভাষা— কখনোই একরকম হয় না। কী মৌখিক, কী লিখিত— উভয়তই ভাষাভঙ্গিতে প্রতিবেশ অনুযায়ী পার্থক্য চোখে পড়ে। ... উপলক্ষ অনুযায়ী ভাষার বা উপভাষার এই পরিবর্তনকে সমাজভাষাবিজ্ঞানীরা বলেন Code switching, যা বিবর্তনমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়।''[১]

—এছাড়া বক্তা কোন ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলার সময়ে যে ধরনের ভাষা ব্যবহার করে থাকে, তা নির্ভর করে শ্রোতার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং বক্তার সঙ্গে শ্রোতার ব্যক্তিগত সম্পর্কের ওপর। অর্থাৎ মানুষের ভাষা ব্যবহারে সমাজের একটা বড়ো ভূমিকা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন হল ভাবের বিষয়, আর এই ভাবের বিষয় প্রকাশিত হয়

ভাষার মধ্যে দিয়ে। অর্থাৎ সাহিত্যে বিষয় যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি এর প্রকাশ মাধ্যম ভাষা তথা ভাষা ব্যবহারও গুরুত্বপূর্ণ। একজন সাহিত্যিকের ভাষা ব্যবহার বলতে আমরা বুঝি শব্দ যোজনা, পদবিন্যাস, বাক্যগঠন প্রভৃতি। আর একজন সাহিত্যিকের এই ভাষা ব্যবহার নির্ভর করে তাঁর ব্যক্তিত্ব তথা মানসিক প্রবণতার ওপর। এ প্রসঙ্গে শিশিরকুমার দাশ বলেছেন—

> ''সাহিত্যিক রচনামাত্রেরই মাধ্যম ভাষা, তখন ভাষার আলোচনার মধ্যেই রচনারীতির মূল রহস্য ধরা যেতে পারে। ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনাই তাই রীতিবিচারের অন্যতম পথ। এই আলোচনায় রচনারীতির সব রহস্যই ধরা পড়বে এ রকম কুসংস্কার অবশ্যই মূঢ়তা। কিন্তু লেখকবিশেষের শব্দ ব্যবহার, শব্দগঠন, বাক্যগঠন, বাক্যসজ্জার মধ্যে তাঁর ব্যক্তিত্বের কোন কোন রূপ, কোন কোন মানসিক প্রবণতা প্রতিফলিত হতে বাধ্য।''[২]

— একজন লেখক যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে বেড়ে ওঠেন সেই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রভাবে তাঁর ব্যক্তিত্ব তথা মানসিকতা তৈরি হয়। আর একজন লেখক যখন সাহিত্য সৃষ্টি করেন তখন তিনি ঘটনার বর্ণনায় তাঁর ব্যক্তিত্ব তথা মানসিকতা অনুযায়ী ভাষা ব্যবহার করেন।

আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলির লেখিকারা রক্ষণশীল সমাজের নানা প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে লেখাপড়া শিখে নিজেদের জীবনের কাহিনিকে তুলে ধরেছেন সহজ-সরল ভাষায়। স্বাভাবিকভাবেই সমসাময়িক লেখকদের তুলনায় তাঁদের ভাষা ব্যবহার আলাদা হয়ে গেছে। আবার উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রক্ষণশীলদের সঙ্গে প্রগতিশীলদের নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এদেশের নারীদের প্রাথমিক শিক্ষা মোটামুটিভাবে স্বীকৃত হলেও তখনও এদেশে নারীদের উচ্চ শিক্ষা স্বীকৃতি লাভ করেনি। ফলে আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলির লেখিকারা কখনো বাড়িতে, কখনো বালিকা বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে যখন নিজেদের জীবন-কাহিনি লিখেছেন তখন তাঁদের রচনায় বিস্তর বানান-ব্যাকরণগত ভুল-ত্রুটি লক্ষ করা যায়। এছাড়া তাঁরা নিজেদের জীবনের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে একদিকে যেমন নিজেদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট থেকে ভাষা ব্যবহার করেছেন, অন্যদিকে তেমনি নিজেদের মনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, ঈশ্বরভক্তি প্রভৃতি ভেদে ভিন্ন ধরনের ভাষা ব্যবহার করেছেন; কখনো অন্যদের কথা বলতে গিয়ে অন্যদের সঙ্গে তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিন্নতা অনুযায়ী তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ব্যবহার করেছেন। আবার নিজেদের জীবনকথাকে তাঁরা মূলত সাধুভাষার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করলেও সেই সাধুভাষায়

কখনো কখনো সাধুভাষার ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের পাশাপাশি চলিত ভাষার ক্রিয়াপদ ও সর্বনামেরও ব্যবহার লক্ষ করা যায়। আবার ছোট ছোট বাক্যগঠনে এবং একের পর এক সংক্ষিপ্ত বাক্যসজ্জার মধ্য দিয়ে তাঁরা বক্তব্য বিষয়কে সহজ-সরল ভাবে প্রকাশ করেছেন।

উপলক্ষ ভেদে মানুষের ভাষা ব্যবহার বদলে যায়। জীবনে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, ওঠা-পড়া প্রভৃতি লেগেই থাকে। আর জীবনের এরকম বিভিন্ন উপলক্ষে মানুষের ভাষা ব্যবহার এক থাকে না। কেননা মানুষ আনন্দের কথা যেরকম হৃষ্টচিত্তে প্রকাশ করতে পারে, দুঃখের কথা সেভাবে প্রকাশ করতে পারে না। তাই আমাদের পরিতৃপ্তির ভাষা, শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের ভাষা, ব্যক্তিগত দুর্দশা বর্ণনার ভাষা, ঈশ্বরের প্রতি আত্মনিবেদনের ভাষা প্রভৃতি এক ছাঁদের হয় না। আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলিতে এরকম উপলক্ষ ভেদে ভিন্ন ভাষারীতির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যেমন রাসসুন্দরী দাসী *আমার জীবন* গ্রন্থে বলেছেন, শ্বশুরবাড়িতে প্রথম দিকে তাঁকে সাংসারিক কাজ করতে না হলেও পরবর্তীকালে শাশুড়ি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে একা হাতে সংসারের যাবতীয় কাজ করতে হতো। তিনি আঠারো থেকে একচল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত অনেকগুলি সন্তানের জন্ম দেন। এসময় সাংসারিক কাজকর্মের পাশাপাশি অনেকগুলি সন্তান লালন-পালন করতে গিয়ে কাজের চাপে তাঁর কোন কোন দিন দু'বেলা, আবার কোন কোন দিন একবেলাও খাওয়ার অবসর মিলত না। সেই ব্যক্তিগত দুর্দশার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—

> ''ইহার মধ্যে ওই তেইশ বৎসর আমার যে কী প্রকার অবস্থায় গত হইয়াছে তাহা পরমেশ্বর জানিতেন, অন্য কেহ জানিত না।''[৩]

— আবার মা-এর মৃত্যুকালে তিনি মা-কে দেখতে যেতে পারেননি। তাঁর সেই শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের ব্যাকুলতা প্রকাশিত হয়েছে এই ভাষায়—

> ''আহা! আমি মাকে দেখিবার জন্য কতপ্রকার চেষ্টা পাইয়াছিলাম, কিন্তু আমার দূরদৃষ্টি হেতু কোনক্রমেই যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। এটি কী আমার সাধারণ আক্ষেপের বিষয়!''[৪]

—এই আক্ষেপের ভাষা বদলে যায় যখন তিনি তাঁর সৎচরিত্র ও বিদ্বান সন্তানদের কথা হৃষ্টচিত্তে ব্যক্ত করেন—

> ''আমার যেমন দশ বারোটি সন্তান হইয়াছিল, তেমনি যদি উহাদিগের চরিত্র মন্দ হইত এবং সকলে মন্দ বলিত, তাহা হইলে আমার ভারী কষ্ট ভোগ করিতে

হইত। ঈশ্বরেচ্ছায় আমার সে সকল কষ্ট ভোগ করিতে হয় না, বরং লোকের মুখে উহাদিগের প্রশংসা শুনিয়া এবং সত্য ব্যবহার দেখিয়া, মন আরও প্রফুল্লই হয়।"[৫]

—আবার এই আত্মতুষ্টির ভাষা বদলে যায় যখন তিনি একান্ত ভক্তি-নিষ্ঠা সহকারে ঈশ্বরের কাছে মুক্তি প্রার্থনা করেছেন—

"হে পিতঃ করুণাময়! হে বিশ্বব্যাপী জগৎপালক! হে পরমেশ্বর! হে অনাথ নাথ! তোমার এ অনাথা তনয়াকে পাপ তাপ হইতে পরিত্রাণ করো, হে দয়ার সাগর! হে পতিতপাবন দীনবন্ধু! এ অধীনী কন্যার প্রতি কিঞ্চিৎ করুণা প্রকাশ করো। হে দুর্বলের বল! হে সর্বশক্তিমান! হে নির্ধনের ধন! হে বিপত্তরণি! তোমার এ দুর্বল সন্তানকে ভবতরঙ্গ হইতে পার করো। তোমা ছাড়া থাকিতে পারি না।"[৬]

কৈলাসবাসিনী দেবীর *ডায়েরী* গ্রন্থেও উপলক্ষ ভেদে ভিন্ন ভাষা ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন- তিনি কন্যার কথা বলতে গিয়ে আত্মতৃপ্তির ভঙ্গিতে লিখেছেন—

"আর আমার কন্যার মতন কন্যে কেউ পাবে না। আমার কন্যা রূপে নক্ষি গুণে সরোস্বতি।"[৭]

— এই ভাষায় সন্তানের প্রতি তাঁর যে আবেগ লক্ষ করা যায়, সেই আবেগ নিরাকার ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর যুক্তি প্রদানের ভাষায় লক্ষ করা যায় না—

"বিজ্ঞ লোকে ঠিক করে নিয়ম নির্ধার্য্য করেছেন। আর তাঁরা জানতেন এক-মেবাদ্বিতীয় ওঁ জেনেও পুতুল পূজার সৃজন করেন, তার কারণ এই, নির্বোধ বানর মানুষ অনেক আছেন তারা ক্রমে নাস্তিক হইতে নাগিল। তারা বলিতো জাঁর হাত নাই পা নাই নিরাকার তিনি আমাদের কি করিবেন, এই শকলে বুযিতে নাগিল। তাইতে নানান মূর্ত্তির দেবতা সৃজন হইল, পূজাদির বিধান হইল।"[৮]

—আবার স্বামীর মৃত্যুতে তাঁর এই যুক্তি প্রদর্শনের ভাষা দুঃখ-শোকের ভাষায় বদলে যায়—

"আজ আমার জিবোন শেষ হইল। আজ শ্রাবোন মাসের ২৪ তারিক শুক্লপক্ষের তেরোদশি, আজ বুদবার আজ ঝুলন জাত্রা রাত্র ১১ ঘণ্টার শময়ে আমি ঐহিকের সুখে জলাঞ্জলি দিলুম। আমার জিবন থাকিতেও মৃত্যু হইল। শকল সুকের শেষ করিলাম কাসি মিত্রের ঘাটে।"[৯]

—উনিশ শতকেও এদেশের নারীদের কাছে *বিধবা* শব্দটি ছিল একটি আতঙ্কের শব্দ। কেননা সেকালের পিতৃতান্ত্রিক সমাজ বিধবা নারীদের কঠোর ব্রত এবং ব্রহ্মচর্য পালনের বিধান দিয়েছিল। এছাড়া সেকালে বিধবা নারীদের অলুক্ষণে বলে মনে করে তাদের কোন মঙ্গলানুষ্ঠানে যোগদান করতে দেওয়া হতো না। তাই সেকালে এদেশের অধিকাংশ নারীই স্বামীর মৃত্যুতে তাঁদের জীবন নিরর্থক বলে মনে করতো। তাই তারা নিজেদের দুর্ভাগ্যের কথা বোঝাতে *বিধবা* শব্দটির ব্যবহার করতো। কৈলাসবাসিনী দেবীও *বিধবা* শব্দের ব্যবহারের মাধ্যমে তাঁর দুর্ভাগ্যের কথা তুলে ধরেছেন—

> ''আমি শামবাজারে গিয়েছিলাম— সুখের ব্রতো উয্যাপন করিতে। আমি কি পাযান, আবার আমি কেমন করে বাগানে আশিলাম, তাহা আমি জান্তে পারি নাই। আমি শেখান থেকে বিধবা নাম নে আশিলাম। এই নামটি আমার কানে এলে বুকে জেন বজরাঘাত বোধ হয়।''[১০]

—এক্ষেত্রেও আমরা লক্ষ করলাম, উপলক্ষ ভেদে কৈলাসবাসিনী দেবীর ভাষা ব্যবহার বদলে গেছে।

প্রসন্নময়ী দেবীর *পূর্ব্বকথা* গ্রন্থেও উপলক্ষ ভেদে ভিন্ন ভাষা ব্যবহারের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। তিনি জেঠিমা কুলসুন্দরী দেবীর গুণের কথা বলতে গিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে লিখেছেন—

> ''আমার জেঠিমাতা ঁকুলসুন্দরী দেবী গ্রামের ভিতরে সর্ব্বাংশে পূর্ণমাত্রায় গৃহিণী ছিলেন। ... তিনি রন্ধনে দ্রৌপদী, পাঁচ সাত শত নিমন্ত্রিত ব্যক্তির ভোজ অনায়াসে রন্ধন ও পরিবেশন করিতে পারিতেন, তাহাতে তাঁহার ধৌত বস্ত্রে একটু মাত্র মলিনতার চিহ্ন পরিলক্ষিত হইত না।''[১১]

— এই ভাষা ব্যবহার আবার বদলে গেছে তাঁর পিতার মৃত্যুতে। পিতার মৃত্যুকে উপলক্ষ করে তিনি যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তাতে তাঁর শোক সন্তপ্ত হৃদয়ের হাহাকার শোনা যায়—

> ''তাঁহার স্বর্গারোহণে আমরা সে স্নেহ, মায়া, মমতা ও নিরাপদ আশ্রয় চিরদিনের জন্য হারাইলাম, আর কোথায় পাইব ? তিনি একাধারে জনক জননী ও ক্ষমাশীল যথার্থ বন্ধু ছিলেন। দয়াময় ঈশ্বরের নিকট যেমন অনুতাপে সর্ব্বপাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে, তেমনি সেই পার্থিব দেবতার কছে আমাদিগের এক বিন্দু সরল অশ্রুজলে 'সাত খুন মাপ' হইয়া যাইত। তাহার অভাব এ জীবনে কিছুতেই মোচন

হইবার নহে।”[১২]

— সেকালের মানুষ পুণ্য অর্জনের জন্যে গঙ্গাস্নানে যেতো এবং গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে অনেকেই কলেরা প্রভৃতির মতো সংক্রামক ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মারা যেতো। তবুও ধর্মান্ধ মানুষ গঙ্গাস্নানে পুণ্য অর্জনের বাসনা ত্যাগ করতো না। কিন্তু এসবই যে ধর্মের প্রতি অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংস্কার— তা বর্ণনা করতে গিয়ে প্রসন্নময়ী দেবী যুক্তিসম্মত ভাষা ব্যবহার করেছেন—

> ‘‘এইরূপ এক এক পুণ্যযোগে বঙ্গমাতার বহু সন্তান সন্ততি ইহলোক হইতে চলিয়া যাইয়া গ্রাম নগর শূন্যময় করিয়া থাকেন, তথাপি ধর্মান্ধ গভীর বিশ্বাসী হিন্দুগণ আজীবন ভাগীরথী স্নানের সুযোগ কখন ত্যাগ করেন না এবং মুক্তি লাভার্থে সকল বিপদ অতিক্রম করিয়া লোকান্তরের মোক্ষ সঞ্চয় করেন। ধর্ম্মে কী অটল বিশ্বাস।”[১৩]

— উপরের দৃষ্টান্তগুলি থেকে আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, উপলক্ষ ভেদে প্রসন্নময়ী দেবীর ভাষা ব্যবহার বদলে গেছে।

উপলক্ষ ভেদে ভাষা পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত বিনোদিনী দাসীর *আমার কথা* গ্রন্থেও লক্ষ করা যায়। তিনি তাঁর বারাঙ্গনা জীবনের একাকীত্বের যন্ত্রণা প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> ‘‘... আমার আত্মীয় নাই, আমি ঘৃণিত, সমাজবর্জ্জিতা, বারবনিতা; আমার মনের কথা বলিবার বা শুনিবার কেহ নাই! তাই কালি কলমে লিখিয়া আপনাকে জানাইলাম। আমার কলুষিত কলঙ্কিত হৃদয়ের ন্যায় এই নির্ম্মল সাদা কাগজকেও কলঙ্কিত করিলাম।”[১৪]

—আবার যখন তিনি গিরিশচন্দ্র ঘোষের *চৈতন্যলীলা* নাটকে চৈতন্য চরিত্রে অসামান্য অভিনয় করে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন তখন তাঁর ভাষা ব্যবহারে ঘৃণ্য বারাঙ্গনা জীবনের মর্মবেদনার কোন আভাস পাওয়া যায় না—

> ‘‘... তিনি প্রসন্ন বদনে উঠিয়া নাচিতে নাচিতে বলিতেন: ‘হরি গুরু, গুরু হরি,’ বল মা ‘হরি গুরু, গুরু হরি’, তাহার পর উভয় হস্ত আমার মাথার উপর দিয়া আমার পাপ দেহকে পবিত্র করিয়া বলিতেন যে, ‘মা তোমার চৈতন্য হউক।’ তাঁর সেই সুন্দর প্রসন্ন ক্ষমাময় মূর্তি আমার ন্যায় অধম জনের প্রতি কী করুণাময় দৃষ্টি। পাতকীতারণ পতিতপাবন যেন আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমায় অভয়

দিয়াছিলেন।"[১৫]

—এভাবে উপলক্ষের পরিবর্তনে বিনোদিনী দাসীর ভাষা ব্যবহারেও পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

সুদক্ষিণা সেনও *জীবন স্মৃতি* গ্রন্থে উপলক্ষ ভেদে ভিন্ন ধরনের ভাষা ব্যবহার করেছেন। তিনি তাঁর মাতামহের মৃত্যুতে লিখেছেন—

> "... আমার পুণ্যাত্মা দাদামহাশয়ের দেহ সেইস্থানেই দাহ করা হইল। আমরা স্কুলের আটচালা ঘরে বসিয়া পুণ্যকার্য্য দর্শন করিলাম। এমন পরম স্নেহশীল দাদামহাশয়ের অভাবে প্রাণে অত্যন্ত আঘাত লাগিল। আমি অনেক সময়ই পুকুরঘাটে যাইয়া কাঁদিতাম।"[১৬]

— এখানে অন্তরের শোক প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি যে ধরনের ভাষা ব্যবহার করেছেন, তার ব্যবহার অন্যত্র দেখা যায় না। যেমন— নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়ে হিন্দুধর্মের বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান ছিন্ন করে সুদক্ষিণা সেন যেদিন সপরিবারে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেছিলেন সেদিনের কথা বলতে গিয়ে সুদক্ষিণা সেন জানিয়েছেন—

> "এ আনন্দ যে প্রাণে ধরে না! এ সুখ কোথায় রাখিব? হে দয়াময়! তোমাকে কী বলিয়া ধন্যবাদ দিব জানি না। ব্রহ্মমন্দির হইতে যখন বাড়ি ফিরিলাম তখন যেন অন্য মানুষ হইয়া গিয়াছি,— যেন নূতন জীবন লাভ করিলাম।"[১৭]

—এই ভাষা আত্মতৃপ্তির আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

উপলক্ষ ভেদে ভিন্ন ধরনের ভাষা ব্যবহার করেছেন ইন্দিরা দেবী *আমার খাতা* গ্রন্থে। পিতার প্রতি শ্রদ্ধাবশত তিনি লিখেছেন—

> "আমার পূজনীয় পিতৃদেব কলকাতার ঠাকুর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি শৈশবে ঐশ্বর্য্যের মধ্যে প্রতিপালিত হন, তাঁহার বাল্য যৌবন ভোগৈশ্বর্য্যের মধ্যেই কাটে, তথাপি তিনি সংস্কৃত ও ইংরেজি বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, এক কথায় বলিতে গেলে শিক্ষিত ছিলেন।"[১৮]

—আবার মায়ের মৃত্যুতে গভীর শোকাহত হয়ে তিনি যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তার মধ্যে গভীর দুঃখের হাহাকার ব্যক্ত হয়েছে—

> "তখন আকুল হইয়া আমার বুক ফাটিয়া চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল, ... স্বর্ণপ্রতিমা দগ্ধ হইতে চলিল, আমি দগ্ধ হৃদয়ে গৃহে পড়িয়া রহিলাম। দুই দিন

শোকে দুঃখে কাটিয়া গেল।" [১৯]

— আবার এই শোক সন্তপ্ত হৃদয়ের ভাষার পরিবর্তন হয় ঈশ্বরের চরণে তাঁর আত্মসমর্পণের ভাষায়—

> ''হে দয়াময়, তুমি আমাদের পাপতাপ শোকদুঃখপূর্ণ সংসারে একমাত্র গতি। এই বিপদরূপ সংসারসমুদ্রে তুমি আমাদের ধ্রুবতারা। এই সংসার সাগরে তোমার চরণ-তরি আমাদের একমাত্র আশ্রয়; আমরা যেন বিপদে সম্পদে সুখে-দুঃখে তোমাকে না হারাই এই তোমার চরণে প্রার্থনা।"[২০]

—এই ভাষার মধ্যে রয়েছে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি-নিষ্ঠা ও নির্ভরতার বাসনা। আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলি থেকে আমরা যেসব দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করলাম সেগুলির ভাষা দেখলেই আমরা বুঝতে পারি কোন্‌টি ব্যক্তিগত দুর্দশার ভাষা, কোন্‌টি শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ের ভাষা, কোন্‌টি আত্মতৃপ্তির ভাষা, কোন্‌টি ঈশ্বরের কাছে ভক্তি-নিষ্ঠা সহকারে প্রার্থনার ভাষা। আসলে মানুষ জীবনে যখন যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় তখন সেই পরিস্থিতির সাপেক্ষে ভাষা ব্যবহার করে। তাই আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলির লেখিকারা জীবনের কথা বলতে গিয়ে জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ধরনের ভাষা ব্যবহার করেছেন। ফলে তাঁদের রচনায় উপলক্ষ ভেদে ভিন্ন ধরনের ভাষা ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

আমরা কথা বলি মনের ভাবকে ব্যক্ত করার জন্যে। কিন্তু আমরা সকলের সঙ্গে একভাবে কথা বলি না, কিংবা সকল ব্যক্তি সম্পর্কে কোন মন্তব্য করতে হলে একরকম ভাষা ব্যবহার করি না। আমরা বাড়ির কাজের লোকের সঙ্গে যে ভাষার কথা বলি একজন সম্মানীয় ব্যক্তির সঙ্গে সে ভাষায় কথা বলি না। কেননা বক্তা তথা কোন ব্যক্তির ভাষা ব্যবহার নির্ভর করে তার নিজের এবং শ্রোতা তথা যার সম্পর্কে বলা হচ্ছে তার সামাজিক পরিচয়ের ওপর। এই বক্তা এবং শ্রোতার নানারকম সামাজিক পরিচয় থাকে। একজন বক্তার ভাষা ব্যবহার নির্ভর করে তার বয়স, শিক্ষা, ধর্ম, লিঙ্গ প্রভৃতি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের পাশাপাশি শ্রোতার সঙ্গে তার ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে। আবার শ্রোতারও থাকে এরকম নানা সামাজিক পরিচয়। এভাবে বক্তা ও শ্রোতার সামাজিক পরিচয়ের ওপর ভিত্তি করেই বক্তার ভাষা ছাঁদের পরিবর্তন হয়। তাই আমরা গুরুজনদের সম্পর্কে যেরকম ভাষা ব্যবহার করি বন্ধুদের সম্পর্কে সেরকম ভাষা ব্যবহার করি না, আবার সন্তানদের সঙ্গে কথা বলার সময় আমাদের ভাষা ব্যবহার বদলে যায়। এভাবে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক পরিচয়ের

ওপর ভিত্তি করে বক্তার ভাষা ব্যবহার বারবার বদলে যায়। যেমন, রাসসুন্দরী দাসী *আমার জীবন* গ্রন্থে স্বামী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন—

> ''আমার জীবন বৃত্তান্ত যৎকিঞ্চিৎ লিখিত হইল, কিন্তু আমার জীবন চরিতের মধ্যে কর্তার সম্বন্ধীয় কোনো কথাই লিখিত হয় নাই। তাহাতে আমার বোধহয়, এ পুস্তকখানি অঙ্গহীন হইয়াছে, যাহা হউক, আমি যে তাঁহার গুণবর্ণনে সমর্থ হইব, আমি এমন যোগ্য নহি। বাস্তবিক সে সমুদয় কথা বলা অতি বৃহদ্ব্যাপার! তাহা বিস্তারিত করিয়া বলা আমার সাধ্য নহে, তবে কিঞ্চিৎ মাত্র বলিতে পারি যে, তিনি অতি উত্তম লোক ছিলেন।''[২১]

—সেকালে স্বামীকে গুরুজনতুল্য মনে করা হতো। তাই স্বামীর কথা বলতে গিয়ে রাসসুন্দরীর ভাষায় ভক্তি-শ্রদ্ধার ভাবটি ব্যক্ত হয়েছে। আবার যে রাসসুন্দরী দাসী স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাবশত ভাষা ব্যবহারে অত্যন্ত সংযত, সেই রাসসুন্দরী দাসীই আবার পঞ্চম পুত্র দ্বারকানাথের কাছে বাল্মীকি রচিত *রামায়ণ* গ্রন্থটি এনে দেওয়ার জন্যে অনায়াসেই দাবি জানিয়ে বলতে পারেন—

> ''যাহা হউক আমার মন সেই সপ্তকাণ্ড বাল্মীকি-পুরাণের জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইল। কিন্তু ইতিমধ্যে আমার সেই ছেলেটি কলিকাতা হইতে বাটীতে আসিল। আমি তাহার নিকট বলিলাম, দ্বারি! তোমাদের ঘরে অনেক পুস্তক আছে, কিন্তু সপ্তকাণ্ড নাই। তাহার একখানা পাইলে বড়ো ভালো হয়।''[২২]

—এভাবে রাসসুন্দরী দাসীর ভাষা ব্যবহার বদলে গেছে স্বামী ও পুত্রের সঙ্গে তাঁর সামাজিক ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে।

অনেক সময় আবার যার সম্পর্কে কিছু বলা হয় তার সামাজিক পরিচয়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেও বক্তার ভাষা ব্যবহার বদলে যায়। যেমন, প্রসন্নময়ী দেবী *পূর্ব্বকথা* গ্রন্থে ছেলেবেলায় ভাই আশুতোষ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সাধারণ অর্থে *লাগিল* ক্রিয়াপদটি ব্যবহার করে বলেছেন—

> ''আশু স্কুলে ভরতি হইয়া নিয়মমতো অধ্যয়ন করিতে লাগিল।''[২৩]

— কিন্তু পরবর্তীকালে আশুতোষ যখন কলেজের পড়া শেষ করে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্যে বিদেশ যাত্রা করেন তখন তাঁর সেই বিদেশ যাত্রার বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রসন্নময়ী দেবীর ভাষা ব্যবহার বদলে গেছে—

''এই বৎসরই ১৮৮১ সালের মার্চ্চ মাসে আশু বিলাত রওনা হইয়া যান।''[২৪]

—এখানে প্রসন্নময়ী দেবী ভাই আশুতোষের কথা বলতে গিয়ে পূর্বের মতো সাধারণ অর্থে *যায়* ক্রিয়াপদের ব্যবহার না করে সম্মানার্থে *যান* ক্রিয়াপদটি ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ আশুতোষের সামাজিক পরিচয়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কথা বলতে গিয়ে প্রসন্নময়ী দেবীর ভাষা ব্যবহারও বদলে গেছে।

এদেশের পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর পক্ষে স্বামী ও গুরুজনদের নাম উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ ছিল। আর নারীরা যাতে স্বামী ও গুরুজনদের নাম উচ্চারণ না করে সেজন্যে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ সামাজিক ও শাস্ত্রীয় বিধানের দ্বারা প্রচারিত করেছিল যে, স্বামীর ও গুরুজনদের নাম উচ্চারণ করলে নারীর পাপ হবে। তাই বাংলাদেশের নারীরা সাধারণত স্বামী ও গুরুজনদের নাম উচ্চারণ করতো না। তবে প্রয়োজনে তারা স্বামীর নাম বোঝাতে *তাঁর, উনি, তিনি* প্রভৃতি ব্যক্তিবাচক সর্বনাম ও বিকল্প শব্দ ব্যবহার করতো। এ প্রসঙ্গে সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন—

> "Bengali women are not allowed to mention the name of their husbands and that of their Parents and seniors. The wife generally uses the third personal denominative pronouns, e.g., উনি < he yonder>, তিনি < he>, and also the words বাবু < Mister>, কর্ত্তা <master (of the house)>, or ফলনা <N.N.> (borrowed from persian) to designate her husband."[২৫]

—এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে দেবী অন্নপূর্ণা ঈশ্বরী পাটুনীর কাছে তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলেন, যেহেতু নারীরা স্বামীর নাম উচ্চারণ করে না সেহেতু তিনি বিশেষণে স্বামীর পরিচয় দেবেন। উনিশ শতকেও এদেশের নারীরা স্বামীর নাম উচ্চারণ করতো না। তাই আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলিতে দেখি লেখিকারা স্বামীর নাম উচ্চারণ না করে স্বামীকে বোঝাতে কখনো ব্যক্তিবাচক সর্বনাম, কখনো বিকল্প শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন, রাসসুন্দরী দাসী *আমার জীবন* গ্রন্থে স্বামীকে বোঝাতে বারংবার *কর্তা* শব্দটির ব্যবহার করেছেন। যেমন—

> ক. ''বিশেষ ছেলে দুটি কাঁদলে কর্তাটি, কাঁদে কেন কাঁদে কেন, বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে শোর করিবেন।''[২৬]
>
> খ. ''আমি পাকের ঘরে পাক করিতেছি, ইতিমধ্যে কর্তা আসিয়া ওই ছেলেটিকে

ডাকিয়া বলিলেন, বিপিন! আমার চৈতন্যভাগবত পুস্তকখানি এখানে থাকিল, আমি যখন তোমাকে লইয়া যাইতে বলিব, তখন তুমি লইয়া যাইও।"[২৭]

—আবার স্বামীকে বোঝাতে রাসসুন্দরী দাসী *তিনি* সর্বনামও ব্যবহার করেছেন—

"আমি যে লোকের অধীনী হইয়া একাল পর্যন্ত দিবস গত করিয়াছি বাস্তবিক তিনি বেশ লোক ছিলেন।"[২৮]

—রাসসুন্দরী দাসীর মতো সারদাসুন্দরী দেবীও *আত্মকথা* গ্রন্থে স্বামীর নাম উচ্চারণ না করে *তিনি* সর্বনামের ব্যবহার করেছেন—

"আমার শ্বশুরের জীবদ্দশাতেই তিনি ব্যেগ্ সাহেবের হাউসের মুচ্ছুদ্দী হইয়াছিলেন, এই হাউস কয় দিন পরে ফেল হয়। হাউস ফেল হইবার পর অনেকদিন পর্যন্ত তিনি বাড়িতে বসিয়াছিলেন। তিনি এই হাউসে কর্ম্ম করিবার পর অল্প দিনের ভিতরই বিস্তর টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।"[২৯]

—শরৎকুমারী দেবও সেকালের সংস্কারবশত স্বামীর নাম উচ্চারণ করেননি। তিনি *আমার সংসার* গ্রন্থের প্রথমেই স্বামীর কথা বলতে গিয়ে প্রথম পরিচ্ছেদের নামকরণ করেছেন *তাঁর কথা। তাঁর জন্ম*। এভাবে শরৎকুমারী দেব স্বামী সত্যপ্রিয় দেবকে বোঝাতে কখনো *তাঁর* কিংবা *তাঁহার* কখনো *তিনি*, আবার কখনো *ইনি* সর্বনামের ব্যবহার করেছেন। যেমন—

ক. "কোন্নগর গ্রামে তাঁর পিতামহের পুরাতন বাটির সন্নিকটে পিতার নূতন সুবৃহৎ বাসভবনে ছয় সহোদরা, বহু আত্মীয়, দাসদাসী পরিবেষ্টিত গৃহে ৭ শ্রাবণ ১২৬৩ সাল ইং ২২ জুলাই ১৮৫৬ সালে তাঁহার জন্ম হয়।"[৩০]

খ. "আমি আরোগ্য হইলে পর তিনি নিজেই ক্রমাগত জ্বর ভোগ করিয়া কলেজ ছাড়িলেন।"[৩১]

গ. "ইনি তখন পিতার পাশে উপবিষ্ট থাকিতেন দেখিতাম।"[৩২]

— এক্ষেত্রে শরৎকুমারী দেব স্বামীকে বোঝাতে নানা রকম সর্বনাম ব্যবহার করলেও কখনই স্বামীর নাম উচ্চারণ করেননি। এরকমই ছিল সেকালে এদেশের সামাজিক সংস্কার। আবার ইন্দিরা দেবীও উনিশ শতকের এদেশের নারীদের মতো সামাজিক সংস্কারবশত স্বামীর নাম উচ্চারণ করেননি। তিনি *আমার খাতা* গ্রন্থের নানা স্থানে স্বামীর নামের পরিবর্তে ব্যক্তিবাচক সর্বনাম *উনি* ব্যবহার করেছেন। যেমন—

ক. ''উনি আমায় কলকাতায় আমাদের বাড়িতে রাখিয়া ১ বৈশাখ নববর্ষের উপাসনা শেষ করিয়া চুঁচুড়ায় চলিয়া গেলেন।''[৩৩]

খ. ''... উনি আমার পালকির দ্বার বন্ধ দেখিয়া খুলিয়া দিলেন ...।''[৩৪]

সেকালের অনেক নারী আবার সামাজিক সংস্কারবশত স্বামীর নাম উচ্চারণ করতে না পেরে স্বামীকে বোঝাতে বিকল্প বিভিন্ন ধরনের শব্দ ব্যবহার করতো। কৈলাসবাসিনী দেবীও সেকালের সামাজিক সংস্কারবশত স্বামীর নাম উচ্চারণ না করে বিকল্প শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি *ডায়েরী* গ্রন্থের সর্বত্র স্বামীকে বোঝাতে *বাবু* শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যেমন—

ক. ''বাবু কুটিতে গেলেন আমি বোটে রহিলাম।''[৩৫]

খ. ''বাবু বড় ছেলে ভালবাশেন কিন্তু আমাকে কখন বলেন না।''[৩৬]

—সুদক্ষিণা সেনও *জীবন স্মৃতি* গ্রন্থে স্বামী অম্বিকাচরণ সেনের নাম উচ্চারণ করেননি। তবে তিনি বিয়ের পূর্বেই অম্বিকাচরণ সেনকে জানতেন বলে সেসময়কার ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে অম্বিকাচরণের নাম ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু বিয়ের পরে তিনি স্বামীর কথা বোঝাতে গিয়ে অম্বিকাচরণ নামটি ব্যবহার করেননি, তার পরিবর্তে তিনি বারংবার *স্বামী* শব্দটিরই ব্যবহার করেছেন। যেমন—

ক. ''অল্প কয়েক দিবস পরেই আমার স্বামী ঢাকায় আসিলেন।''[৩৭]

খ. ''আমার স্বামী আগস্ট মাসে দেশে ফিরিলেন।''[৩৮]

— আমোদিনী দাশগুপ্তও *আমার জীবন-কাহিনি* গ্রন্থে স্বামীর নাম উচ্চারণ করেননি। তিনি সুদক্ষিণা সেনের মতো স্বামীকে বোঝাতে শুধু *স্বামী* শব্দটিই ব্যবহার করেননি, পাশাপাশি *তাঁহার* সর্বনামেরও ব্যবহার করেছেন। যেমন, *স্বামী* শব্দের ব্যবহার—

''পূজার সময় স্বামী প্রচুর টাকা নিয়া বাড়ি আসিলেন।''[৩৯]

—*তাঁহার* সর্বনামের ব্যবহার—

''এই সময় হইতেই তাঁহার শখ যে আমি তাঁহার উপযুক্ত স্ত্রীর ন্যায় তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করি।''[৪০]

—সেকালের সংস্কারবশত মানকুমারী বসুও তাঁর স্বামীর নাম উচ্চারণ করেননি। তিনি *আমার অতীত জীবন* গ্রন্থে একবার শুধু বলেছেন, তাঁর স্বামীর নাম বিবুধশঙ্কর বসু। এছাড়া যতবারই তিনি স্বামীর কথা বলেছেন ততবারই তিনি স্বামীর নামের পরিবর্তে কখনো *তাঁহার* সর্বনাম, আবার কখনো *পতিদেব* শব্দের ব্যবহার করেছেন। যেমন—

স্বামীর নামের পরিবর্তে *তাঁহার* সর্বনামের ব্যবহার—

ক. ''বাল্য বিবাহের ফলে আমি তাঁহার গুণের মর্ম বুঝিবার অবকাশ পাই না...।''[৪১]

খ. ''স্বাধীনভাবে ডাক্তারি করিতে এবং কলকাতা থাকিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল।''[৪২]

—স্বামীর নামের পরিবর্তে *পতিদেব* শব্দের ব্যবহার—

ক.''তখন পতিদেব কলকাতায় পড়িতেন।''[৪৩]

খ. ''ইহা দেখিয়া পতিদেব আমাকে বলিয়াছিলেন, ''লোকে প্রশংসা করিতেছে বলিয়া তুমি যেন গর্বিতা হইও না''।''[৪৪]

—নিস্তারিণী দেবী *সেকেলে কথা*-য় স্বামীর নাম সরাসরি উল্লেখ না করে বিকল্প সমার্থক শব্দের সাহায্যে ব্যাখ্যা করে স্বামী ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম বুঝিয়েছেন—

> ''শালগ্রামকে লোকে যা' বলে পূজা করে, সেই (নারায়ণ) ঠাকুরের সন্তানটির নাম— খ্রিস্টানরা যা বলে ভাগবান্‌কে ডাকে সেই— (ঈশ্বর) চাটুয্যের সঙ্গে বিবাহের দিন ঠিক ক'রে শিবরাত্রের আগের দিন বরকে লইয়া আসা হইল।''[৪৫]

—আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলির লেখিকারা সেকালের সংস্কারবশত কেউই স্বামীর নাম উচ্চারণ করেননি। তাঁরা স্বামীকে বা স্বামীর নাম বোঝাতে কখনো *তিনি, ইনি, উনি, তাঁর, তাঁহার* সর্বনামগুলির ব্যবহার করেছেন; কখনো *স্বামী, পতিদেব, বাবু, কর্তা* প্রভৃতি বিকল্প শব্দের ব্যবহার করেছেন; আবার কখনো বিকল্প সমার্থক শব্দের ব্যবহার করেছেন। এভাবে সামাজিক সংস্কারবশত স্বামীকে বোঝাতে সর্বনাম এবং বিকল্প শব্দের ব্যবহার আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলির লেখিকাদের ভাষা ব্যবহারের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে।

আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলি মূলত সাধুভাষায় লেখা হলেও অধিকাংশ আত্মকথা-গুলিতেই একই সর্বনামের সাধুরূপ ও চলিতরূপ উভয়ই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, সাধুভাষায় প্রথম পুরুষের একবচনে সাধারণ অর্থে *তাহার* সর্বনাম এবং সম্মানার্থে *তাঁহার* সর্বনাম ব্যবহৃত হয়— এই সর্বনাম দুটির চলিতভাষায় রূপ যথাক্রমে *তার* এবং *তাঁর*। আবার সাধুভাষায় প্রথম পুরুষের বহুবচনে সাধারণ অর্থে *তাহারা* সর্বনাম এবং সম্মানার্থে *তাঁহারা* সর্বনাম ব্যবহৃত হয়— এই সর্বনাম দুটির চলিতভাষার রূপ যথাক্রমে *তারা* এবং *তাঁরা*। আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলির অধিকাংশ লেখিকাই কখনো প্রথম পুরুষের একবচনে সাধারণ অর্থে *তাহার*, তার এবং সম্মানার্থে *তাঁহার*, তাঁর সর্বনাম ব্যবহার করেছেন; আবার কখনো প্রথম পুরুষের বহুবচনে সাধারণ অর্থে *তাহারা*,

তারা এবং সম্মানার্থে *তাঁহারা, তাঁরা* সর্বনামের ব্যবহার করেছেন। কৈলাসবাসিনী দেবীর *ডায়েরী* গ্রন্থে এরকম প্রথম পুরুষের সাধু ও চলিত উভয় ভাষারই সর্বনাম ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন—

প্রথম পুরুষের বহুবচনে সাধুভাষায় ব্যবহৃত সর্বনাম—

> ''... আমার ন ভাসুর মহাসয় আর লকযোন তাঁহারা সকলে ফেরে গেলেন।''[৪৬]

প্রথম পুরুষের বহুবচনে চলিতভাষায় ব্যবহৃত সর্বনাম—

> ''তাঁরা শকলে কার্ত্তিক মাশের ৮ তারিকে বাটিতে য়েশেন।''[৪৭]

—নিস্তারিণী দেবীর পক্ষে লেখাপড়া শেখার সুযোগ হয়নি। তবে তিনি যেভাবে তাঁর জীবনের কথা বলে গেছেন সেভাবেই তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র মন্মথ বন্দ্যোপাধ্যায় তা লিপিবদ্ধ করেছেন। লেখাপড়ার সুযোগ না পাওয়ায় নিস্তারিণী দেবীর পক্ষে সাধু গদ্যরীতির আদর্শ অনুসরণ করে জীবন-কথা বলে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তাই তাঁর *সেকেলে কথা* গ্রন্থে এরকম প্রথম পুরুষের সাধু ও চলিত ভাষারীতির সর্বনামের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন—

প্রথম পুরুষের একবচনে সাধুভাষায় ব্যবহৃত সর্বনাম—

> ''রামমোহনের মৃত্যুর পর তাঁহার দুর্দশার কথা শুনিয়া সাহেব হরচরণকে স্বীয় সহকারীর লেখকের কার্য দিয়া তাহাকে আহত সৈনিকের ডুলিতে চড়াইয়া লইয়া গেলেন।''[৪৮]

—প্রথম পুরুষের একবচনে চলিতভাষায় ব্যবহৃত সর্বনাম—

> ''দিনের বেলা, তে মহলা বাড়ি ঘুরে, খেতে আস্‌তে তাঁর বড়ো কষ্ট হ'ত।''[৪৯]

—শরৎকুমারী দেবের *আমার সংসার* গ্রন্থেও এরকম প্রথম পুরুষের একই সর্বনামের সাধু ও চলিত রূপের ব্যবহার লক্ষ করা যায়— তাও আবার একই স্তবকে। যেমন—

> ''চিরদিন দেখিয়াছি, তাঁর ব্যবহারের দ্রব্যে কেহ কখনও হাত দিতে পারিত না। পিতার ন্যায় পরিচ্ছন্নতা ও মাতার ন্যায় শুচিতা পারিপাট্য তাঁহার প্রকৃতিগত ভাব ছিল।''[৫০]

—আবার ইন্দিরা দেবী শৈশবে পিতৃগৃহে পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে লেখাপড়া শিখে বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ করেছিলেন বলে *আমার খাতা* গ্রন্থে তিনি মোটামুটিভাবে সাধু গদ্যরীতির আদর্শকেই অনুসরণ করেছেন। তবে এ গ্রন্থের কোন কোন ক্ষেত্রে অসাবধানতা বশত তিনি প্রথম পুরুষের সাধু ও চলিত উভয় গদ্যরীতিরই সর্বনাম ব্যবহার করেছেন। যেমন—

প্রথম পুরুষের একবচনে সাধুভাষায় ব্যবহৃত সর্বনাম—

''মাতৃদেবীর যখন ৯ বৎসর বয়স তখন তাঁহার বিবাহ হয়, তিনি পিতার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ছিলেন।''[৫১]

— প্রথম পুরুষের একবচনে চলিতভাষায় ব্যবহৃত সর্বনাম—

''আমি আমার সুখস্বপ্নে মগ্ন আছি এমন সময়ে ১৬ চৈত্রে জননীকে অশেষ ক্লেশ দিয়া তাঁর এক পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল।''[৫২]

—ইন্দিরা দেবীর মতো মনোদা দেবী দাশগুপ্তাও *জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী* গ্রন্থে সর্বত্র সাধু গদ্যরীতির অনুসরণ করলেও কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি প্রথম পুরুষের সাধু ও চলিত উভয় গদ্যরীতিরই সর্বনামের ব্যবহার করেছেন। যেমন—

প্রথম পুরুষের একবচনে সাধু গদ্যে ব্যবহৃত সর্বনাম—

''এখানে তাঁহার জাত্যাভিমান বা উঁচু-নীচের কোনো প্রশ্নই মনের মধ্যে ঠাঁই পাইতেছিল না।''[৫৩]

—প্রথম পুরুষের একবচনে চলিত গদ্যে ব্যবহৃত সর্বনাম—

''আজও মনে পড়ে তাঁর অন্তহীন স্নেহমমতার সহজ সরল হৃদয়খানার কথা।''[৫৪]

আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলি মূলত সাধুভাষায় লেখা হলেও অধিকাংশ আত্মকথাতেই একই সর্বনামের সাধুভাষার ও চলিতভাষার রূপের ব্যবহারের পাশাপাশি একই ক্রিয়াপদের সাধুভাষার ও চলিতভাষার রূপও ব্যবহৃত হয়েছে। *হইল* সাধুভাষার এই সাধারণ অতীতকালের ক্রিয়াপদটির চলিতরূপ— *হল*। এরকম একই ক্রিয়াপদের সাধু ও চলিত ভাষার রূপের ব্যবহার রয়েছে কৈলাসবাসিনী দেবীর *ডায়েরী* গ্রন্থে। যেমন—

ক. ''কিন্তু তার পর দিন অসুখ হইল, তাহাতে বড় আমোদ হইল না।''[৫৫]

খ. ''সেই ফাগুন মাসে ভাল হল।''[৫৬]

—এরকম একই ক্রিয়াপদের সাধু ও চলিত ভাষার রূপের ব্যবহার নিস্তারিণী দেবীর *সেকেলে কথা* গ্রন্থের ভাষা ব্যবহারেও লক্ষ করা যায়। যেমন—

ক. ''ক্রমে ক্রমে বিষ্ণু, রাম, ঈশান, মহেশ, নীলমণি পাঁচ ছেলে হইল।''[৫৭]

খ. ''দশ গণ্ডা খালি সিন্দুক দেখে তারা বড়োই বিরক্ত হল।''[৫৮]

—এরকম সমাপিকা ক্রিয়াপদের পাশাপাশি অসমাপিকা ক্রিয়াপদেরও সাধু ও চলিত ভাষার রূপের

ব্যবহার লক্ষ করা যায় নিস্তারিণী দেবীর ভাষা ব্যবহারে। অসমাপিকা ক্রিয়াপদ *হইয়া* সাধুভাষায় ব্যবহৃত হয় এবং চলিতভাষায় এই ক্রিয়াপদটির রূপ হল *হয়ে*। এরকম অসমাপিকা ক্রিয়াপদের সাধু ও চলিত রূপের ব্যবহার লক্ষ করা যায় নিস্তারিণী দেবীর লেখায়—

ক. ''পরে রামজে সাহেবের ডান হাত বাম হাত হইয়া উঠিলেন।''[৫৯]

খ. ''রামমোহনের সেই দিন থেকে পেটের পিলে পাঁজরায় চলে গিয়ে চিরকালের মতো পিলে ভালো হয়ে গেল।''[৬০]

—*হইত* সাধুভাষার এই নিত্যবৃত্ত অতীতকালের ক্রিয়াপদটির চলিতভাষার রূপ হল *হত*। নিত্যবৃত্ত অতীতকালের *হইত* এবং *হত* এই দুটি রূপেরই ব্যবহার লক্ষ করা যায় শরৎকুমারী দেবের *আমার সংসার* গ্রন্থে। যেমন—

''... তবে বেহারারা তত্ত্বের ঝাঁক কাঁধে নিতে খুশি হত। ঝিরা চন্দ্রপুলীর নারিকেল বাটীতে ভয় করিত, কখনও কখনও ঠিকা লোক গৃহস্থের বউ ঝি বেটে দিয়ে যেতো, সিধা দেওয়া হইত।''[৬১]

—আবার *হইবে* সাধুভাষার এই সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াটির চলিত রূপ হল *হবে*। সাধারণ ভবিষ্যৎকালের *হইবে* এবং *হবে*— সাধু ও চলিত ভাষার এই দুটি রূপেরই ব্যবহার লক্ষ করা যায় লীলাবতী মিত্রের *জীবনকথা* গ্রন্থে। যেমন—

ক. ''... তোমার জননীর মন সেদিন কতক শান্ত হইবে।''[৬২]

খ. ''তোমরা মুগ্ধ হবে...।''[৬৩]

—বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে সাধু এবং চলিত ভাষারীতির আদর্শের যেকোনো একটিকে পুরোপুরি অনুসরণ করতে হয়। এক্ষেত্রে সাধু এবং চলিত ভাষারীতির ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম প্রভৃতি পদের মিশ্রণ বাঞ্ছনীয় নয়। এ ধরনের মিশ্রণকে গুরুচণ্ডালি দোষ বলা হয়। উপরিউক্ত আলোচনায় দেখা গেল আমাদের নির্বাচিত অধিকাংশ আত্মকথাতেই এরকম সাধু ও চলিত ভাষার ক্রিয়া ও সর্বনাম পদের মিশ্রণ রয়েছে। এর কারণ হিসেবে বলা যায়, আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলির লেখিকারা প্রায় সকলেই উচ্চ শিক্ষা লাভ করার সুযোগ পাননি এবং সেকালের গদ্যসাহিত্য পাঠ করার বেশি সুযোগ লাভ করেননি। তাই সাধুগদ্যের রীতিটিকে যথাযথভাবে আয়ত্ত করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। আর একথা মনে রেখে আমরা তাঁদের গদ্যভাষাকে কোনোরকম দোষে দুষ্ট না করে, বরং বলতে পারি এরকম ভাষা ব্যবহারে তাঁদের হৃদয়াবেগ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এবং এই ভাষার মূল

ছাঁদ সাধুভাষার হলেও এতে সাধুভাষায় ব্যবহৃত সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের পাশাপাশি চলিতভাষায় ব্যবহৃত সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের ব্যবহারে এর প্রকাশ অনেকটাই মুখের ভাষার কাছাকাছি হয়েছে। সেদিক থেকে বিবেচনা করে আমরা বলতে পারি, আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলির ভাষা ব্যবহার সেকালের সাধুগদ্যরীতিতে একটা স্বাতন্ত্র্যের আস্বাদ দেয়। তবে রাসসুন্দরী দাসী, বিনোদিনী দাসী, কৃষ্ণভাবিনী দাসী, কামিনী রায়, সুদক্ষিণা সেন, মনকুমারী বসু— এঁরা সেকালের তুলনায় যথেষ্ট শিক্ষিতা ছিলেন বলে এবং গ্রন্থপাঠের সুযোগ পেয়েছিলেন বলে তাঁদের রচনায় সাধুভাষার আদর্শকে যথাযথভাবে অনুসরণ করেছিলেন। তাই তাঁদের রচনায় সাধু ও চলিত ভাষার সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের মিশ্রণ লক্ষ করা যায় না।

উনিশ শতকে এদেশের রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে নারী শিক্ষা নিষিদ্ধ ছিল। তাই সেকালে এদেশের অধিকাংশ নারী লেখাপড়ার সুযোগ পায়নি। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে এদেশের রক্ষণশীল সমাজে নারী শিক্ষা মোটামুটিভাবে স্বীকৃত হলেও তা প্রাথমিক স্তর পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। আবার সেকালে এদেশের স্বল্পসংখ্যক নারী বাপের বাড়িতে কিংবা শ্বশুরবাড়িতে সামান্য লেখাপড়া শিখেছিল। এভাবে উনিশ শতকে এদেশের নারী শিক্ষা বেশিদূর অগ্রসর হয়নি এবং অধিকাংশ নারীই ছিল শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। ফলে সেকালে এদেশের নারীভাষার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে ধ্বনির বিকৃত উচ্চারণ তথা ধ্বনি পরিবর্তনের প্রবণতা। কেননা একটি শব্দকে যথাযথ উচ্চারণ করতে হলে যথেষ্ট দক্ষতা ও পর্যবেক্ষণশক্তির প্রয়োজন হয়। আর যথার্থ শিক্ষার মধ্য দিয়েই মানুষ শব্দের যথাযথ উচ্চারণের দক্ষতা লাভ করতে পারে। যথার্থ শিক্ষার মধ্য দিয়েই মানুষ শব্দের যথার্থ উচ্চারণ সম্পর্কে সচেতন হয় এবং শব্দের সঠিক উচ্চারণ করতে শেখে। আর শিক্ষা লাভ না করলে মানুষ জন্মসূত্রে যে কথ্যভাষা শেখে সেই কথ্যভাষারই প্রভাব থাকে তার ভাষা ব্যবহারে— ধ্বনি পরিবর্তনের প্রবণতায়। উনিশ শতকে এদেশের অধিকাংশ নারী যেহেতু যথাযথ শিক্ষালাভ করেনি, কিংবা প্রাথমিক শিক্ষার বেশি শিক্ষা লাভ করেনি সেহেতু তাদের ভাষায় অনিবার্যভাবে এসেছে ধ্বনির বিকৃত উচ্চারণ— যাকে আমরা বলতে পারি ধ্বনি পরিবর্তনের প্রবণতা। আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলির লেখিকারা কেউ বাড়িতে নিকট আত্মীয় কিংবা গুরুজনদের কাছে শিক্ষা লাভ করেছেন, আবার কেউবা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেছেন। তবে তাঁদের অধিকাংশের পক্ষেই সেকালের রক্ষণশীল সমাজের বিধি-নিষেধকে অতিক্রম করে প্রাথমিক শিক্ষার অধিক শিক্ষা লাভ করা সম্ভব হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা যখন নিজেদের

জীবনের কথা লিখেছেন তখন অসচেতনভাবেই তাঁদের রচনার ভাষায় ধ্বনি পরিবর্তনের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। যেমন, সারদাসুন্দরী দেবী বিয়ের পর স্বামী প্যারীমোহনের উৎসাহে কিছু লেখাপড়া শিখলেও সেকালের সামাজিক বিধি-নিষেধের কারণে তিনি যথাযথ শিক্ষা লাভ করতে পারেননি। তাই তাঁর *আত্মকথা*-য় *চোখ* শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে *চোক* রূপে—

> ''এই সমস্ত লীলাময় হরির খেলা মনে করি, এখন আমি এই প্রকাণ্ড পরিবারের মধ্যে বসিয়া, ভাই, এক চোকে হাসি আর এক চোকে কাঁদি।''[৬৪]

—এখানে *চোখ*-কে *চোক* রূপে উচ্চারণ করার প্রবণতা হল ধ্বনিপরিবর্তনের ধারায় ধ্বনির রূপান্তরের একটি বিশেষ রীতি— অল্পপ্রাণীভবন। কেননা আমরা জানি কোন কারণে যদি মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়, তবে ধ্বনির রূপান্তরের সেই প্রক্রিয়াকে অল্পপ্রাণীভবন বলা হয়। উপরিউক্ত দৃষ্টান্তটিতে মহাপ্রাণ ধ্বনি *খ* অল্পপ্রাণ ধ্বনি *ক*-তে রূপান্তরিত হয়েছে। আবার নিস্তারিণী দেবীর *সেকেলে কথা*-তেও এরকম অল্পপ্রাণীভবনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন—

> ''কালীচরণ ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মহেশ কাকা সেই কালো পাঁটা বলি দিয়া সেই রক্তমাখা খাঁড়া মায়ের নাড়ী কাটিতে পাঠাইয়া দিলেন।''[৬৫]

—এখানে *পাঁঠা*-কে বলা হয়েছে *পাঁটা*। অর্থাৎ এখানে মহাপ্রাণ ধ্বনি *ঠ* অল্পপ্রাণ ধ্বনি *ট*-তে রূপান্তরিত হয়েছে।

সেকালের অধিকাংশ নারীর মতো কৈলাসবাসিনী দেবীও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করতে পারেননি। বিয়ের পরে তিনি ম্যাজিস্ট্রেট স্বামী কিশোরীচাঁদ মিত্রের কাছে সামান্য লেখাপড়া শিখেছিলেন। তাই তাঁর *ডায়েরী* গ্রন্থে ভাষা ব্যবহারে ধ্বনি পরিবর্তনের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। তাঁর ভাষা ব্যবহারেও ধ্বনি পরিবর্তনের ধারায় ধ্বনির রূপান্তরের একটি বিশেষ রীতি, অল্পপ্রাণীভবনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন—

> '' আমার জখন অসুক হয়েছেল বাবু খুব সেবা করতেন।''[৬৬]

—এখানে *অসুখ*-কে লেখা হয়েছে *অসুক*। অর্থাৎ এক্ষেত্রে মহাপ্রাণ ধ্বনি *খ* অল্পপ্রাণ ধ্বনি *ক*-তে রূপান্তরিত হয়েছে। আবার ধ্বনি পরিবর্তনের ধারায় ধ্বনির আগমের একটি বিশেষ রীতি হল অন্ত্যস্বরাগম। আমরা জানি কোন শব্দের শেষে যদি স্বরধ্বনির আগমন ঘটে, তাহলে তাকে অন্ত্যস্বরাগম বলে। কৈলাসবাসিনী দেবীর ভাষায় এই অন্ত্যস্বরাগমেরও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন—

> ক. '' যখন আমার স্বামি তাঁর মার কোলে মাতা দে শুয়ে কাঁদিতে লাগিলেন

তখন আমার কি য়াবস্থা কি দুঃখু তাহা নিকিতে লিকনি অক্ষম।"[৬৭]

খ. "... আমরা স্ত্রীলোক আমাদের অন্তকরণ খুদুর, মন অল্প, কাজে কাজে অল্পতে তুষ্টু হই।"[৬৮]

—এখানে প্রথম দৃষ্টান্তের *দুঃখ* এবং দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের তুষ্ট শব্দের শেষে উ স্বরধ্বনির আগমন ঘটেছে বা উ স্বরধ্বনি যুক্ত হয়েছে। এভাবে আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলির অধিকাংশ লেখিকার ভাষা ব্যবহারের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে ধ্বনি পরিবর্তনের প্রবণতা। আবার কৈলাসবাসিনী দেবীর *ডায়েরী* গ্রন্থের প্রায় প্রতিটি বাক্যেই অজস্র ভুল বানান লক্ষ করা যায়, যা তাঁর ভাষা ব্যবহারের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। উদাহরণ হিসেবে একটি স্তবকের কিছুটা অংশ উল্লেখ করলেই তা বোঝা যাবে। যেমন—

"পুযার শময় দুই বাবু ঘরে ছেলেন না, তাহাতে বড় আমোদ হয় নাই, অমনি শামান্য জাত্তারা হইয়াছেল। তাঁরা আশিতে একদিন মহেশ চক্কোবত্তির জাত্তারা হলো। শেই বতশর আমার কাত্তিক পুজা নেয়া হয়। শেদিনও ঔ জাত্তারা হলো।"[৬৯]

—এই দৃষ্টান্ত থেকেই অনুমান করা যায় কৈলাসবাসিনী দেবীর *ডায়েরী* গ্রন্থে অজস্র ভুল বানানের ব্যবহার আছে। তবে তাঁর লেখায় এরকম অনেক ভুল বাবান থাকলেও তাতে কোন কৃত্রিমতা নেই, বরং তাতে তাঁর মনের ভাব সহজেই প্রকাশিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী মন্তব্য করেছেন—

"বানান লক্ষ করলেই বোঝা যায় যে খুব বেশি লেখাপড়ার সুযোগ পাননি লেখিকা। আর, বোধহয় সেই কারণেই সাংসারিক দুঃখশোক খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে এসেছে তাঁর লেখায়। শিক্ষার কোন মার্জিত প্রলেপ পড়েনি তাঁর অনুভূতির ওপর।"[৭০]

আমাদের সমাজে নারী ও পুরুষের সামাজিক অবস্থান এবং জীবন-যাপনের ধরণ একরকম না হওয়ায় নারী ও পুরুষের ভাষা ব্যবহারও কিছু কিছু ক্ষেত্রে আলাদা হয়ে যায়। নারী ও পুরুষের এই ভাষার পার্থক্য আলোচনা করতে গিয়ে রস্‌ফোর্ট *Histoire naturalle of morale des lles Antilles* গ্রন্থে যা বলেছেন, শর্মিলা বসু দত্ত *নারীর জগৎ ও নারীর উপভাষা* প্রবন্ধে তার উল্লেখ করেছেন—

"ছেলেদের নিজেদের অনেক রকম ভাষা-প্রকাশ আছে, যা মেয়েরা বোঝে, কিন্তু উচ্চারণ করে না। অন্য দিকে, মেয়েদেরও এমন অনেক শব্দ বা বাক্যাংশ আছে

যা ছেলেরা কখনও ব্যবহার করে না, বা যদি তারা ব্যবহার করে তাহলে তারা হাস্যস্পদ হয়ে ওঠে। এইভাবে কথোপকথনের সময়ে দেখা যায় মেয়েদের একটি স্বতন্ত্র ভাষা গড়ে ওঠে।"[৭১]

—আমাদের আলোচনার বিষয় নারীর ভাষা। নারীর ভাষা বলতে আমরা সেই ভাষাকেই বুঝি, যা একান্তভাবে তাদের জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আর নারীর এই নিজস্ব ভাষা গড়ে ওঠে নারীদের দ্বারা বিশেষভাবে ব্যবহৃত কতগুলি শব্দ, পদগুচ্ছ, বিশেষণ পদ, প্রত্যয়, উপসর্গ, সম্বোধন পদ, প্রবাদ-প্রবচন প্রভৃতির ব্যবহারে। এ প্রসঙ্গে শর্মিলা বসু দত্ত বলেছেন—

"ঐতিহাসিক দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে ভারতীয় আর্যভাষার বিভিন্ন স্তরে নারী-উপভাষার আলাদা কোনও অস্তিত্বের স্পষ্ট স্বাক্ষর না থাকলেও কিছু কিছু শব্দ, বাক্‌রীতি বা প্রবাদ-প্রবচনের প্রয়োগে মেয়েদের নিজস্ব কিছু চিন্তা বা মানসিকতার প্রতিফলন দেখা যায়।"[৭২]

—সুকুমার সেন *Women's Dialect in Bengali* গ্রন্থে নারী ভাষার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বাঙালি নারীদের দ্বারা বিশেষভাবে ব্যবহৃত শব্দ, পদগুচ্ছ, বিশেষণ পদ, প্রবাদ-প্রবচন প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলিতেও এরকম নারী ভাষার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আদর বা ভালোবাসা বোঝাতে *সোহাগ* শব্দের বিশেষ ব্যবহার নারী ভাষায় লক্ষ করা যায়। রাসসুন্দরী দাসী *আমার জীবন* গ্রন্থে বাপের বাড়িতে তিনি গুরুজনদের কাছে যে আদর-স্নেহ পেয়েছিলেন, তা বোঝাতে গিয়ে *সোহাগ* শব্দটির ব্যবহার করেছেন—

"লোকে মেয়েকে কত গালি দেয় এবং মায়ে কত মারিয়াও থাকে; মারা দূরে থাকুক, পরমেশ্বরের ইচ্ছায় আমাকে কেহ বড়ো করিয়া কথাও বলে নাই, ফলত আমার বড়ো সোহাগ ছিল।"[৭৩]

— আবার নারীরা তাদের ভাষায় এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করে— যা তাদের জীবনের সঙ্গে একান্তভাবে সম্পৃক্ত এবং পুরুষরা সেরকম শব্দ তাদের ভাষায় কখনই ব্যবহার করে না। নারীদের ভাষায় ব্যবহৃত এমন একটি বহু প্রচলিত শব্দ হল *রক্তস্রাব বা ঋতুস্রাব*। আমোদিনী দাশগুপ্ত *আমার জীবন-কাহিনি* গ্রন্থের ভাষায় এরকম শব্দের ব্যবহার করেছেন—

"দিবানিশি অনর্গল রক্তস্রাব হইতে থাকে।"[৭৪]

—আবার নারীর ভাষায় *অন* প্রত্যয়যুক্ত শব্দেরও বিশেষ ব্যবহার লক্ষ করা যায়। সুকুমার সেন

Women's Dialect in Bengali গ্রন্থে *অন* প্রত্যয় যোগে বাঙালি নারীদের ভাষায় ব্যবহৃত কিছু শব্দের উল্লেখ করেছেন। যেমন— *চলন, ছাড়ন, জ্বলন, নাচন, ফোঁড়ন* প্রভৃতি। শরৎকুমারী দেবের *আমার সংসার* গ্রন্থের ভাষায় এরকম *অন* প্রত্যয়যুক্ত শব্দের ব্যবহার রয়েছে—

> ''শুনিতাম আচার্য মহাশয় চলিয়া গেলেও ঘোর বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতেছে, ইনিও মধ্যে মধ্যে দু-একটি কথার ফোড়ন দিতেছেন।''[৭৫]

এদেশের নারীরা অশুভ বা অমঙ্গল বোঝাতে বিস্ময় প্রকাশক শব্দ *বালাই* ব্যবহার করে থাকে। নিস্তারিণী দেবী *সেকেলে কথা*-য় ভ্রাতুষ্পুত্র প্রাণধন কাশীতে মৃত্যুর ইচ্ছা প্রকাশ করলে বালাই শব্দটির প্রয়োগ করে প্রাণধনের সেই অশুভ চিন্তাকে খণ্ডন করতে চেয়েছেন। তাঁর ভাষায়—

> ''আমি বললুম, 'বালাই' ও কথা বলিস্ নে।''[৭৬]

—আবার নারীরা অনেক সময় আনন্দ, ভয়, উল্লাস, দুঃখ, যন্ত্রণা প্রভৃতি হৃদয়াবেগ ভাষায় প্রকাশ করতে গিয়ে বিস্ময় প্রকাশক *আহা* শব্দের ব্যবহার করে থাকে। যেমন রাসসুন্দরী দাসী *আমার জীবন* গ্রন্থে ছেলেবেলার এক আনন্দের কথা প্রকাশ করতে গিয়ে *আহা* বিস্ময় প্রকাশক শব্দের ব্যবহার করেছেন—

> ''আহা! সে যে কী আহ্লাদের দিন ছিল তাহা বলা যায় না।''[৭৭]

—আবার শরৎকুমারী দেব *আমার সংসার* গ্রন্থে স্বামীর মৃত্যুতে তাঁর দুঃখ-শোক প্রকাশ করতে গিয়ে এই *আহা* শব্দটির ব্যবহার করেছেন—

> ''আহা! কী নীরবেই থাকিতেন, কী নীরবে কাজ করিতে ভালো বাসিতেন। তেমনি নীরবে চলে গেলেন, মৃত্যু যন্ত্রণাও কিছুমাত্র স্পর্শ করিলেন না, কিছুই জানিতে পারিলেন না।''[৭৮]

নারীর ভাষায় বিশেষভাবে ব্যবহৃত কিছু পদগুচ্ছ রয়েছে— যা সাধারণত নারীরাই ব্যবহার করে থাকে। এসব পদগুচ্ছের মাধ্যমে নারীরা তাদের হৃদয়াবেগকে প্রকাশ করে। কৈলাসবাসিনী দেবী *ডায়েরী* গ্রন্থে তাঁর একবছরের ছেলে মারা গেলে সেই শোককে প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি *মাইখেকো ছেলে* পদগুচ্ছের ব্যবহার করেছেন—

> ''আমার মাইখেকো ছেলের পুত্র শোক।''[৭৯]

— আবার নিস্তারিণী দেবী *সেকেলে কথা-য় অন্ধের নড়ী* এবং *পেটের ছেলে* পদগুচ্ছ দুটির ব্যবহার করেছেন—

ক. ''আমার অন্ধের নড়ী প্রাণধন বাপমার গয়া করে আমাকে দেখে বাড়ি ফিরে গেল।''[৮০]

খ. ''আমার তো পেটের ছেলে ''নৃত্যগোপাল'' নাই।''[৮১]

—বস্তুত এরকম পদগুচ্ছের ব্যবহার নারীর ভাষাতেই লক্ষ করা যায়— যা নারীদের ভাষা ব্যবহারের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

নারী ভাষার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল বিশেষ কিছু সম্বোধন পদের ব্যবহার। সুকুমার সেন *Women's Dialect in Bengali* গ্রন্থে নারী ভাষায় ব্যবহৃত কিছু সম্বোধন পদের উল্লেখ করেছেন। যেমন— *ওলো, লো, লা* প্রভৃতি। মনোদা দেবী দাশগুপ্তার *জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী* গ্রন্থের ভাষায় এরকম সম্বোধন পদের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন, মনোদা দেবী দাশগুপ্তা বাল্যকালে তাঁর দিদিকে বিয়ের কথা বলতে গিয়ে *লো* সম্বোধন পদের ব্যবহার করে বলেছিলেন—

'' ''দিদি, দিদি! তোর না লো বিয়া''!''[৮২]

আমরা জানি প্রবাদ-প্রবচনগুলি মানবসমাজের দীর্ঘদিনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে সৃষ্ট। এই প্রবাদ-প্রবচনগুলি ভাষার মনোহারিত্বে সহজেই জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাই দেশ তথা সমাজের সকল নারী-পুরুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনের কথাবার্তায় নানা প্রসঙ্গে প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার করে থাকে। তবে এদেশে কিছু প্রবাদ-প্রবচন রয়েছে— যেগুলি নারীদের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ায় মূলত নারীদের ভাষাতেই ব্যবহৃত হয়। এগুলিকে বলা যেতে পারে মেয়েলি প্রবাদ-প্রবচন। আর নারীদের ভাষা ব্যবহারের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এধরনের মেয়েলি প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার। আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলির লেখিকাদের ভাষাতেও এরকম প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার লক্ষ করা যায়— যা তাঁদের ভাষা ব্যবহারের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। এখানে দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রসন্নময়ী দেবীর *পূর্ব্বকথা* গ্রন্থ থেকে এরকম নারী ভাষায় ব্যবহৃত প্রবাদ-প্রবচনের উল্লেখ করা হল—

ক. ''ঘি দিয়া ভাজ নিমের পাত,
নিম না ছাড়ে আপন জাত।''[৮৩]

খ. ''বৌএর নাই রবের ঠাঁই
বৌএর সাথে ষোল'শ দাই।''[৮৪]

—এভাবে নারী সমাজে বিশেষভাবে প্রচলিত কিছু শব্দ, পদগুচ্ছ, সম্বোধন পদ, প্রবাদ-প্রবচন প্রভৃতির ব্যবহারে আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলিতে নারী ভাষার স্বরূপ ব্যক্ত হয়েছে।

উনিশ শতকেও এদেশের পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ধারণা ছিল পুরুষই সাহিত্য সৃষ্টি করে, পুরুষই তা পাঠ করে এবং পুরুষই তার সমালোচনা করে। কিন্তু উনিশ শতকে এদেশে নারী শিক্ষার সূচনা হলে স্বল্পসংখ্যক নারী লেখাপড়া শিখে সেই প্রচলিত ধারণাকে ভেঙে যখন সাহিত্য সৃষ্টি করলেন তখন সাহিত্য পাঠ ও সাহিত্য সমালোচনা যে শুধু পুরুষের অধিকার নয়, তা যে একই সঙ্গে নারীরও— সেই ভাবনা থেকেই তাঁরা সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। তাই আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলির অনেকগুলিতে দেখি লেখিকারা ঘটনার বর্ণনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ উনিশ শতকের এদেশের লেখকদের মতো যারা সাহিত্য পাঠ করবে তাদের সম্বোধন হিসেবে শুধু *পাঠক/ পাঠকগণ* শব্দ ব্যবহার করেননি, তাঁরা একই সঙ্গে *পাঠক-পাঠিকাগণ* শব্দের ব্যবহার করেছেন। যেমন—

কৈলাসবাসিনী দেবী *ডায়েরী* গ্রন্থে লিখেছেন—

> ''হে পাঠক ও পাঠিকাগণ আজ আমার বই শেষ হইল।''[৮৫]

—আবার আমোদিনী দাশগুপ্ত *আমার জীবন-কাহিনি* গ্রন্থে বলেছেন—

> ''এই আকস্মিক বিপদে মনের অবস্থা যে কতদূর খারাপ হইল তাহা সহজেই পাঠক-পাঠিকাগণ অনুমান করিতে পারিবেন।''[৮৬]

—এরকম আরো দৃষ্টান্ত আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলিতে পাওয়া যায়। আর লেখিকারা তাঁদের ভাষায় এরকম সম্বোধনের ব্যবহারে তাঁদের ভাষা ব্যবহারে স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন— যার অভাব রয়েছে সমকালীন লেখকদের ভাষায়।

আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলির লেখিকাদের মধ্যে দু'-একজন বাদে সকলেই উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে পারেননি সামাজিক বিধি-নিষেধের কারণে। ফলে তাঁদের সহজ-সরল-অনাড়ম্বর জীবনের ঘটনা বর্ণনার ভাষায় যেমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাগ্‌বৈদগ্ধ্য নেই, তেমনি বাক্যের গঠনেও জটিলতা লক্ষ করা যায় না। তাঁরা তাঁদের জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার কথা বলতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছোট ছোট বাক্য ব্যবহার করেছেন—যেখানে সেকালে গদ্যে সাধারণত দীর্ঘ বাক্যই ব্যবহৃত হত। তাঁদের ব্যবহৃত সরল বাক্যগুলি যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনি তাঁদের ব্যবহৃত অধিকাংশ যৌগিক ও জটিল বাক্যের গঠনেও সংক্ষিপ্ততার বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। আর বাক্যকে সংক্ষিপ্ত করার জন্যে অনেক সময় তাঁরা সরল বাক্যের পাশাপাশি জটিল ও যৌগিক বাক্যগুলিতে এক বা একাধিক পদকে উহ্য রেখেছেন। ঘটনার বর্ণনায় কখনো কখনো তাঁরা পর পর কতগুলি সংক্ষিপ্ত সরল বাক্যের

ব্যবহার করেছেন, আবার কখনো কখনো পর পর কতগুলি সংক্ষিপ্ত সরল, যৌগিক ও জটিল বাক্যের ব্যবহার করেছেন। এভাবে পর পর কতগুলি সংক্ষিপ্ত বাক্যের সাহায্যে তাঁরা যে বাক্যসজ্জা নির্মাণ করেছেন, তা তাঁদের ভাষা ব্যবহারের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। পর পর কতগুলি সংক্ষিপ্ত সরল বাক্যের ব্যবহারে বাক্যসজ্জার নির্মিতির দৃষ্টান্ত— কৈলাসবাসিনী দেবীর *ডায়েরী* গ্রন্থে—

> ''শকলি মাট। শামনে এক ঘর মচনমান আচে। কোটা বাড়ি। ঘাশি মিয়া তাঁর নাম। এইতো পল্লী।''[৮৭]

—নিস্তারিণী দেবীর *সেকেলে কথা* গ্রন্থে পর পর কতগুলি সংক্ষিপ্ত সরল বাক্যের সাহায্যে বাক্যসজ্জা নির্মিতির দৃষ্টান্ত—

> ''পয়সার জোরে কি না হয়! বাবার ২৫্ থেকে ৪০্ মাহিনা হ'ল। দাদার ২০্ টাকা মাহিনা হ'ল।''[৮৮]

—এরকম বাক্যসজ্জা নির্মাণের দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায় ইন্দিরা দেবীর *আমার খাতা* গ্রন্থেও—

> ''তুমি বলিয়া কহিয়া মত করিও। এই কথা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।''[৮৯]

—আবার পর পর কতগুলি সংক্ষিপ্ত সরল, যৌগিক ও জটিল বাক্যের ব্যবহারে বাক্যসজ্জা নির্মিতির দৃষ্টান্ত— কৈলাসবাসিনী দেবীর *ডায়েরী* গ্রন্থে—

> ''আমরা কাঁলার দেবালয় দেকি। একসো ৮টি সিবলংগ একটি কালো আর একটি সেত বর্ণ ধ্রয়া করা তাহা দেকি। অতি উত্তম বড় পরিষ্কার। তার পাসে নালজির বাটি রামসিতার বাটি। অন্য অন্য অনেক ঠাকুর আছেন আমরা দেখে এলাম। সে রাত্র সেইখান আহার আদি হয়। তার পর দিন ঘোসালপুর থাকি। আর যেখানে থাকি সেইখান অতি রমনিয় বোধ হয়। তার পর দিবস পলাসির মাটে থাকি। সেই স্থানে ইংরাজ ও নবাবে প্রথম যুদ্ধ হয়। সে স্থান দেখে মন কতো পরফুল্ল হয় মনের ভাব কতো প্রকার হয় তাহা অনব্যচনিয় হয়।''[৯০]

—ইন্দিরা দেবীর *আমার খাতা* গ্রন্থে পর পর কতগুলি সংক্ষিপ্ত সরল, যৌগিক ও জটিল বাক্যের ব্যবহারে বাক্যসজ্জা নির্মিতির দৃষ্টান্ত—

> ''তাহাদের দেশে ভাঁজু ও ভাদু বলিয়া দুই রকম পূজা হয়। একটা নিশীথে ও একটা দিনে। ভাঁজুটা নিশীথের পূজা। সেই ভাঁজুর ছড়া এইখানে উদ্ধৃত করিলাম। ভাঁজু পূজায় পুরুষেরা কেউ যেতে পারে না, মেয়েরা নাচে ও গান করে।''[৯১]

—এরকম বাক্যসজ্জা নির্মাণের দৃষ্টান্ত আমোদিনী দাশগুপ্তের *আমার জীবন-কাহিনি* গ্রন্থেও পাওয়া যায়—

> ''আমার স্বামীই সকলের বড়ো। তিনি তো বিবাহ করেন আর স্ত্রী মরিয়া যায়। মধ্যম জা পরিবারে থাকেন না। নোয়া জা অল্পবয়সে বিধবা। সংসারের কিছুরই ধার ধারে না। শাশুড়ি বৃদ্ধা, পুত্র শোকাতুরা। তিনিও সংসারের কিছু দেখেন না। একমাত্র ছোটো জা-ই সংসারের হর্তাকর্তা বিধাতা। তিনি যাহা দিয়া যাহা করেন তাহাই হয়।''[৯২]

এছাড়া রাসসুন্দরী দাসী, সারদাসুন্দরী দেবী, প্রসন্নময়ী দেবী, বিনোদিনী দাসী, কামিনী রায়, সুদক্ষিণা সেন, লীলাবতী মিত্র প্রমুখদের আত্মকথাগুলিতেও এরকম পর পর কতগুলি সংক্ষিপ্ত বাক্যের সাহায্যে বাক্যসজ্জা নির্মিতির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এভাবে আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলির লেখিকারা ঘটনার বর্ণনায় কখনো কখনো পর পর কতগুলি সংক্ষিপ্ত সরল বাক্যের ব্যবহার করেছেন, আবার কখনো কখনো পর পর কতগুলি সংক্ষিপ্ত সরল, যৌগিক ও জটিল বাক্যের ব্যবহার করেছেন। ফলে ছোট ছোট বাক্যের ব্যবহারে তাঁদের ভাষা ব্যবহার সহজ-সরল ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। আর এই ছোট ছোট বাক্যের ব্যবহারে তাঁদের ভাষা হয়ে উঠেছে গতিময় এবং তাতে তাঁদের জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না প্রভৃতি ঘটনা সহজেই প্রকাশক্ষম হয়ে উঠেছে। সুতরাং বাক্যের এরকম নির্মিতি তাঁদের ভাষা ব্যবহারের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে— যা তাঁদের ভাষা ব্যবহারে একটা অভিনবত্বের আস্বাদ দেয়।

আমরা পর্যালোচনা করে দেখানোর চেষ্টা করলাম যে, আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলির লেখিকারা কোন্ প্রেক্ষাপটে কী ধরনের ভাষা ব্যবহার করেছেন। তাঁরা নারী হওয়ার কারণে তাঁদের রচনায় অনিবার্যভাবে এসেছে কিছু নারী ভাষার বৈশিষ্ট্য— যা তাঁদের রচনাকে দিয়েছে স্বাতন্ত্র্য। আবার সেকালের সমাজ ও সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছে তাঁদের ভাষা ব্যবহারে। জীবনের কথা বলতে গিয়ে জীবনের নানা বাঁকে পরিস্থিতি অনুযায়ী তাঁদের ভাষা ব্যবহারও বদলে গেছে। তাঁদের রচনায় ব্যাকরণ-বানান প্রভৃতি ভুল-ত্রুটি থাকলেও তা তাঁদের রচনার রস আস্বাদনের ক্ষেত্রে কোনরকম ব্যাঘাত সৃষ্টি করেনি, বরং এর মধ্য দিয়েই তাঁদের মনের বিভিন্ন আবেগ অকৃত্রিমভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁদের রচনায় মূলত সাধুভাষার ব্যবহার থাকলেও সেগুলিতে সেকালের গদ্য লেখকদের মতো সংস্কৃতগন্ধী তৎসম শব্দের বহুল ব্যবহার নেই, তার পরিবর্তে তাঁরা তাঁদের জীবন-কথাকে

সহজ-সরল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন— এর মধ্য দিয়ে তাঁদের ভাষা হয়ে উঠেছে দৈনন্দিন জীবন-যাপনের ভাষা। তাঁদের রচনার ভাষা ব্যবহারের ভুল-ত্রুটিকে বাদ দিয়ে আমরা যদি তাঁদের রচনার ভাষা ব্যবহারের সামগ্রিক দিক পর্যালোচনা করি তাহলে দেখব তাঁদের ব্যক্তিত্বের তথা তাঁদের সামগ্রিক জীবন-অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁদের ভাষা ব্যবহারে— যা তাঁদের ভাষা-ব্যবহারকে করে তুলেছে সেকালের তুলনায় অভিনব। তাই তাঁদের এই অভিনব ভাষা ব্যবহার পৃথক আলোচনার দাবি রাখে। আর তাঁরা সেকালের প্রতিকূল সামাজিক পরিস্থিতিতে যে স্বল্প লেখাপড়া শিখেই তাঁদের জীবন-কথায় এরকম স্বতন্ত্র ভাষা ব্যবহার করেছিলেন— তার গুরুত্ব আমাদের স্বীকার করতেই হয়।

তথ্যসূত্র:

১. বন্দ্যোপাধ্যায় সুচরিতা : আধুনিক বাংলা ভাষাতত্ত্ব, প্যাপিরাস, কলকাতা, পরিমার্জিত সংস্করণ: ডিসেম্বর ২০০৭, পৃ. ৩৬, ৩৭

২. দত্ত ড. বিভাবসু : বিদ্যাসাগরের গদ্যশৈলী, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর ২০০৬, পৃ. ১৮, ১৯

৩. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৯৩

৪. প্রাগুক্ত : পৃ. ৯৫

৫. প্রাগুক্ত : পৃ. ১০৪

৬. প্রাগুক্ত : পৃ. ১১৪

৭. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৮৯

৮. প্রাগুক্ত : পৃ. ২১০

৯. প্রাগুক্ত : পৃ. ২১২

১০. প্রাগুক্ত : পৃ. ২১২

১১. প্রাগুক্ত : পৃ. ২৩৭

১২. প্রাগুক্ত : পৃ. ২৬৮

১৩. প্রাগুক্ত : পৃ. ২৪০

১৪. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৩৮

১৫. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩২৯

১৬. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, চতুর্থ খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৬৫

১৭. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭৫

১৮. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৭৩

১৯. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৯৬, ১৯৭

২০. প্রাগুক্ত : পৃ. ২০২

২১. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১২৪, ১২৫

২২. প্রাগুক্ত : পৃ. ১০৯, ১১০

২৩. প্রাগুক্ত : পৃ. ২৪১

২৪. প্রাগুক্ত : পৃ. ২৬৫

২৫. Sen Sukumar : Women's Dialect in Bengali, Jijnasa, Kolkata, January 1979, Page-51.

২৬. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৯৪

২৭. প্রাগুক্ত : পৃ. ৯৭

২৮. প্রাগুক্ত : পৃ. ৯৯

২৯. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৫৪

৩০. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, চতুর্থ খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ১৪৫

৩১. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৫২

৩২. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৫৩

৩৩. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৯৩

৩৪. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৯৪

৩৫. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা,

প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১৯০

৩৬. প্রাগুক্ত : পৃ. ২০৭

৩৭. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, চতুর্থ খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৯৯

৩৮. প্রাগুক্ত : পৃ. ১০৮

৩৯. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, পঞ্চম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৩৪

৪০. প্রাগুক্ত : পৃ. ২৮

৪১. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, চতুর্থ খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ২২৮

৪২. প্রাগুক্ত : পৃ. ২৩০

৪৩. প্রাগুক্ত : পৃ. ২২৯

৪৪. প্রাগুক্ত : পৃ. ২৩০

৪৫. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, তৃতীয় খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৬৫

৪৬. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১৮৬

৪৭. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৯৪

৪৮. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, তৃতীয় খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৬১

৪৯. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭৪, ৭৫

৫০. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, চতুর্থ খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ১৪৭

৫১. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৭৪

৫২. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৯৫

৫৩. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, পঞ্চম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা,

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৯৯

৫৪. প্রাগুক্ত : পৃ. ১১৪

৫৫. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১৯৭

৫৬. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৯৭

৫৭. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, তৃতীয় খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৫৩

৫৮. প্রাগুক্ত : পৃ. ৬১

৫৯. প্রাগুক্ত : পৃ. ৬৩

৬০. প্রাগুক্ত : পৃ. ৬০

৬১. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, চতুর্থ খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ১৬৭

৬২. প্রাগুক্ত : পৃ. ২৪০

৬৩. প্রাগুক্ত : পৃ. ২৩৯

৬৪. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১৮২

৬৫. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, তৃতীয় খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৬৪

৬৬. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১৯৯

৬৭. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৮৫

৬৮. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৯১

৬৯. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৯৪

৭০. চক্রবর্তী সম্বুদ্ধ : অন্দরে অন্তরে: উনিশ শতকে বাঙালি ভদ্রমহিলা, স্ত্রী, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ: ২০১০, পৃ. ২০৯

৭১. চক্রবর্তী বাসবী (সম্পাদনা) : নারী পৃথিবী : বহুস্বর, উর্বী প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম

প্রকাশ: নভেম্বর ২০১১, পৃ. ৪৪২

৭২. প্রাগুক্ত : পৃ. ৪৫১

৭৩. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৮৮

৭৪. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, পঞ্চম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৩৫

৭৫. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, চতুর্থ খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ১৫৩

৭৬. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, তৃতীয় খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৯৬

৭৭. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৭৬

৭৮. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, চতুর্থ খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ১৬৬

৭৯. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১৮৫

৮০. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, তৃতীয় খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৯৬

৮১. প্রাগুক্ত : পৃ. ৯৩

৮২. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, পঞ্চম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৭৯

৮৩. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ২২৫

৮৪. প্রাগুক্ত : পৃ. ২৪৭

৮৫. প্রাগুক্ত : পৃ. ২১২

৮৬. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, পঞ্চম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা,

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৩৭

৮৭. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১৯৪

৮৮. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, তৃতীয় খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৭০

৮৯. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, চতুর্থ খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ১৮৮

৯০. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১৮৫

৯১. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, চতুর্থ খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ১৯১

৯২. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, পঞ্চম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ২৮

উপসংহার

গবেষণাকর্মের সমাপ্তি পর্বে এসে আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলিতে উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতির সামগ্রিক মূল্যায়ন করা সহজ ব্যাপার নয়। কেননা উনিশ শতকের সমাজ-সংস্কৃতি একটি ঘটনাবহুল ও বিচিত্র-বিস্তৃত বিষয়। উনিশ শতকে এদেশের সমাজে একদিকে যেমন পুরনো রীতি-নীতি-সংস্কার প্রভৃতি বজায় ছিল, অন্যদিকে নতুন ভাবনার উন্মেষে এতদিনের পুরনো সংস্কৃতির রূপান্তরও ঘটেছিল। ফলে উনিশ শতকের সমাজ-সংস্কৃতির সামগ্রিক মূল্যায়ন যে সংক্ষিপ্ত আকারে করা সম্ভব নয়, তা সহজেই অনুমেয়। আবার এসময়ের অনেক লেখিকা ভিন্ন রীতির গদ্যরচনার মধ্য দিয়ে উনিশ শতকের সংস্কৃতির নানা দিক তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু আমরা আলোচনার সুবিধার্থে সেসব রচনাকে গবেষণাকর্মে অন্তর্ভুক্ত করতে পারিনি। এছাড়া আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলির লেখিকারা নিজেদের জীবন-অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে উনিশ শতকের সমাজ-সংস্কৃতির যেসব দিক প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করেছেন আমরা মূলত তার ওপর ভিত্তি করেই উনিশ শতকের সমাজ-সংস্কৃতির একটা চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি গবেষণাকর্মটিতে। তাই উনিশ শতকের সমাজ-সংস্কৃতির অনেক প্রসঙ্গ অনালোচিতই থেকে গেছে এখানে। তবে আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলির লেখিকারা সেকালের এদেশের পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় নানা বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করে কখনো নামমাত্র লেখাপড়া শিখে নিজেদের জীবন-কথা লিখেছিলেন, আবার কখনো লেখাপড়া না শিখেও নিজেদের জীবন-কথাকে স্মৃতির আকারে অন্যের লেখনীর সাহায্যে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। আর তাঁদের অন্তঃপুরের সামাজিক অবস্থান থেকে তাঁরা সেকালের সমাজ-সংস্কৃতি ও তার পরিবর্তনের যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন মূলত সেসব প্রসঙ্গ তাঁদের আত্মকথায় উঠে এসেছে। আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলিতে উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতির নানা দিক নিয়ে বিভিন্ন অধ্যায়ে আমরা বিচার বিশ্লেষণ করেছি এবং তার ওপর ভিত্তি করে আমরা যেসব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, সেগুলি হল—

উনিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত এদেশের পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থান ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের, সেখানে তাদের মানবসত্তাকেই স্বীকার করা হয়নি। পরে উনিশ শতকের নবজাগরণ প্রসূত নতুন ভাবনার দ্বারা ভাবিত হয়ে এদেশের কিছু প্রগতিশীল মানুষ নারীদের নিম্ন সামাজিক অবস্থানের মূলে যে বিভিন্ন কুপ্রথা এবং সামাজিক ও শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধগুলি বিদ্যমান ছিল, তা

উপলব্ধি করেছিলেন এবং এসব কুপ্রথা ও বিধি-নিষেধ উচ্ছেদের জন্যে নারীপ্রগতিমূলক নানা সংস্কার আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। আর নারীকেন্দ্রিক এই সমাজ-সংস্কার আন্দোলনগুলিতে সমাজ-সংস্কারকরা কখনো রক্ষণশীলদের সঙ্গে জয়ী হয়েছেন, আবার কখনো পরাজিত হয়েছেন। কিন্তু এসব সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে এদেশের নারীরা দীর্ঘকাল পরে অন্তঃপুরের অন্ধকারাচ্ছন্ন বন্দীজীবন থেকে একচিলতে আলোর মুখ দেখতে পেয়েছিল। যার ফলে সেই নতুন ভাবনার আলোকে আলোকিত হয়ে এদেশের নারীরা এতদিন যাবৎ যে প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থাকে তাদের নিয়তি বলে মেনে আসছিল, তাকে তারা আর তাদের নিয়তি বলে মেনে নিতে পারেনি। শুরু হয়েছিল অন্তঃপুরের খাঁচা খোলা। এভাবে যে নারী ভাবনার উন্মেষ হয়েছিল তাই পরবর্তীকালে নারীমুক্তির দিশা দেখিয়েছিল।

উনিশ শতকে নারীকেন্দ্রিক সমাজ-সংস্কার আন্দোলনগুলির মধ্যে নারী শিক্ষা আন্দোলনে নারী শিক্ষার সূত্রপাত হলে নারীমুক্তির প্রথম সোপন রচিত হয়েছিল। কেননা আমরা দেখি এই সময় নারী শিক্ষার প্রচলনে অনেক নারী লেখাপড়া শিখে সাহিত্যচর্চাও শুরু করেছিলেন। এভাবে উনিশ শতকে একে একে আমরা অনেকজন লেখিকা পেয়ে যাই। কিন্তু উনিশ শতকের আগে পর্যন্ত মাত্র একজন লেখিকার (চন্দ্রাবতী) কথা আমরা জানতে পারি— এর কারণ সহজেই অনুমেয়। উনিশ শতকে নারী শিক্ষা প্রচলনে শুধুমাত্র আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলির লেখিকারাই নয়, আরো অনেক লেখিকার আবির্ভাব ঘটেছিল— যাঁরা কাব্য, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রভৃতি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় সাহিত্য সৃষ্টি করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। আবার লেখিকারা যখন সাহিত্য সৃষ্টি করলেন তখন তাঁদের রচনায় উঠে এল অন্তঃপুরের অনেক অজানা তথ্য এবং তাঁদের ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়া, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা— যা এতদিন পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের লেখকদের কলমে উঠে আসেনি, উঠে আসা সম্ভবও নয়। এভাবে উনিশ শতকে নারী শিক্ষার সূত্রপাতে একদিকে যেমন বাংলা সাহিত্যে অনেক লেখিকার আবির্ভাব হয়েছিল, অন্যদিকে বিষয়ের বৈচিত্র্যে বাংলা সাহিত্য পূর্ণতা পেয়েছিল। উনিশ শতকের এদেশের লেখিকারা সাহিত্যে তাঁদের জীবনের কথা বলে বাংলা সাহিত্যকে পরিপূর্ণতা দিয়েছিলেন। এভাবে উনিশ শতকের লেখিকারা বাংলা সাহিত্যে পুরুষের একচ্ছত্র অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সুতরাং এসব দিক থেকে বিচার করে আমরা বলতে পারি যে,দীর্ঘ সময় পর উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যে একসঙ্গে অনেকজন লেখিকার আবির্ভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

খ্রিস্টান মিশনারি, প্রগতিশীল শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ, ডিরোজিও এবং তাঁর ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী, ব্রাহ্মসমাজ, বেথুন সাহেব, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির উদ্যোগে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এদেশের নারীদের প্রাথমিক শিক্ষা মোটামুটিভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল রক্ষণশীল সমাজের নানা বিরোধিতা সত্ত্বেও। প্রগতিশীলদের সঙ্গে রক্ষণশীলদের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই নারী শিক্ষার প্রচলনের ইতিহাস আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলিতে লেখিকারা বিভিন্ন প্রসঙ্গে তুলে ধরেছেন। আবার আমাদের আত্মকথাগুলিতে যেহেতু লেখিকারা নিজেদের জীবনের কথা বলেছেন সেহেতু তাঁদের রচনায় উনিশ শতকের নারী শিক্ষা সংক্রান্ত অনেক তথ্য জানা যায়। যেমন, সেকালে নারীদের বাড়িতে প্রথমে গৃহকর্মের শিক্ষালাভ করে পরে লেখাপড়া শেখার অবসর মিলতো; পাঠ্যসূচিতে বর্ণপরিচয়ের পাশাপাশি গৃহকর্ম ও শিল্পকর্মের শিক্ষাও দেওয়া হতো; আবার তাদের নৈতিক শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের জন্যে বিভিন্ন নীতিকথামূলক গ্রন্থের পাঠও দেওয়া হতো। অর্থাৎ উনিশ শতকে এদেশে নারী শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল বিবাহের পরে শ্বশুরবাড়িতে নারীরা যেন আদর্শ স্ত্রী ও আদর্শ জননী হতে পারে। আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, উনিশ শতকে এদেশের নারী শিক্ষা ও তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত প্রকৃত তথ্য জানার জন্যে আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলি প্রামাণ্য দলিল হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। কেননা কোনো ঘটনা যখন বিভিন্ন জনের লেখায় বহুকৌণিক দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয় তখন তা আরও বিশ্বস্ত হয়ে ওঠে।

আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলিতে উনিশ শতকে এদেশের পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীদের নিম্নমানের জীবন-যাপন, কৌলীন্যপ্রথা, জাতিভেদপ্রথা, একঘরেপ্রথা, বিধবা নারীর ব্রহ্মচর্য পালন, নব্যশিক্ষিত ও উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের বাবুবিলাস প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। পাশাপাশি এসব প্রথা নিয়ে ব্রাহ্মসমাজ এবং ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত প্রগতিশীলদের সঙ্গে রক্ষণশীলদের ঘাত-প্রতিঘাতের প্রসঙ্গও উঠে এসেছে নির্বাচিত আত্মকথাগুলিতে। বস্তুত উনিশ শতকে রক্ষণশীল সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন কুপ্রথা এবং সামাজিক বিধি-নিষেধ নারীদের অক্টোপাসের মতো বন্দী করে রেখেছিল— নারীদের এই যন্ত্রণাময় বন্দী জীবনের পরিচয় বিশ্বস্তভাবে চিত্রিত হয়েছে আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলিতে। নারীদের এই সামাজিক জীবনের সামগ্রিক পরিচয় উপস্থাপনে নির্বাচিত আত্মকথাগুলির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কেননা ইতিপূর্বে পুরুষদের লেখনীতে নারীদের দুরবস্থার কথা বিক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হলেও নারীদের পারিবারিক যন্ত্রণাময় জীবন-যাপনের কথা সেখানে সেভাবে স্থান পায়নি। আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলি নারীর লেখা হওয়ায় সেগুলিতে সেকালের এদেশের

নারীদের সামাজিক জীবন-যাপনের কথা নিখুঁতভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

নারীবাদ বলতে আমরা বুঝি নারীর ব্যক্তিসত্তার জাগরণ এবং লিঙ্গসমতার ভিত্তিতে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই। এই অর্থে আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলি নারীবাদী ভাবনা সমৃদ্ধ নয়। আর আমরা জানি, বাংলা সাহিত্যে লেখিকাদের রচনায় নারীবাদী বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে বিশ শতকে। কিন্তু আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলির লেখিকারা নিজেদের জীবন-অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীদের পরাধীনতা-শোষণ-বঞ্চনা এবং পরাধীনতা-শোষণ-বঞ্চনার কারণ বর্ণনার পাশাপাশি কখনো কখনো পিতৃতান্ত্রিক সমাজের সনাতন ঐতিহ্যকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে উনিশ শতকেই যে নারীবাদী ভাবনার সূচনা করেছিলেন, তাই পরবর্তীকালে এদেশের নারীবাদী লেখিকাদের হাতে পূর্ণতা পেয়েছিল। সুতরাং আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলির লেখিকারা তথাকথিত অর্থে নারীবাদী না হলেও তাঁদের জীবন-কথার মধ্য দিয়ে নারীবাদী ভাবনার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য যে সচেতন কিংবা অসচেতনভাবে ফুটে উঠেছিল, তা কোনমতেই অস্বীকার করা চলে না।

আধ্যাত্মিক ভাবনা আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলির লেখিকাদের চেতনার একটা বড় অংশ জুড়ে ছিল। কেননা পিতৃতান্ত্রিক সমাজে তাঁদের পরাধীন জীবনের দুঃখ-বেদনা-যন্ত্রণার কথা শোনার কেউ না থাকায় ঈশ্বরই হয়ে উঠেছেন তাঁদের সান্ত্বনার একমাত্র আধার। আর আধ্যাত্মিক ভাবনা হল ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস এবং ঈশ্বরের প্রতি এই বিশ্বাসই মানুষের মনে অপর মানুষের প্রতি বিশ্বাস করার মানসিকতা তৈরি করে দেয়— যা একটি জীবনদর্শন। এই আধ্যাত্মিক ভাবনা প্রসূত জীবনদর্শনই মানুষের বেঁচে থাকার পাথেয়। কেননা মানুষের পক্ষে সকল মানুষকে অবিশ্বাস করে একাকী বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। এভাবে আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলির লেখিকারা আধ্যাত্মিক ভাবনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে তথা মানুষকে বিশ্বাস করার যে মানসিকতা লাভ করেছিলেন তাই হয়ে উঠেছে তাঁদের অসহায়-যন্ত্রণাময় জীবনের বেঁচে থাকার আধার। কাজেই তাঁদের আধ্যাত্মিক ভাবনারও একটি স্বতন্ত্র মূল্য আছে।

আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলি মূলত সাধুভাষায় লেখা এবং তাতে ব্যাকরণ-শৈলী-বানান প্রভৃতি ভুল-ত্রুটি থাকলেও এই ভাষা লেখিকাদের জীবন-কথা প্রকাশের উপযোগী। আবার লেখিকারা আত্মকথাগুলিতে মানসিক পরিস্থিতি অনুযায়ী, ব্যক্তি অনুযায়ী পৃথক পৃথক ভাষা ব্যবহার করেছেন; কখনো কখনো তাঁরা নারীদের মধ্যে ব্যবহৃত বিশেষ নারী ভাষারও ব্যবহার করেছেন। আবার তাঁদের ভাষা মূলত সাধু গদ্য হলেও তাঁরা সেকালের গদ্য লেখকদের মতো দীর্ঘবাক্য এবং সংস্কৃতগন্ধী

তৎসম শব্দের পরিবর্তে ছোট ছোট সংক্ষিপ্ত বাক্য এবং সহজ-সরল শব্দ ব্যবহার করেছেন। এভাবে সেকালের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে তাঁরা একধরনের স্বতন্ত্র ভাষা নির্মাণ করেছেন— যা আমাদের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের ভাষা হয়ে উঠেছে। আর আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলির লেখিকারা সেকালে স্বল্প লেখাপড়া শিখে নিজেদের জীবন-অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে সেকালের তুলনায় যে স্বতন্ত্র ভাষা ব্যবহার করেছেন তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলির লেখিকাদের মধ্যে প্রসন্নময়ী দেবী, বিনোদিনী দাসী, কৃষ্ণভাবিনী দাসী, কামিনী রায়, মানকুমারী বসু বাদে সকলেই একটির বেশি সাহিত্য সৃষ্টি করেননি, আর এটাই স্বাভাবিক। কেননা সেকালের রক্ষণশীল সমাজের রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য করে তাঁরা লেখাপড়া শিখে, কখনো আবার লেখাপড়া না শিখেই যে একটি আত্মকথা সৃষ্টি করতে পেরেছেন এটাই অনেক। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলির লেখিকাদের কেউ কেউ একটি, আবার কেউ কেউ অল্প কয়েকটি সাহিত্য সৃষ্টি করেও বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন, যেখানে আধুনিক কালের অনেক লেখকই অসংখ্য সাহিত্য সৃষ্টি করেও সমকালেই হারিয়ে গেছেন। আর আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলির লেখিকারা মূলত নিজেদের জীবন-কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে অন্তঃপুরের চিত্র উদ্‌ঘাটনে এবং উনিশ শতকের সংস্কৃতির নানা দিক স্বতন্ত্র ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে উপস্থাপন করে যে স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন— তাই তাঁদের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় করে রেখেছে।

গ্রন্থপঞ্জি
(Bibliography)

ক. আকর গ্রন্থ:

১. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৪

২. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৪

৩. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, তৃতীয় খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৭

৪. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, চতুর্থ খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৭

৫. ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা): প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, পঞ্চম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৭

খ. সহায়ক গ্রন্থ:

১. আজাদ হুমায়ুন : নারী, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ চতুর্বিংশ মুদ্রণ: মার্চ ২০১৭

২. ইকবাল হাসান : ভাষা, নারী ও পুরুষপুরাণ, অবসর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১৬

৩. এডোয়ার্ডস্ ডি মায়াল : ধর্ম-দর্শন, অনুবাদ-সুশীল কুমার চক্রবর্ত্তী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, অক্টোবর ১৯৭৭

৪. খান ইয়াসিন (সম্পাদনা) : সমকালীন ভাবনায় নারী, এডুকেশন ফোরাম, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : মে ২০১৫

৫. গুপ্ত কল্যাণচন্দ্র ও বন্দ্যোপাধ্যায় অমিতাভ : ধর্ম-দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ: জুন ১৯৮১

৬. গুপ্ত যোগেন্দ্রনাথ : বঙ্গের মহিলা কবি, সম্পাদনা: অলোক রায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ: আগস্ট ২০১৩

৭. ঘোষ অভ্র : উনিশ শতক চর্চা, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম মুদ্রণ: জুলাই ২০১৭

৮. ঘোষ ড. বারিদবরণ : ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, জিজ্ঞাসা এজেন্সি লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ২৫ জানুয়ারি ১৯৯০

৯. ঘোষাল ধনঞ্জয় (সম্পা.) : নবচেতনায় বঙ্গনারী: প্রাক্ স্বাধীনতা পর্ব, আশাদীপ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারী ২০১৫

১০. ঘোষ বিনয় : বাংলার নবজাগৃতি, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ: বৈশাখ ১৪২৩

১১. ঘোষ প্রবীর : যুক্তিবাদের চোখে নারী-মুক্তি, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ: নভেম্বর ২০১০

১২. ঘোষ রতনতনু (সম্পাদনা) : উত্তরাধুনিকতা, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ: জানুয়ারি ২০১৫

১৩. ঘোষ ড. শীতল : সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর স্থান, বর্ণালী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ২০০২

১৪. ঘোষ শুভঙ্কর : সাহিত্যের রূপভেদ, সাহিত্যলোক, কলকাতা, দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ: জুন ২০১১

১৫. চক্রবর্তী বাসবী (সম্পাদনা) : নারী পৃথিবী: বহুস্বর, উর্বী প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর ২০১১

১৬. চক্রবর্তী সম্বুদ্ধ : অন্দরে অন্তরে : উনিশ শতকে বাঙালি ভদ্রমহিলা, স্ত্রী, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ: ২০১০

১৭. চট্টোপাধ্যায় কুন্তল : সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, রত্নাবলী, কলকাতা, অষ্টম মুদ্রণ: মে ২০১১

১৮. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র : নারীর মূল্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় দে'জ সংস্করণ: আগস্ট ২০১৪

১৯. চট্টোপাধ্যায় সুনীতিকুমার : সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, চতুর্থ প্রকাশ: জানুয়ারী ২০০৩

২০. চট্টোপাধ্যায় ড. হীরেন : সাহিত্য-প্রকরণ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, চতুর্থ পরিবর্ধিত সংস্করণ: কলকাতা বইমেলা ১৪১৩

২১. চৌধুরী শীতল : উনিশ শতকের কবি ও কবিতা, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, প্রজ্ঞাবিকাশ সংস্করণ: নভেম্বর ২০১২

২২. জানা প্রবীর : ভারতীয় যোগী ও আধ্যাত্মিকতা, ছায়া পাবলিকেশন্, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: কলকাতা বইমেলা ২০১৩

২৩. দত্ত রায়চৌধুরী প্রজ্ঞাপারমিতা : 'ফুলমণি' এল কলকাতা : উনিশ এবং বিশ শতকের নারী ও গণিকা সমাজ, গাঙচিল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৩

২৪. দত্ত ড. বিভাবসু : বিদ্যাসাগরের গদ্যশৈলী, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর ২০০৬

২৫. দে গোপা : উনিশ শতকের তিন নারী কবি, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: আগস্ট ২০১০

২৬. দেব চিত্রা : অন্তঃপুরের আত্মকথা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা:লি:, কলকাতা, অষ্টম মুদ্রণ: অক্টোবর ২০১৪

২৭. দেব দূর্বা : আত্মজীবনীর স্থাপত্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: কলকাতা বইমেলা ২০০৭

২৮. দেববর্মণ রঞ্জিৎ : নারী: একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা, রিডার্স সার্ভিস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ১৩ অক্টোবর ২০০৪

২৯. দেবনাথ ড. আর এম : বঙ্গদেশে ধর্মীয় সমাজ ইতিহাস ও বিবর্তন, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: বইমেলা ২০১৬

৩০. নাথ মৃণাল : ভাষা ও সমাজ, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, প্রকাশ কাল: জানুয়ারি ১৯৯৯

৩১. নাথ মৃণাল (সম্পাদনা) : ভাষা, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৮

৩২. নাথ রাখাল চন্দ্র (সম্পাদনা) : উনিশ ও বিশ শতকের বাংলা প্রবন্ধাবলী, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ২০১২

৩৩. নাসির হাসান : বিশ্বাস ধর্ম যুক্তি, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: একুশে বইমেলা ২০১৩

৩৪. নিয়োগী গৌতম : উনিশ শতকের বাংলা বাঙালি প্রসঙ্গ : ব্রাহ্মসমাজ, অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৮

৩৫. বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ষষ্ঠ খণ্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা:লি:, পুনর্মুদ্রণ: ২০১৫-২০১৬

৩৬. বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, অষ্টম খণ্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ : ২০১৫-২০১৬

৩৭. বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ (সঙ্কলিত ও সম্পাদিত) : সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ মন্দির, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ: আষাঢ় ১৩৪৪

৩৮. বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ (সঙ্কলিত ও সম্পাদিত) : সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ: পৌষ ১৪০১

৩৯. বন্দ্যোপাধ্যায় সুচরিতা : আধুনিক বাংলা ভাষাতত্ত্ব, প্যাপিরাস, কলকাতা, পরিমার্জিত সংস্করণ: ডিসেম্বর ২০০৭

৪০. বসু স্বপন , চৌধুরী ইন্দ্রজিৎ (সম্পাদনা) : উনিশ শতকের বাঙালিজীবন ও সংস্কৃতি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ২৯ নভেম্বর ২০০৩

৪১. বসু (রায়) ছবি : বাঙলার নারী আন্দোলন (সংগ্রামী ভূমিকায় দেড়শ' বছর), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম দে'জ সংস্করণ: আগস্ট ২০১২

৪২. বসু রণদীপম : মনুশাস্ত্রে নারী ও ব্রাহ্মণ্যবাদ, রোদেলা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০২০

৪৩. বসু রাজশ্রী : নারীবাদ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, পুনর্বিন্যস্ত দ্বিতীয় মুদ্রণ: জানুয়ারি ২০২০

৪৪. বসু স্বপন : বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ: অগাস্ট ২০১৬

৪৫. বাগচী যশোধরা : নারী ও নারীর সমস্যা, অনুষ্টুপ, কলকাতা, অনুষ্টুপ সংস্করণ: মার্চ ২০১২

৪৬. বিশ্বাস কৃষ্ণকলি : উনিশ শতকের বামা লেখনী, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ২০০২

৪৭. বিশ্বাস ড. সুখেন : ভাষাবিজ্ঞান: তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ: আগস্ট ২০১৬

৪৮. বোভোয়ার সিমোন দ্য : দ্বিতীয় লিঙ্গ, অনুবাদ-কঙ্কর সিংহ, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৪

৪৯. ভট্টাচার্য তপোধীর : নারীচেতনা : মননে ও সাহিত্যে, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০০৭

৫০. ভট্টাচার্য দেবীপদ : বাংলা চরিত সাহিত্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জুন ১৯৮২

৫১. ভট্টাচার্য পরেশচন্দ্র : ভাষাবিদ্যা পরিচয়, জয়দুর্গা লাইব্রেরী প্রা:লি:, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ: জুলাই ২০১৩

৫২. ভট্টাচার্য সুকুমারী : প্রাচীন ভারত: সমাজ ও সাহিত্য, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, নবম মুদ্রণ: জ্যৈষ্ঠ ১৪২২

৫৩. ভট্টাচার্য সুতপা (সংকলন ও সম্পাদনা) : বাঙালি মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ: ২০১৪

৫৪. ভট্টাচার্য সুতপা : মেয়েদের লেখালেখি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০০৪

৫৫. ভাদুড়ী তন্দ্রিতা : পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় : পুরুষের স্বৈরতান্ত্রিক বিশ্লেষণে নারী, রিডার্স সার্ভিস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ২৬ জানুয়ারি ২০০৫

৫৬. মণ্ডল উৎপল; মোদক রীতা (সম্পাদনা) : বিশ শতকের বাংলা প্রবন্ধচর্যা (১৯০১-১৯৪৭), বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: কলকাতা বইমেলা, ২০১৪

৫৭. মজুমদার উজ্জ্বলকুমার : সাহিত্য ও সমালোচনার রূপ-রীতি, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ: সেপ্টেম্বর ২০০৯

৫৮. মজুমদার উজ্জ্বলকুমার (সম্পাদনা): বাঙালির সাংস্কৃতিক দিগন্ত, সোনার তরী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: আগস্ট ২০০১

৫৯. মজুমদার ড. অভিজিৎ : শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ: এপ্রিল ২০১৬

৬০. মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার : ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ: মার্চ ২০১৭

৬১. মুখোপাধ্যায় কনক : নারী আন্দোলনের নানা কথা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা:লি:, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জুন ২০০১

৬২. মুরশিদ গোলাম : নারী প্রগতি: আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, প্রথম ভারতীয় সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১৪

৬৩. মুরশিদ গোলাম : রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া: নারীপ্রগতির একশো বছর, অবসর, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ: নভেম্বর ২০১৮

৬৪. মৈত্র শেফালী : নৈতিকতা ও নারীবাদ, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা:লি:, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ: জানুয়ারি ২০১৫

৬৫. রহমান হাবিব আর (সংকলন ও সম্পাদনা) : পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব : ধ্রুপদী ও আধুনিক, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ: ফেব্রুয়ারি ২০১৬

৬৬. রায় অপূর্বকুমার : শৈলীবিজ্ঞান, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম দে'জ সংস্করণ: অক্টোবর ২০০৬

৬৭. রায় অলোক : উনিশ শতক, প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ: জানুয়ারি ২০১৭

৬৮. রায় অলোক (সম্পাদনা) : শতাব্দী সাহিত্য পরিক্রমা, অব্যয় লিটারারি সোসাইটি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ১৫ আগস্ট ২০১৩

৬৯. রায় বিনয়ভূষণ : অন্তঃপুরের স্ত্রীশিক্ষা, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ: ২০১৫

৭০. শরীফ আহমদ : বাঙলা, বাঙালী ও বাঙালীত্ব, অনন্যা, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ: আগস্ট ২০০৭

৭১. শ' ড. রামেশ্বর : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ: ৮ই অগ্রহায়ণ ১৪০৩

৭২. শহীদুল্লাহ ডক্টর মুহম্মদ : বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, দশম মুদ্রণ: নভেম্বর ২০১৯

৭৩. শাস্ত্রী শিবনাথ : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, সম্পাদনা: বারিদবরণ ঘোষ, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা:লি:, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ: ২০০৯

৭৪. সরকার তনিকা : আধুনিকতার দু-এক দিক ধর্ম, সাহিত্য ও রাজনীতি, ক্যাম্প, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: বইমেলা ২০০১

৭৫. সিংহ কঙ্কর : ধর্ম ও নারী: প্রাচীন ভারত, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, তৃতীয় প্রকাশ (পরিমার্জিত সংস্করণ): জানুয়ারি ২০১৭

৭৬. সিংহ কঙ্কর : বাংলার রেনেসাঁস: অন্ত্যজ আর শূদ্র, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ: নভেম্বর ২০১৫

৭৭. সিংহ কঙ্কর : মনুসংহিতা এবং নারী, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, তৃতীয় প্রকাশ (নতুন সংস্করণ): নভেম্বর ২০১৫

৭৮. সেনগুপ্ত ড. নীতিশ : বঙ্গভূমি ও বাঙালির ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: মার্চ ২০০৮

৭৯. সেন সুকুমার : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা:লি:, কলকাতা, সপ্তম মুদ্রণ: কার্তিক ১৪১৬

৮০. সেন সুকুমার : ভাষার ইতিবৃত্ত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা:লি:, কলকাতা, একাদশ মুদ্রণ: মে ২০০৭

৮১. হালদার গোপাল : সংস্কৃতির রূপান্তর, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ: সেপ্টেম্বর ২০১৬

৮২. হুমায়ুন রাজীব : সমাজভাষাবিজ্ঞান, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ: সেপ্টেম্বর ২০১৬

৮৩. হোসেন সেলিনা : নারীবিশ্ব, সম্পাদনা: বরেন্দু মণ্ডল, অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৯

৮৪. Sen Sukumar : Women's Dialect in Bengali, Jijnasa, Kolkata, January 1979

গ. পত্র-পত্রিকা:

১. দশদিশি, ব্রাহ্ম ভাবাদর্শ ও ব্রাহ্ম আন্দোলন (প্রথম ভাগ), দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, অক্টোবর ২০১৩-মার্চ ২০১৪

২. দশদিশি, ব্রাহ্ম ভাবাদর্শ ও ব্রাহ্ম আন্দোলন (দ্বিতীয় ভাগ), তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, এপ্রিল ২০১৪-সেপ্টেম্বর ২০১৪

৩. সরকার শান্তনু (সম্পাদক), শুভশ্রী, নারী : সংগ্রামে ও সৃজনে, ৫৪ ও ৫৫ বর্ষ (একত্রে), ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭

৪. সরকার পুলককুমার (সম্পাদক), শুভশ্রী, ভ্রমণের কথা ও কাহিনি, ৪৪ বর্ষ, ২০০৫-০৬

৫. পাল দেবযানী (সম্পাদক), আম পালা কথা, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ-আশ্বিন ১৪১৯

৬. দাস উত্তম (সম্পাদক), সংশপ্তক, চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা (একত্রে), ২০১৯, জুন ও ডিসেম্বর

নির্ঘণ্ট

অ

অঙ্গিরা - ৩১

অদ্বৈতবাদ- ২৩৪

অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা- ৭৫, ৯৪, ৯৫, ১০১,

অন্নদামঙ্গল - ১১, ২৯৪

অন্নদাশঙ্কর রায় - ৫

অবলাবান্ধব - ৭৫

অভয়ামঙ্গল - ১১

অমৃতবাজার - ৩২

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় - ৩৮, ৫৫

আ

আত্মকথা - ৪২, ১৪৫, ১৪৬, ১৫২, ২১২, ২৫০

আত্মীয় সভা - ১৪৪

আদি ব্রাহ্মসমাজ- ১৫৩

আধ আধ ভাষিণী - ৪৪

আমার অতীত জীবন - ৫২, ৯১ ১৭৫, ২১৩, ২৩৩, ২৫১

আমার কথা - ৪৫, ১৮৯, ২২৫, ২৪৫

আমার খাতা - ৫১, ৯২, ২১৩, ২২০, ২৪৬, ২৬৩

আমার জীবন-কাহিনি - ৫৩, ১৭৫, ২০২, ২৩০, ২৪২, ২৫১, ২৬৪

আমার জীবন- ২, ৪১, ৯৭, ১১৩, ১২১, ১৮০, ১৮৭, ১৯০, ২১৫, ২৩১, ২৬০

আমার বাল্যজীবনী - ৬২

আমার সংসার - ৫০, ১৫৩, ১৭৪, ১৮৬, ২৩২, ২৫০, ২৫৩, ২৫৫, ২৬০

আমোদিনী দাশগুপ্ত - ১১৮, ১৩৯, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৮, ২০২, ২৩০

আলালের ঘরের দুলাল - ১৪৩

আলো ও ছায়া - ৪৯

আহমদ শরীফ - ৪, ৫

ই

ইডেন স্কুল - ৯৫

ইন্ডিয়ান ফিল্ড - ৪২

ইন্দিরা দেবী - ৫০, ৯০, ১৪৭, ২১৩, ২২০, ২৪৬, ২৫৩

ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী - ২০, ২৩, ২৬, ৩৭, ২৭৩

ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা - ৪৬, ১১৬, ১৬০, ১৭৯, ১৯৯, ২০১

ঈ

ঈশ্বর গুপ্ত - ৭৩

উ

উইলিয়াম কেরী - ১২

উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক - ১৩, ১৪, ১৫

এ

এনকোয়ারার - ২৬

ও

ওয়ার্ড - ১২

ক

কাদম্বিনী বসু - ৭৮

কামিনী রায়- ৪৭, ৪৮, ৮৭, ৯৫, ১৪২, ১৫৬,১৬১,

১৬৫, ২০২, ২২২

কাহ্নপাদ - ১৬২

কাহাকে? - ৫৬

কিশোরীচাঁদ মিত্র - ১২১, ১৪২

কুলীনকুলসর্বস্ব - ১৩২

কেশবচন্দ্র সেন - ৭৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ১৪৫, ১৫১

কৈলাসবাসিনী দেবী - ৪২, ১২১, ১৭৩, ১৮১, ১৯১, ১৯৫, ২১৬, ২২৬, ২৬০

কৃষ্ণকামিনী দাসী - ৫৭, ৫৮

কৃষ্ণভাবিনী দাসী - ৪৬, ১১৬, ১২৩, ১৪২, ১৬০, ১৭৯, ১৯৯, ২০১

ক্যালকাটা কুরিয়র - ১৬

ক্যালকাটা খ্রিশ্চান অবজার্ভার - ২৭

ক্যালকাটা ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি - ৬৮

ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল - ৩৭, ৭১, ৭২, ৭৬, ৮৫

ক্যালকাটা ব্যাপটিস্ট ফিমেল স্কুল সোসাইটি - ৬৮

ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি - ৭০

গ

গিরিশচন্দ্র ঘোষ - ১৮৫

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী - ৫৬

গোলাম মুরশিদ - ৬৬, ৬৭, ৭৬, ১০২, ১৭১

গৌরীদান - ১১৪

গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা - ৩২

চ

চন্দ্রমুখী বসু - ৭৮

চন্দ্রাবতী - ১, ৪০

চণ্ডীচরণ সেন - ৮৭, ১৪২, ১৫০, ১৬১

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত - ৯৩

চিত্তবিলাসিনী - ৫৭

চিত্রা দেব - ২১১, ২২৯

চৈতন্যলীলা - ৪৫, ২২৮, ২৪৫

জ

জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী - ৫৪, ২৫৪

জাতীয় মহিলা কমিশন - ২০৪

জ্ঞানান্বেষণ- ১৭, ২৩, ১৩২

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী - ৫৪

জীবনের ঝরাপাতা - ৬২

জীবনকথা - ৫৩, ২৩৩, ২৫৫

জীবনানন্দ দাশ - ৩৭

জীবন স্মৃতি - ৫০, ৯৬, ১৪৮, ১৫৭, ১৬০, ১৬৩, ২৪৬, ২৫১

ড

ডায়েরী - ১২১, ১৩৯, ১৬৩, ১৭৩, ১৮১, ২১৬, ২২০, ২২৬, ২৪৩, ২৫১, ২৫৪, ২৫৭, ২৫৮, ২৬০, ২৬৩

ডি মায়াল এডোয়ার্ডস্ - ২০৯

ডিরোজিও - ৭১, ২৭৩

ঢ

ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ - ১৫০

ত

তত্ত্ববোধিনী সভা - ১৪৫

তিন আইন - ৩২, ৫৩, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪

দ

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় - ৭২

দ্য ফুলমণি দাসী রেপ কেস - ১১২

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় - ৯৬, ১৫৪

দীপনির্বাণ - ৫৬

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর - ১৪৫, ১৫৩

ধ

ধর্মসভা - ১৫

ন

নববাবুবিলাস - ১৪৩

নব-বিধান সমাজ- ১৪৬

নারীবাদ - ১৭১, ১৭২

নিস্তারিণী দেবী - ৪৭, ৯৮, ১২৩, ১২৯, ১৩১, ১৩২, ১৩৪, ১৩৭, ১৭৪, ১৯৩, ১৯৪, ২২১, ২৫২, ২৬০

নেপালে বঙ্গনারী - ৬১

প

পথের পাঁচালী - ১৩৫

পরাশরসংহিতা - ১৮

পার্থেনন- ৭১

পুরাতনী - ৫৪

পূর্ব্বকথা - ৪৪, ১৪১, ১৫৮, ১৫৯, ১৮৮, ১৯২, ২১৩, ২৪৪, ২৪৮, ২৬১

প্রমথ চৌধুরী - ৪৩

প্রসন্নময়ী দেবী - ৪৩, ৫৮, ৬০, ৮৬, ৮৮, ৯১, ১১৪, ১২২, ১২৫, ১২৮, ১৪১, ১৪৪, ১৫৮, ১৫৯, ১৬২, ১৬৪, ১৮৮, ১৮৯, ১৯২, ২১৩, ২১৯, ২৪৫, ২৪৮

প্রিয়ম্বদা দেবী - ৫৪

প্যারীচাঁদ মিত্র - ৭১, ১৪২

ব

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় - ১৪৪

বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় - ৯৬, ৯৭

বল্লাল সেন - ১২৬

বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব - ২৭, ২৮

বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার - ২৯

ব্রাহ্মবন্ধু সভা - ৭৪, ৭৫

বামাবোধিনী - ৩৯, ৫১, ৯২

বালক - ৫৪

বাল্যবিবাহের দোষ - ৩১

বাল্যবিবাহ নিবারণী সভা - ৩৩

বাংলার জাগরণ - ৮

বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস - ৭১

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী - ১৫০

বিদ্যাসাগর - ৮, ১৭, ১৯, ২১, ২২, ২৪, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৬৭, ৭৪, ১১১

বিধবাবিবাহ আইন - ২১, ১৫৮

বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব- ১৭, ১৮, ২০

বিনয় ঘোষ - ৭, ২২, ২৩, ১১০

বিনোদিনী দাসী - ৪৪, ৪৫, ১১৫, ১৮৫, ১৮৯,

১৯৪, ২২৫, ২২৮, ২৩২
বীরকুমারবধ কাব্য - ৫২
বেঙ্গল স্পেক্টেটর- ১৭, ২৩
বেঙ্গল হরকরা - ১৬
বেথুন সাহেব - ৬৭, ৭১, ৭২, ২৭৩
বেথুন স্কুল - ৭৩, ৭৪, ৭৬, ৭৭
ভ
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় - ১৪, ১৫, ২০
ভারত-সংস্কারসভা - ৭৫
ভারতবর্ষ - ৪৪
ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ- ৭৭, ১৪৯, ১৫৩, ১৫৬, ১৫৭
ভারতী - ৫৫, ৫৯, ৬২
ম
মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায় - ১৪২
মদনমোহন তর্কালঙ্কার- ৭২
মনু- ২৪, ৩১, ১১১, ১৩১
মনুসংহিতা - ২৯, ১৭৩, ১৮৭
মনোদা দেবী দাশগুপ্তা-৫৩, ৯৯, ১১৪, ১২৫, ২৫৪, ২৬১
মহারাণী ভিক্টোরিয়া - ৩০
মহাভারত- ৫১, ৮৭, ৯১,
মহিলা - ৪২
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার - ১৪
মানকুমারী বসু - ৫১, ৯১, ৯২, ১৭৫, ২১৩, ২৩৩
মাতৃমন্দির - ৪৪
মানসী ও মর্মবাণী - ৪৪
মাসিক পত্রিকা - ৭৫
মাসিক বসুমতী - ৪৩, ৫৪
মার্শম্যান - ১২
মিবাররাজ - ৫৬
মিস কুক - ৬৮
য
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত - ২২৮
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত - ৪৮, ৬৩
র
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - ৫৫, ৫৯, ৬১
রবার্ট মে - ৬৮
রস্‌ফোর্ট - ২৫৮
রাজলক্ষ্মী দেব্যা - ৬২
রাজনারায়ণ বসু - ৫২
রাধাকান্ত দেব - ১৪, ২০
রামগোপাল ঘোষ - ৭১
রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব - ৪৫
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ - ১৪৫
রামমোহন রায় - ৮, ১৩, ১৪, ২৬, ১৪৪, ১৪৯
রামকমল সেন - ১৪
রাসসুন্দরী দাসী - ৪১, ৮১, ৮২, ৮৩, ৯৭, ১১৭, ১২১, ১৪০, ১৮০, ১৮৭, ১৯০, ১৯১, ১৯৬, ১৯৭, ২০১, ২১৬, ২১৭, ২২৩, ২২৯, ২৪২, ২৪৮, ২৫০, ২৬০
রামায়ণ - ৫১, ৮৭, ৯১
রিফর্মার - ২৭

ল

লর্ড কর্ণওয়ালিস - ৯৩

লর্ড লিটন- ৭৭

লীলাবতী মিত্র - ৫২, ২৩৩, ২৫৫

লোকরহস্য - ১৪৪

শ

শরৎকুমারী দেব - ৫০, ৮৫, ৮৮, ১৫৫, ১৭৪, ২২৭, ২৩২, ২৫০, ২৬০

শান্তরস - ২৩৪

শ্রাদ্ধিকী - ৪৯, ১৪২, ১৫৬, ১৫৮, ১৬১, ১৬৫, ২০২, ২২২

শিবনাথ শাস্ত্রী - ৬০, ৭০, ৭২

শিশিরকুমার দাশ - ২৪১

স

সখী সমিতি - ৫৫, ৫৯

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর - ৫৪

সধবার একাদশী - ১৪৩

সম্বাদ কৌমুদী - ৩৯, ১৩৩

সমাচার চন্দ্রিকা - ১৬

সমাচার দর্পণ - ১০, ১৫, ১৬, ২৫, ২৭, ৩৯, ৬৯, ১০১, ১৩০ ১৩২, ১৩৮

সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী - ১২৮, ২১১, ২৫৮

সরলাদেবী চৌধুরাণী - ৬১

সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ- ২৬

সংবাদ প্রভাকর - ৭৩

স্বর্ণকুমারী দেবী - ৫৫, ৬১

স্বপন বসু - ৯, ৬৮

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ - ১৫৬, ১৫৭

সারদাসুন্দরী দেবী - ৪২, ৯৪, ৯৫, ১১৯, ১৪৫, ১৪৬, ১৫২, ১৫৩, ১৮৪, ২১২, ২৩৫, ২৫৭

স্টার থিয়েটার - ১৮৫, ১৯৪

স্বামী বিবেকানন্দ- ২২২

সিপাহী বিদ্রোহ- ৩০

সিমোন দ্য বোভোয়ার - ১৭৮, ১৮০, ১৮৩, ১৮৮

সুকুমার সেন - ২৪৯, ২৫৯

সুদক্ষিণা সেন - ৪৯, ৮৫, ১১৫, ১৩২, ১৪১, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫৭, ১৬০, ১৬৩, ১৮২, ১৮৩, ২১৪, ২১৫, ২২৬, ২২৭, ২৪৬

সেকেলে কথা - ৪৭, ৯৮, ১২৩, ১২৯, ১৩১, ১৩২, ১৭৪, ২২১, ২৩২, ২৫২, ২৫৩, ২৫৭, ২৬০

সোমপ্রকাশ - ৩২

হ

হারিৎ - ৯

হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় - ৯৬

হিন্দুস্থান - ৬১

হিরণ্ময়ী দেবী - ৫৯

হুমায়ুন আজাদ - ১৯৮

হেমলতা সরকার - ৬০

হেমাঙ্গিনী দেবী - ৬০

B

Bengal Ladies' society - ৬৯

H

Histoire naturalle of morale des lles Antilles- ২৫৮

N

National Mission for Empowerment of women - ২০৪

National Policy for the Empowerment of women - ২০৪

R

Religion - ২০৯

T

The Religion of Semites- ২১০

The Oxford English Dictionary - ৯

The Threshold of Religion- ২১০

W

Women's Dialect in Bengali- ২৫৯, ২৬০, ২৬১

A Bengali Peer-Reviewed Journal

ISSN : 2454-4884

সংশপ্তক

চতুর্থ বর্ষ ।। দ্বিতীয় সংখ্যা ।।
পঞ্চম বর্ষ ।। প্রথম সংখ্যা ।।

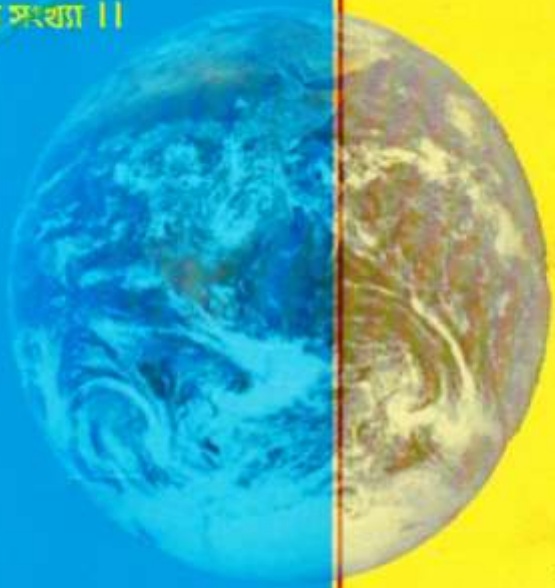

সম্পাদক : উত্তম দাস

সংশপ্তক

SAMSAPTAK

চতুর্থ বর্ষ ।। দ্বিতীয় সংখ্যা

পঞ্চম বর্ষ ।। প্রথম সংখ্যা

পত্রিকা অধিকর্তা

উৎপল মণ্ডল

সম্পাদক

উত্তম দাস

সংশপ্তক

Peer- Reviewed Journal

২০১৯ ,জুন ও ডিসেম্বর

2019 June & December

Vol.4, Issue-2

Vol.5, Issue-1

চতুর্থ বর্ষ ।। দ্বিতীয় সংখ্যা

পঞ্চম বর্ষ ।।প্রথম সংখ্যা

ISSN-2454-4884

পত্রিকা অধিকর্তা

প্রফেসর উৎপল মণ্ডল,(কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়)

প্রাক্তন প্রফেসর , উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদক

উত্তম দাস , সহকারী অধ্যাপক , বাংলা বিভাগ

বীরভূম মহাবিদ্যালয় , সিউরি

সম্পাদক মণ্ডলী

ড. প্রকাশ মাইতি (বানারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. রীতা মোদক (বিশ্বভারতী)

ড. সুখেন বিশ্বাস (কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)

ড.সাবলু বর্মণ (কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. পার্থসারথি মুখোপাধ্যায় (বীরভূম মহাবিদ্যালয়)

প্রফেসর তপন কুমার বিশ্বাস (কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় , ডিন , আর্টস এন্ড কমার্স)

*****

পরবর্তী সংখ্যার বিষয়

'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ,

ও অন্যান্য প্রবন্ধ'

অভ্রতে লিখে সফট কপি uttamnbu@gmail.com এ পাঠান মার্চ,

২০২০ এর মধ্যে। (পি,ডি,এফ করবেন না) 9734518427

সূচিপত্র-

পৃষ্ঠা-

* সম্পাদকীয়- i
* মৃত্যু: বিমল করের গল্পে
প্রফেসর উৎপল মণ্ডল -০১

* সৌরেন চৌধুরীর 'অরণ্য মন অরণ্য ক্ষুধা' : আজন্ম লালিত ক্ষুধা — কালে কালান্তরে
দীপকচন্দ্র বর্মন - ১৩
* অলোক গোস্বামীর অদ্ভুত আঁধার : শিলিগুড়ির কলোনি গড়ে ওঠার ইতিবৃত্ত
পুরুষোত্তম সিংহ -১৮
* ঔপনিবেশিক সুন্দরবন অঞ্চলের জনবসতি
-ইন্দ্রকুমার মিস্ত্রি - ২৫

* কবি অরুণেশ ঘোষ : সমাজ ভাবনায় 'শব ও সন্ন্যাসী'
মহ: রসিদুল হক - ৩৫
* সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উৎস সন্ধান: রবীন্দ্রনাথের গ্রাম্যসাহিত্য
কল্পনা সরকার -৪০

* ফণীশ্বরনাথ 'রেণু'র ময়লা আঁচলঃ সময়ের কণ্ঠ
তৃপ্তি দাস -৪৭
* উগ্রজাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা
অজয় সাহা -৫১
* শান্তিঃ একটি নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি
প্রসেন জিৎ খাঁ -৫৬
* 'রাজবন্দীর জবানবন্দী': জবানবন্দীতে আমরা
সুস্মিতা পাল -৬২
* প্রেতণীর রূপকথাঃ এক আত্মার অপমৃত্যু
আকবর হোসেন -৬৫
* একুশে ফেব্রুয়ারিও ভাষা আন্দোলন
অনিন্দিতা কর্মকার -৭০
* বিনোদিনী দাসীর 'আমার কথা' : পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে নিঃশব্দ প্রতিবাদ
তুফান রায়[১] উৎপল মণ্ডল[২] ৭৯
* মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে প্রথম সারির পুরুষ চরিত্র
অতীশ চন্দ্র ভল্লা - ৮৩
* উত্তরবঙ্গের 'মেচ' সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত ভেষজ
ডা : বাসব কান্তি দিন্ডা -৯১
* শীতলপাটির সংস্কৃতিতে উত্তরবঙ্গের কোচবিহার জেলার ঘুঘুমারি
রানা দাস -৯৬
* জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল : কাব্য ও সমাজ বাস্তবতা
রামকুমার রবিদাস -১০২

 ISSN: 2454-4884

বিনোদিনী দাসীর 'আমার কথা' : পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে নিঃশব্দ প্রতিবাদ

তুফান রায়[১] উৎপল মণ্ডল[২]

roytufan9@gmail.com / utpalnbu@yahoo.com

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আত্মজীবনী হিসাবে বিনোদিনী দাসীর 'আমার কথা' গ্রন্থটির গুরুত্ব বহুমাত্রিক। এই গ্রন্থে বিনোদিনী দাসী ১৮৭৪-১৮৮৬ সাল পর্যন্ত তাঁর অভিনয় জীবনের বৈচিত্র্যময় ঘটনাকে তুলে ধরেছেন। এই গ্রন্থে আমরা এক দিকে পেলাম তৎকালীন সমাজে নারীর স্থান, বাংলা থিয়েটারের অন্তর্নিহিত নানা টানাপোড়েনের বাস্তব চিত্র এবং নারীর ওপর পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আধিপত্যের ও শোষণের বাস্তব চিত্র। এই গ্রন্থটি লেখার উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখিকা জানিয়েছেন—"...আমি সমাজপতিতা, ঘৃণিতা বারনারী! লোকে আমায় কেন দয়া করিবে? কাহার নিকটেই বা প্রাণের বেদনা জানাইব; তাই কালি কলমে আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছি।"[১] অর্থাৎ লেখিকা তাঁর অভিনয় জীবনকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিগত বেদনার কথা পাঠকের কাছে তুলে ধরার জন্যই এই আত্মজীবনীটি লিখেছেন। তবে ব্যক্তিগত বেদনার কথা লিখতে গিয়ে এই গ্রন্থটি হয়ে উঠেছে তৎকালীন সময়ের এক ঐতিহাসিক দলিল। উনিশ শতকের শেষদিকেও নারীরা কীভাবে পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যের দ্বারা প্রতিনিয়ত শোষিত হত – তা তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনার মধ্যদিয়ে তুলে ধরেছেন। এভাবে গ্রন্থটি বিনোদিনীর ব্যক্তিগত জীবনের বেদনার বর্ণনার মধ্য দিয়ে বৃহত্তর সামাজিক তাৎপর্য লাভ করে যায় – যা চিরন্তন সাহত্যের বৈশিষ্ট্য। বিনোদিনী অভিনয় জীবনের সাফল্যের শীর্ষে যখন অবস্থান করছিলেন তখনই হঠাৎ করে তিনি অভিনয় জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন – তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র চব্বিশ-পঁচিশ বছর। এ বিষয়টি আমাদের ভাবতে হবে। কেননা প্রত্যেক মানুষই জীবনে বেদনা-প্রতারণার শিকার হন আর কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের চক্রান্তের শিকার সকলেই কমবেশি হয়ে থাকেন – এটা সেকালে যেমন ছিল, বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। কিন্তু তাই বলে অভিনয় জীবনের সাফল্যের শীর্ষে থাকার সময় মাত্র চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সে কেন বিনোদিনী দাসী অভিনয় জীবন থেকে অবসর নিলেন – এটা কি পুরুষতান্ত্রিক শোষণের-আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নয়? হ্যাঁ, এটা এক ধরনের নীরব প্রতিবাদ – অনেকটা অহিংস আন্দোলনের মতো। বিনোদিনী এভাবে অকালে অবসর নিয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে পরোক্ষভাবে প্রতিবাদ জানিয়ে গেলেন। যদিও অনেকে লেখিকার এই দৃষ্টিভঙ্গিকে নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বলে মেনে নেবেন না। কেননা আমরা আজও কলোনিয়াল হ্যাঙ্গওভার থেকে বেরোতে পারিনি – তাই উনিশ শতকে যখন পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে নারীবাদী আন্দোলন চলছিল তখন আমাদের দেশে একজন নারীর পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে এধরনের প্রতিবাদকে কখনই আমরা নারীবাদী ভাবনাপ্রসূত বলে মেনে নিতে পারি না। সে যাই হোক বিনোদিনী দাসীর 'আমার কথা' গ্রন্থে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে এই নিঃশব্দ প্রতিবাদ কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তারই অন্বেষণ বর্তমান নিবন্ধের আলোচনার বিষয়।

১৮৬৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জনপ্রিয় অভিনেত্রী বিনোদিনী দাসী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি থাকতেন মাতামহী এবং মায়ের সঙ্গে তৎকালীন কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের ১৪৫ নম্বর বাড়িতে। বিনোদিনী দাসীর শৈশব নানা অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে – দারিদ্র্য ছিল তাদের নিত্যসঙ্গী। লেখিকা জানিয়েছেন—"আমার জন্ম এই কলিকাতা মহানগরীর মধ্যে সহায় সম্পত্তিহীন বংশে। তবে দীন দুঃখী বলা যায় না, কেননা কষ্টে-শ্রেষ্টে একরকম দিন গুজরান হইত। তবে বড়ো সুশৃঙ্খলা ছিল না, অভাব যথেষ্টই ছিল। আমার মাতামহীর একখানি নিজ বাটী ছিল। তাহাতে খোলার ঘর অনেকগুলি ছিল। ...সেই সকল খোলার ঘরে কতকগুলি দরিদ্র ভাড়াটিয়া বাস করিত। সেই আয় উপলক্ষ্য করিয়াই আমাদের সংসার নির্ব্বাহ হইত।"[২] আবার অল্পবয়সে লেখিকার বিয়ে হলেও লেখিকার স্বামী লেখিকাকে সঙ্গে নিয়ে যাননি এবং অন্যত্র আবার বিয়ে করেছেন। এভাবে মাতামহীর বাড়িতে অভাব-দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে বিনোদিনীর জীবন কাটতে থাকে। তাঁর যখন ন'বছর

বয়স তখন তাদের বাড়িতে এসে বাস করতে থাকেন সেকালের জনপ্রিয় অভিনেত্রী ও সংগীত শিল্পী গঙ্গামণি। এই গঙ্গামণির কাছেই বিনোদিনী দাসী সংগীতের চর্চা করেছিলেন। পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলে এক ব্যক্তি গঙ্গামণির কাছে গান শুনতে আসতেন। এই পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিনোদিনীদের পারিবারিক অভাব-অনটন প্রত্যক্ষ করে বিনোদিনীর পরিবারকে দারিদ্র্যের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য অর্থ উপার্জনের উপায় হিসাবে বিনোদিনীকে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনয়ের কাজ পাইয়ে দেন। লেখিকা জানিয়েছেন—"তখন পূর্ণবাবু আমাকে সুবিখ্যাত 'ন্যাশনাল থিয়েটার' দশ টাকা মাহিনাতে ভরতি করিয়া দিলেন।"[৩]

১৮৭৪ সালের ১২ ডিসেম্বর বিনোদিনী দাসী গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত 'শত্রু সংহার' নাটকে দ্রৌপদীর সখীর ভূমিকায় প্রথম অভিনয় করেছিলেন। এখান থেকেই বিনোদিনীর অভিনয় জীবনের সূত্রপাত। এই সময় বিনোদিনীর বয়স ছিল মাত্র বারো বছর। এরপর বিনোদিনী গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে 'শরৎ-সরোজিনী' নাটকে সরোজিনী, 'হেমলতা' নাটকে হেমলতা, 'সধবার একাদশী' নাটকে কাঞ্চন প্রমুখ চরিত্রে সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন। একদিকে অভিনয় এবং অন্যদিকে তাঁর সংগীতে দক্ষতা থাকায় তিনি অভিনেত্রী হিসাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই অভিনয়ে বয়স্কা অভিনেত্রীদের ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। লেখিকা জানিয়েছেন—"আমার অগ্রবর্তী অভিনেত্রীগণ যদিও আমার অপেক্ষা অধিক বয়স্কা ছিলেন, কিন্তু আমি তাঁহাদের বয়সে সমান না হইলেও অল্পদিনের কাজে তাঁহাদের সমান হইয়া ছিলাম।"[৪] এরপর বিনোদিনী লখনউ, লাহোর প্রভৃতি শহরে অভিনয় করে কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন। এর পাঁচ-ছয় মাস পরে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার বন্ধ হয়ে গেলে বিনোদিনী শরৎচন্দ্র ঘোষের বেঙ্গল থিয়েটারে যোগদান করেছিলেন অভিনেত্রী হিসাবে।

বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনয়ের সময় বিনোদিনী দাসী শরৎচন্দ্র ঘোষের কাছে অভিনয় শিক্ষা গ্রহণ করেন। এই থিয়েটারে 'দুর্গেশনন্দিনী'তে তিনি একই সঙ্গে আয়েষা ও তিলোত্তমা —এই দুটি বিপরীতধর্মী চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন—"এই অতি সংকুচিত ভীরু-স্বভাবা রাজকন্যা তিলোত্তমা, তখনই আবার উন্নত-হৃদয়া-গর্ব্বিণী অপরিসীম হৃদয়-বলশালিনী প্রেমপরিপূর্ণা নবাব পুত্রী আয়েষা! এইরূপ দুইভাগে নিজেকে বিভক্ত করিতে কত যে উদ্যম প্রয়োজন তাহা বলিবার নহে।"[৫] প্রকৃতপক্ষে বেঙ্গল থিয়েটার থেকেই বিনোদিনী দাসী অভিনেত্রী হিসাবে দক্ষতা দেখিয়েছিলেন এবং তাঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল। এই সময় অভিনয়ের জন্যে তিনি 'সাইনোরা', 'ফ্লাওয়ার অব দি নেটিভ স্টেজ' ইত্যাদি উপাধি পেয়েছিলেন। এভাবে বেঙ্গল থিয়েটারে অনেকগুলি নাটকে অনেকগুলি চরিত্রে পারদর্শিতার সঙ্গে অভিনয় করে বিনোদিনী দাসী ন্যাশনাল থিয়েটারে যোগদান করেছিলেন।

কেদারনাথ চৌধুরীর ন্যাশনাল থিয়েটারে বিনোদিনী দাসী 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র একসঙ্গে সাতটি চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন — যা থেকে অনুমান করা যায় তিনি কত বড় অভিনেত্রী ছিলেন। এই সময় ন্যাশনাল থিয়েটারে আর্থিক দুর্দশা দেখা দিলে প্রতাপচাঁদ জহুরী নামে একজন মাড়োয়াড়ি এই থিয়েটার নিলামে কিনে নেন। এই সময় থেকে বিনোদিনী দাসী নাট্যাভিনয়ের শিক্ষক হিসাবে পেয়েছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষকে এবং বিনোদিনী দাসী তাঁর অভিনয় প্রতিভার জন্য গিরিশচন্দ্রের প্রথমা ও প্রধানা শিষ্যা হতে পেরেছিলেন। এ প্রসঙ্গে লেখিকা জানিয়েছেন—"গিরিশবাবু মহাশয়ের শিক্ষা ও সতত নানারূপ সৎ উপদেশ গুণে আমি যখন স্টেজে অভিনয়ের জন্য দাঁড়াইতাম, তখন আমার মনে হইত না যে আমি অন্য কেহ। আমি যে চরিত্র লইয়াছি আমি যেন নিজেই সেই চরিত্র।"[৬] এই সময় বিনোদিনী দাসী 'মৃণালিনী', 'বিষবৃক্ষ', 'পলাশির যুদ্ধ', 'রাবণ বধ', 'সীতার বনবাস', 'সীতাহরণ', 'অভিমন্যু বধ' প্রভৃতি নাটকে দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করে প্রভূত সুনাম অর্জন করেছিলেন। এই সময় বিনোদিনী দাসীকে পরিস্থিতির সাপেক্ষে এক সম্ভ্রান্ত যুবকের রক্ষিতা হিসাবে থাকতে হয়েছিল। যদিও তাদের মধ্যে সম্পর্কটা ছিল অনেকটা প্রেমিক-প্রেমিকার মতো। পরবর্তীকালে প্রতাপচাঁদ জহুরীর সঙ্গে মতবিরোধের ফলে বিনোদিনী ন্যাশনাল থিয়েটার ত্যাগ করেন।

ন্যাশনাল থিয়েটার ত্যাগ করার পর গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃত মিত্র প্রমুখের ইচ্ছায় বিনোদিনী দাসী একটি নতুন থিয়েটার স্থাপন করার সংকল্প করেছিলেন। গুর্মুখ রায় নামে এক ধনাঢ্য মাড়োয়ারি যুবক নতুন থিয়েটার তৈরি করে দেবেন বলে জানান এবং এক্ষেত্রে তিনি শর্ত দিয়েছিলেন বিনোদিনীকে তার রক্ষিতা হিসাবে থাকতে হবে। তখন সহকর্মীদের অনুরোধে বিনোদিনী পূর্বে যে সম্ভ্রান্ত যুবকের রক্ষিতা হিসাবে ছিলেন তাকে ত্যাগ করে গুর্মুখ রায়ের অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হন – সেজন্য তাকে সেই সম্ভ্রান্ত যুবকের দ্বারা আক্রান্তও হতে হয়েছিল। এবং সেই সম্ভ্রান্ত যুবক থিয়েটার যাতে প্রস্তুত না হয় সেজন্য নানাভাবে চক্রান্ত চালিয়েছিল। সেইসময় গুর্মুখ রায় এসব দেখে বিনোদিনীকে বলেছিল থিয়েটার তৈরি করে লাভ নেই এবং এর বিনিময়ে সে বিনোদিনীকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু বিনোদিনীর প্রধান সত্তা অভিনেত্রী হওয়ায় সেই প্রস্তাবে তিনি রাজি হননি। এই প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন—"আমি থিয়েটার ভালোবাসিতাম, সেই নিমিত্ত ঘৃণিতা বারনারী হইয়াও অর্থ লক্ষ টাকার প্রলোভন তখনই ত্যাগ করিয়াছিলাম।"[৭] যখন বিনোদিনীর সহকর্মীরা গুর্মুখ রায়ের বিনোদিনীকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়ার প্রস্তাবের কথা শোনেন তখন তারা নানা প্রকার চেষ্টা করতে লাগলেন যাতে বিনোদিনী গুর্মুখ রায়ের কাছ থেকে সেই অর্থ গ্রহণ না করে। কিন্তু বিনোদিনী জানিয়েছেন—"...কিন্তু এ সমস্ত চেষ্টা তখন নিষ্প্রয়োজন। আমি স্থির করিয়াছি থিয়েটার করিব। থিয়েটার ঘর প্রস্তুত না করিয়া দিলে আমি কোনো মতে তাঁহার বাধ্য হইব না।"[৮] তখন বিনোদিনীর উদ্যোগে বিডন স্ট্রিটে জমি নেওয়া হয় এবং গুর্মুখ রায় অকাতরে অর্থব্যয় করতে থাকেন। লেখিকা জানিয়েছেন সকলে চলে গেলেও গুর্মুখ রায় এবং দু-একজনের সঙ্গে তিনি রাত জেগে অনেক টাকা খরচ করে এক বছরের মধ্যে নতুন থিয়েটার প্রস্তুত করেন। থিয়েটার যখন প্রস্তুত হচ্ছিল সেই সময় সকলে বলেছিল নতুন থিয়েটারের নাম হবে বিনোদিনীর নামের আদ্যক্ষর নিয়ে 'বি-থিয়েটার'। কিন্তু থিয়েটার যখন প্রস্তুত হল তখন গিরিশচন্দ্র ঘোষ সহ সকলেই তাতে রাজি হলেন না এবং থিয়েটারের নামকরণ করলেন স্টার থিয়েটার। এতে লেখিকা মানসিক আঘাত পেয়েছিলেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতারণার দ্বারা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত লেখিকা জানিয়েছেন—"আর আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে উহারা ছলনা দ্বারা আমার সহিত এমনভাবে অসৎ ব্যবহার করিবেন। কিন্তু এত টাকার স্বার্থ ত্যাগ করিতে আমার যে কষ্ট না হইয়াছিল তাঁহাদের এই ব্যবহারে আমার অতিশয় মনোকষ্ট হইয়াছিল যদিও এ সম্বন্ধে আর কখনও কাহাকে কোনো কথা বলি নাই, কিন্তু ইহা ভুলিতেও পারি নাই, ওই ব্যবহার বরাবর মনে ছিল।"[৯]

এমনকি থিয়েটার প্রস্তুত হওয়ার পরেও বিনোদিনী যাতে সেই থিয়েটারের বেতনভোগী অভিনেত্রী হয়ে থাকতে না পারেন সেজন্য অনেকেই ষড়যন্ত্র করেছিল এবং সেজন্য বিনোদিনীকে দু'মাস ঘরে বসে থাকতে হয়েছিল। বিনোদিনী এই থিয়েটারে 'দক্ষযজ্ঞ' নাটকে সতী; 'সধবার একাদশী' নাটকে কাঞ্চন; 'প্রহ্লাদ চরিত্র' নাটকে প্রহ্লাদ; 'চৈতন্য লীলা' নাটকে চৈতন্য ইত্যাদি চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন। এবং 'চৈতন্য লীলা' নাটকে চৈতন্য চরিত্রে বিনোদিনীর অভিনয় এতটাই নিখুঁত হয়েছিল যে স্বয়ং রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন 'মা তোমার চৈতন্য হউক।' গুর্মুখ রায় অসুস্থ হলে থিয়েটারের স্বত্ব ত্যাগ করতে উদ্যোগ নিয়ে বলেছিলেন—"এই থিয়েটার যাহার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, আমি তাহাকেই ইহার স্বত্ব দিব, অন্তত ইহার অর্ধেক স্বত্ব তাহার থাকিবে, নচেৎ আমি হস্তান্তর করিব না।"[১০] কিন্তু বিনোদিনী যাতে থিয়েটারের কোনো স্বত্ব না পায় সেজন্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ বিনোদিনীর মা-কে বলেছিলেন স্ত্রীলোক হয়ে তোমরা অত ঝঞ্ঝাট সামলাতে পারবে না। এভাবে বিনোদিনীকে স্টার থিয়েটারের স্বত্ব থেকেও বঞ্চিত করা হয়। এভাবে পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যের কাছে একের পর এক মানসিক আঘাত পেয়ে এবং সহকর্মীদের অন্যায় আচরণে ১৮৮৭ সালে বিনোদিনী মাত্র চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সে অভিনয় জীবন থেকে অবসর নেন।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা বিনোদিনীর অভিনয় জীবনের যে আলোচনা করলাম তা রচনাটিকে দীর্ঘায়িত করার জন্য নয়, বিনোদিনীর অভিনয় পারদর্শিতাকে তুলে ধরার জন্য। কেননা এই বর্ণনা থেকেই আমরা জানতে পারব বিনোদিনী অভাবে পড়ে অভিনয় জগতে এলেও প্রতিভার জন্য, অভিনয়কে ভালোবাসার জন্য এবং পরিশ্রমী মানসিকতার জন্য সাফল্যের শিখরে পৌঁছে গেছিলেন। তিনি একাধিক পুরুষের রক্ষিতা হয়ে থাকলেও তাঁর প্রথম ভালোবাসা ছিল

অভিনয়ের প্রতি। তাই অভিনয়ের জন্য, থিয়েটার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি টাকার প্রলোভনকে উপেক্ষা করে অনেক বড় আত্মত্যাগ করেছিলেন – নিজেকে গুর্মুখ রায়ের কাছে সমর্পণ করে দিয়ে। কিন্তু পরিণামে তিনি অবহেলা-প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই পাননি। বিশেষত স্টার থিয়েটার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস থেকেই আমরা জানতে পারি – বিনোদিনী দাসী কীভাবে পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যের দ্বারা একের পর এক অবহেলা, বঞ্চনা, প্রতারণার শিকার হয়েছেন। যে থিয়েটার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি এতবড় আত্মত্যাগ করলেন সেই থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পর পূর্বের কথামতো তার নামে থিয়েটার তো হলই না বরং তিনি যাতে থিয়েটারে বেতনভোগী অভিনেত্রী হিসাবেও থাকতে না পারেন তার জন্যও অনেকে চক্রান্ত করেছিল। এমনকি গুর্মুখ রায় তাকে থিয়েটারের স্বত্ব দিতে চাইলেও গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখের চেষ্টায় বিনোদিনী তা থেকেও বঞ্চিত হয়েছিলেন। এভাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের শোষণ, বঞ্চনা, অবহেলার দ্বারা একের পর এক মানসিক আঘাত পেয়ে অভিনয় জীবনের সাফল্যের শিখরে থেকেও বিনোদিনী দাসী মাত্র চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সে অভিনয় জীবন থেকে অবসর নেন। এরপর বিনোদিনী আরো চুয়ান্ন বছর বাঁচলেও আর কোনদিন অভিনয় করেননি, যদিও তিনি নিয়মিত থিয়েটার দেখতেন। আসলে উনিশ শতকে দাঁড়িয়ে বিনোদিনী দাসী পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যের শোষণ, বঞ্চনা, প্রতারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্যই অভিনয় জীবনের সাফল্যের শিখরে থাকাকালীন সময়েই অল্প বয়সে অভিনয় জীবন থেকে অবসর নিয়েছিলেন। অনেকে মনে করতে পারেন বিনোদিনী পুরুষতান্ত্রিক সমাজের শোষণের দ্বারা মর্মাহত হয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু যদি একটু অন্যভাবে আমরা ভাবি তাহলে দেখব বিনোদিনী দাসী পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অন্যায়কে সহ্য করেননি। কেননা তিনি জানতেন—"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে/তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে"। তাই অকালে অভিনয় জীবন থেকে অবসর নিয়ে তিনি যেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের শোষণ, অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে নিঃশব্দ প্রতিবাদ করে গেলেন। এভাবে জনপ্রিয় অভিনেত্রী বিনোদিনী দাসী হয়ে উঠলেন একটি প্রতিবাদী মুখ পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে। আর তার এই প্রতিবাদের কাহিনিকেই তিনি সুকৌশলে 'আমার কথা' গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। সেদিক থেকে বিচার করলে বিনোদিনী দাসীর 'আমার কথা' গ্রন্থটিকে পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে বিবেচনা করলে বোধহয় অসমীচীন হবে না।

তথ্যসূত্র :

১। ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা), 'প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ' (প্রথম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৪, পুনশ্চ, কলকাতা-৭০০০১০, পৃ. ২৯১ ,২। ঐ, পৃ. ৩০২ , ৩। ঐ, পৃ. ৩০, ৪। ঐ, পৃ. ৩০৮-৩০ ৫। ঐ, পৃ. ৩১২ ,৬। ঐ, পৃ. ৩১৭ ৭। ঐ, পৃ. ৩২৪ ,৮। ঐ, পৃ. ৩২৪ ,৯। ঐ, পৃ. ৩২৫ , ১০। ঐ, পৃ. ৩২৬

সহায়ক গ্রন্থ :

১। ঘোষ বিজিত (সংকলন ও সম্পাদনা), 'প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ' (প্রথম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৪, পুনশ্চ, কলকাতা-৭০০০১০ ,২। দেব দূর্বা, 'আত্মজীবনীর স্থাপত্য', প্রথম প্রকাশ: কলকাতা বইমেলা ২০০৭, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৭০০০০৯ ,৩। দেব চিত্রা, 'অন্ত:পুরের আত্মকথা', অষ্টম মুদ্রণ: অক্টোবর ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০০০৯

সহায়ক পত্রিকা :

১। পাল দেবযানী (সম্পাদক), 'আম পালা কথা' (ষাণ্মাসিক সাহিত্য পত্রিকা), বর্ষ ২; সংখ্যা ১; বৈশাখ-আশ্বিন ১৪১৯, তৃতীয় প্রকাশ: মহালয়া, ১৪১৯

.....

১.গবেষক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ,২.অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়